'মিসাইল ম্যান' খ্যাত বিজ্ঞানী-রাষ্ট্রপতির আত্মজীবনী

উইংস অব ফায়ার

এ পি জে আবদুল কালাম

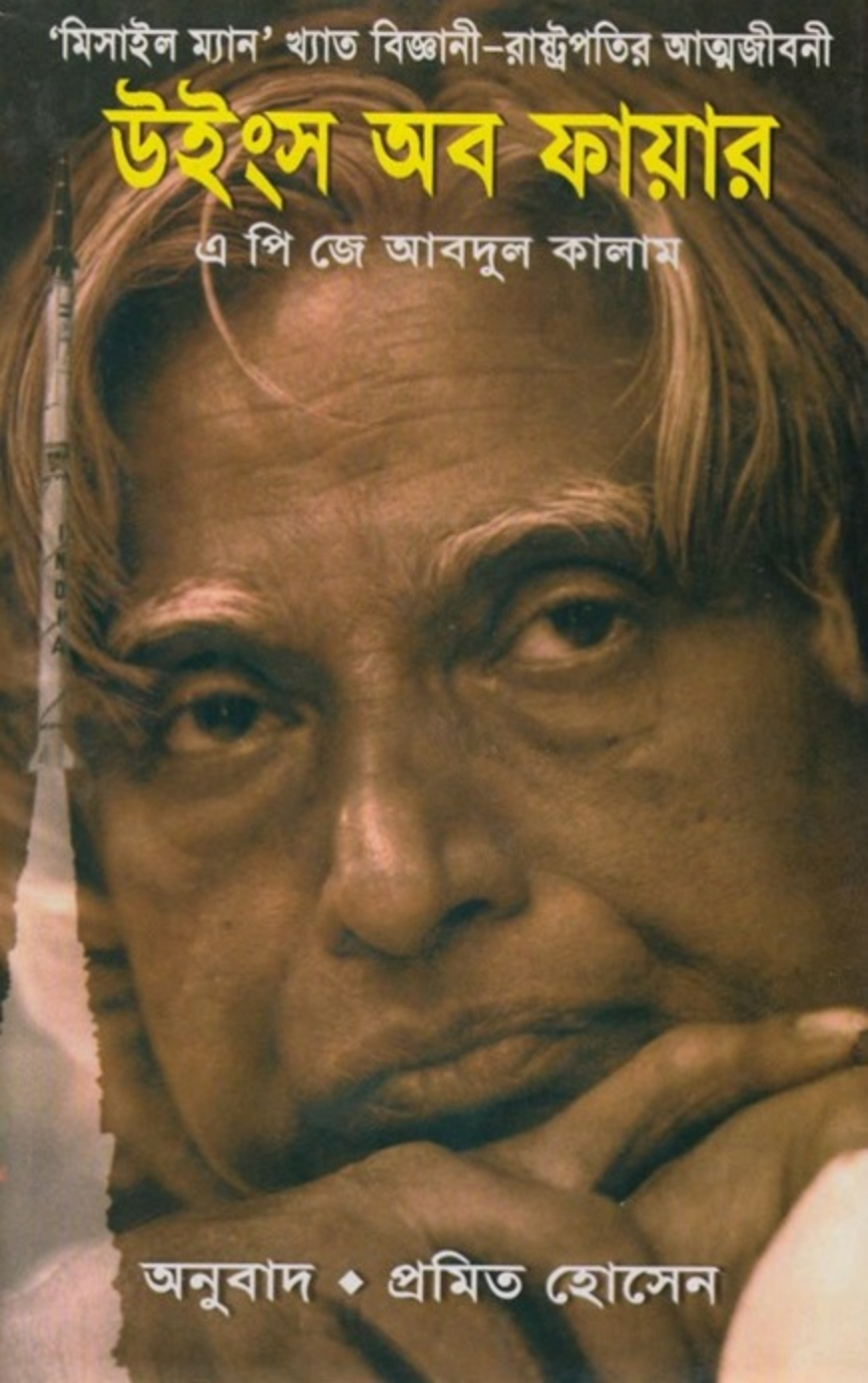

অনুবাদ ◆ প্রমিত হোসেন

আভুল পাকির জয়নুলাবদিন আবদুল কালাম জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩১ সালে, ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যের রামেশ্বরমে। তার অল্প শিক্ষিত পিতা ছিলেন নৌকার মালিক। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন কালাম এবং পরবর্তী সময়ে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' অর্জন করেন। এই বইয়ে নিজের শৈশব থেকে বেড়ে ওঠার অনেক অজানা তথ্য প্রকাশ করেছেন তিনি, সেই সঙ্গে তার পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো। আরও এসেছে তার তৈরি *অগ্নি, পৃথ্বী, আকাশ, ত্রিশুল* ও *নাগ* ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর নেপথ্য-কাহিনী। ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির দিক থেকে এগুলো ভারতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে। এই পরমাণু বিজ্ঞানী ব্যক্তিগত জীবনে দৈনিক ১৮ ঘন্টা কাজ করেন, এবং বীনা বাজাতে পারেন চমৎকার। তিনি ছিলেন চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনোলজি অ্যান্ড সোসাইটাল ট্রান্সফর্মেশনের অধ্যাপক। ড. কালাম বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতি।

প্রচ্ছদ
পি.পি. রাজু
প্রচ্ছদের ছবি
বি জয়চন্দ্রন

মূল্য : একশ' পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

উইংস অব ফায়ার

এ বই বিক্রির সব টাকা ব্যয় করা হবে ঢাকা
মহানগরীর অনাথ পথ-শিশুদের কল্যাণে

www.pathagar.com

উইংস অব ফায়ার

এ পি জে আবদুল কালাম

অরুণ তিওয়ারি সহযোগে

অনুবাদ ঃ প্রমিত হোসেন

অন্যধারা

৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৮
প্রকাশকাল : ১৫ অক্টোবর ২০০২
মূল © এ পি জে আবদুল কালাম
বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক ২০০২
প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২৩১৬৬, ০১৫২৩১০৫৮৪, ০১৭২৮০৭৯০১
পরিবেশক ■ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা ১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel : 0044-2072475954
Fax : 0044-2072475941
প্রচ্ছদ ■ পি. পি. রাজু
প্রচ্ছদের ছবি ■ বি জয়চন্দ্রন
কম্পোজ ■ বিস্‌মিল্লাহ্‌ কম্পিউটার্স ৪৭/১ বাংলাবাজার ঢাকা। ০১৭১১ ৯৫৮১২৩
মুদ্রণ ■ আমানত অফসেট প্রেস, ননীগোপাল লেন ঢাকা ১১০০

মূল্য ঃ একশ' পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-833-004-6

www.pathagar.com

আমার মা-বাবার স্মৃতিতে

আমার মা

সাগরের ঢেউ, সোনালি বালু, তীর্থযাত্রীর বিশ্বাস,
রামেশ্বরম মস্ক্ স্ট্রিট, সমস্তই মিশে আছে একের মধ্যে,
আমার মা!
তুমি আমার কাছে আস স্বর্গের সযত্ন বাহুর মত।
যুদ্ধদিনের কথা আমার মনে পড়ে যখন জীবন ছিল চ্যালেঞ্জ আর ফাঁদ—
মাইলের পর মাইল হাঁটা, সূর্যোদয়ের আগে কত ঘন্টা,
হেঁটে যাওয়া শিক্ষা নিতে মন্দিরের নিকটবর্তী সাধুসুলভ শিক্ষকের কাছ থেকে।
আবারও মাইলের পর মাইল আরব টিচিং স্কুল,
রেলওয়ে স্টেশন রোডে বালুর পাহাড়ে চড়া,
খবরের কাগজ সংগ্রহ করে মন্দির নগরীর বাসিন্দাদের কাছে বিতরণ,
সূর্যোদয়ের কয়েক ঘন্টা পর, ইশকুলে যাওয়া।
সন্ধ্যা, রাতের পড়ার আগে ব্যবসার সময়।
এই সব যন্ত্রণা এক বালকের,
আমার মা তুমি রূপান্তরিত হয়েছিলে তপস্বী শক্তিতে
পাঁচ বার নত হয়ে
সর্বশক্তিমানের মহিমার জন্য কেবলই, আমার মা।
তোমার ধর্মনিষ্ঠা তোমার সন্তানদের শক্তি,
তোমার সেরা জিনিস তুমি ভাগ করে নিতে যার বেশি প্রয়োজন হত তার সাথেই,
তুমি সর্বদা দিয়েছ, আর দিয়েছ তার প্রতি বিশ্বাস নিয়ে।
আমার মনে পড়ে সেদিনের কথা যখন বয়স ছিল দশ,
ঘুমাচ্ছিলাম তোমার কোলে বড় ভাই আর বোনদের ঈর্ষা জাগিয়ে
সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত, আমার বিশ্ব শুধু জানতে তুমি
মা! আমার মা!
যখন মাঝরাতে জেগে উঠি অশ্রু ঝরে পড়ছিল আমার হাঁটুর ওপর
তুমি জানতে তোমার সন্তানের বেদনা, আমার মা।
তোমার সযত্ন হাত, কোমলভাবে মুছে দিচ্ছিল যন্ত্রণা
তোমার ভালবাসা, তোমার যত্ন, তোমার বিশ্বাস আমাকে শক্তি দিয়েছিল
তার শক্তি নিয়ে বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়ানো নির্ভীক।
শেষ বিচারের দিন আবার আমাদের দেখা হবে, আমার মা!

এ পি জে আবদুল কালাম

www.pathagar.com

বাবা ইর্তেজাদ হোসেন (১৯২৭–১৯৮০)
মা সাহেরা বেগম (জন্ম : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭)
ছিলেন আপন চাচাত ভাই-বোন—
তাদের উদ্দেশে
উইংস অব ফায়ার-এর এই বাংলা অনুবাদ
উৎসর্গ করলাম

প্র. হ.

www.pathagar.com

গৌরচন্দ্রিকা

এমন এক সময়ে এ বই প্রকাশিত হচ্ছে যখন সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত ও জোরদার করতে ভারতের উদ্যোগ বিশ্বে অনেকের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। ঐতিহাসিক ভাবেই, লোকেরা সব সময় নিজেদের মধ্যে এটা-ওটা নানা বিষয় নিয়ে যুদ্ধ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক ভাবে, যুদ্ধ হয়েছে খাদ্য ও আশ্রয় নিয়ে। সময়ের প্রবাহে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে ধর্ম নিয়ে, মতাদর্শগত বিশ্বাস নিয়ে ; আর এখন চলে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্যের যুদ্ধ। ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের সমার্থক হয়ে উঠেছে।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে প্রযুক্তিগত ভাবে অগ্রসর মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে দুনিয়াকে মুচড়ে ধরেছে। এই বৃহৎ শক্তিগুলো পরিণত হয়েছে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার স্বঘোষিত নেতায়। এ পরিস্থিতিতে ভারতের মত একশ' কোটি মানুষের একটা দেশ কি করতে পারে? প্রযুক্তির দিক থেকে শক্তি অর্জন করা ছাড়া আমাদের তো আর কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ভারত কি প্রযুক্তি ক্ষেত্রের নেতা হতে পারে? আমার উত্তর হল একটা জোরাল 'হ্যাঁ'। আমার জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে এই উত্তরটিকে সিদ্ধ করা যাক।

এ বইয়ের সব ঘটনার স্মৃতিচারণ প্রথম যখন শুরু করেছিলাম, তখন আমি অনিশ্চিত ছিলাম আমার কোন স্মৃতিটা বর্ণনা করা উচিৎ কিংবা তার আদৌ কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না। আমার শৈশব অবশ্যই আমার কাছে মূল্যবান, কিন্তু তা কি কারো কাছে চিত্তাকর্ষক হবে? একটা ছোট-শহরের বালকের দুঃখদুর্দশা আর বিজয় সম্পর্কে জানার বিষয়টা পাঠকের কাছে কি মূল্য রাখে? আমার ইশকুলের দিনগুলোর টানাপোড়েন, ইশকুলের আর কলেজের ছাত্র থাকাকালে আংশিকভাবে আর্থিক কারণে আমার নিরামিষভোজীতে পরিণত হবার সিদ্ধান্ত—সাধারণ মানুষের কাছে এসব চিত্তাকর্ষক হবে কেন? অবশ্য পরে আমি বুঝতে পারি এগুলো আসলে প্রাসঙ্গিক, অন্য আর কিছু না হলেও অন্তত এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক ভারতের কিছু গল্প, ব্যক্তি মানুষের নিয়তি হিসেবে এবং যে সামাজিক আধেয়র মধ্যে তা নিহিত তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। বিমান বাহিনীর পাইলট হবার

www.pathagar.com

আমার ব্যর্থ চেষ্টা আর আমি কালেক্টর হব বলে বাবা যে স্বপ্ন দেখতেন তার সেই স্বপ্ন সত্ত্বেও কেমন করে রকেট ইঞ্জিনিয়ার হলাম—এসব কথা এখানে যোগ করাটা সঙ্গত বলেই আমি মনে করি।

চূড়ান্ত ভাবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যারা আমার জীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন তাদের কথা আমি বর্ণনা করব। তাছাড়া এ বইয়ের মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি আমার মা-বাবা ও নিকট পরিজনদের, আর আমার শিক্ষক ও গুরুদের, যাদের আশীষ পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যেমন শিক্ষার্থী হিসেবে তেমনি পেশাগত জীবনেও। এটা আমার সহকর্মীদের নিরলস উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনও, যারা আমাদের যৌথ স্বপ্ন সফল করতে সহায়তা করেছিলেন। দানবের কাঁধের ওপর দাঁড়ান সম্পর্কে আইজাক নিউটনের সেই বিখ্যাত উক্তি সকল বিজ্ঞানীর জন্যও প্রযোজ্য এবং আমি অবশ্যই জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ভারতীয় বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই, সতীশ ধাওয়ান, ব্রহ্ম প্রকাশ প্রমুখের কাছে ভীষণভাবে ঋণী। আমার জীবনে আর ভারতের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন তারা।

১৯৯১ সালের ১৫ অক্টোবর আমার বয়স হয়েছিল ষাট বছর। আমি অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য বলে বিবেচিত বিষয়গুলো পূরণ করার উদ্দেশ্যে। তার বদলে এক সঙ্গে দুটো ব্যাপার ঘটল। প্রথমত, আরও তিন বছর সরকারি চাকরি করতে আমি সম্মত হলাম, এবং দ্বিতীয়ত, তরুণ সহকর্মী অরুণ তিওয়ারি অনুরোধ করলেন তাকে আমার স্মৃতিকথা শোনানোর জন্য, যাতে সেগুলো তিনি রেকর্ড করে নিতে পারেন। ১৯৮২ সাল থেকে তিনি আমার গবেষণাগারে কাজ করছিলেন, কিন্তু ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগে খুব ভাল ভাবে তাকে আমি চিনতাম না—সেই সময় তাকে আমি হায়দারাবাদের নিজাম'স ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিটে দেখতে গিয়েছিলাম। তার বয়স ছিল বড় জোর ৩২ বছর, কিন্তু জীবনের জন্য দারুণ লড়াই করছিলেন। আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যা তিনি চান আমার তেমন কোনও কিছু করার আছে কি না। 'আমাকে আপনার আশীর্বাদ দিন, স্যার,' তিনি বললেন, 'যাতে করে আমি একটু লম্বা জীবন পাই আর আপনার একটা প্রকল্প অন্তত সম্পূর্ণ করতে পারি।'

এই তরুণের আত্মনিবেদন আমাকে আলোড়িত করেছিল। আমি সারা রাত তার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। প্রভু আমার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন। তিওয়ারি কাজে ফিরে এলেন এক মাসের মধ্যে। তিন বছরের

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে খন্ডিত অংশ থেকে *আকাশ* মিসাইল ফ্রেম গড়ে তুলতে অপূর্ব কাজ করেছিলেন তিনি। তারপর তিনি আমার স্মৃতিকথা নিতে শুরু করলেন। ধৈর্যের সাথে টুকরো ও খন্ড অংশগুলো একত্রিত করে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় তাকে রূপ দিলেন। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হাতড়ে সে সব কবিতার টুকরো বের করে আনলেন যেগুলো পড়ার সময় আমি চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম, আর তা যোগ করে দিলেন এ বইয়ে।

এ বই, আমি আশা করি, শুধুই আমার ব্যক্তিগত অর্জন ও দুঃখদুর্দশার কাহিনী নয়, বরং আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানের সাফল্য ও বাধাবিপত্তিরও কাহিনী, যে ভারত প্রযুক্তিগত অগ্রগামিতায় নিজেকে যুক্ত করার সংগ্রাম চালাচ্ছে। এ কাহিনী জাতীয় উচ্চাকাঙ্খা ও সমবায়ী প্রচেষ্টার। আর আমি যেভাবে দেখি, ভারতের বৈজ্ঞানিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য অনুসন্ধানের গাথা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আমাদের কালের এক রূপক কাহিনী।

এই সুন্দর গ্রহের প্রতিটা প্রাণীকে খোদা সৃষ্টি করেছেন এক একটি নির্দিষ্ট ভুমিকা পালনের জন্য। জীবনে যা কিছু আমি আর্জন করেছি তা তারই কৃপায়, আর তা তারই ইচ্ছার প্রকাশ। তিনি কয়েকজন অনন্যসাধারণ শিক্ষক ও সহকর্মীর মাধ্যমে আমার ওপর নাজিল করেছেন অশেষ রহমত, আর আমি এই চমৎকার ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে উর্ধে তুলে ধরছি তার মহিমা। কালাম নামে একটা ক্ষুদ্র মানুষের মাধ্যমে করা এই সব রকেট আর মিসাইল আসলে তারই কাজ। ভারতের কোটি কোটি মানুষকে কখনও ক্ষুদ্র আর অসহায় বোধ না করতে বলার জন্যই। আমরা প্রত্যেকেই ভিতরে ঐশ্বরিক আগুন নিয়ে জন্মাই। আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ এই আগুনে ডানা যুক্ত করার এবং এর মঙ্গলময়তার আলোয় জগৎ পূর্ণ করা।

খোদা আপনাদের মঙ্গল করুন!

এ পি জে আবদুল কালাম

www.pathagar.com

উইংস অব ফায়ার অনুবাদ প্রসঙ্গে

অরুণ তিওয়ারি এক দশকেরও বেশি সময় ড. এ পি জে আবদুল কালামের অধীনে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন। ফলে এ বই লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করায় আবদুল কালামের সহযোগী হিসেবে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত। অরুণ তিওয়ারির মাধ্যমে আবদুল কালাম ও প্রকাশনা সংস্থা ইউনিভার্সিটিজ প্রেস-এর অনুমতি সাপেক্ষে *উইংস অব ফায়ার*-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হল। বইটির এই বাংলাদেশ সংস্করণ অনুবাদকের অনুকূলে কপিরাইট কৃত। সুতরাং অন্য অনুবাদকের নাম ব্যবহার করে এ বইটি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করলে তা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়টির ওপর আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই আরও একটি কারণে। আমার প্রকাশক মনির হোসেন পিন্টু এ বই থেকে কোনও মুনাফা অর্জন করছেন না, আমিও কোনও রয়াল্টি নিচ্ছি না। প্রকাশক ও অনুবাদক হিসেবে আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি যে, এ বই বিক্রি থেকে অর্জিত সব টাকা ব্যয় করা হবে ঢাকা মহানগরীর অনাথ পথ-শিশুদের কল্যাণে। এই শিশুদের জন্যে আরও বড় আকারে কল্যাণকর কিছু করার দিকে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। এ উদ্দেশ্যেই ১৫ অক্টোবর আবদুল কালামের ৭২ তম জন্মদিনে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বইটি প্রকাশ করা হল। আমি আশাবাদী, এ ব্যাপারে পাঠকেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

❑
প্রমিত হোসেন
অক্টোবর ২০০২

www.pathagar.com

১

উদ্‌গম

[১৯৩১ — ১৯৬৩]

এই পৃথিবী তার, ওই বিস্তীর্ণ ও সীমাহীন আকাশের তিনিই মালিক ; তারই মধ্যে আছে মহাসাগর, আবার তিনি বিরাজ করেন ক্ষুদ্র জলাধারে।

অথর্ব বেদ
পরিচ্ছেদ ৪, স্তোত্র ১৬

www.pathagar.com

পূর্বতন মাদ্রাজ রাজ্যের দ্বীপ-শহর রামেশ্বরমে একটি মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে আমার জন্ম। আমার বাবা, জয়নুলাবদিন, খুব বেশি প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া জানতেন না আর খুব বেশি ধন—সম্পদও তার ছিল না ; এসব অসুবিধা সত্ত্বেও তার ছিল বিপুল সহজাত জ্ঞান এবং আত্মার খাঁটি বদান্যতা। আমার মা আশিয়াম্মার মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন এক আদর্শ সহধর্মীনি। মা প্রতিদিন যতজন লোককে খাওয়াতেন তাদের সঠিক সংখ্যা আমি মনে করতে পারব না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমাদের পরিবারের মোট সদস্যের চেয়ে তাদের সংখ্যা হত অনেক অনেক বেশি।

আদর্শ দম্পতি হিসেবে ব্যাপক মর্যাদা ছিল আমার মা-বাবার। আমার মা যে পরিবার থেকে এসেছিলেন সেই পরিবারটি ছিল অনেক বেশি সুখ্যাত, তার পূর্বপুরুষদের একজনকে বৃটিশরা 'বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেছিল।

অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চার মধ্যে আমি ছিলাম লম্বা ও সুদর্শন মা-বাবার অনুল্লেখ্য চেহারার খর্বকায় সন্তান। বংশানুক্রমিক ভাবে আমাদের যে বাড়িটায় আমরা বাস করতাম সেটা নির্মাণ করা হয়েছিল ১৯শ শতকের মধ্যভাগে। রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিটে অবস্থিত ইট ও চুনাপাথরে তৈরি পাকা বাড়িটা ছিল যথেষ্ট বড়। আমার কঠোর আত্মসংযমী পিতা অনাবশ্যক আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা পরিহার করে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে খাদ্য, ওধুধ অথবা বস্ত্রের মত দরকারি সব বিষয় মেটানো হত। বস্তুত, আমি বলব যে, আমার শৈশব ছিল নিরাপদ, আবেগ ও বিষয়গত দুদিক থেকেই।

www.pathagar.com

রান্নাঘরের মেঝের ওপর বসে সাধারণত আমি মায়ের সঙ্গে আহার করতাম। আমার সামনে তিনি কলা-পাতা রাখতেন, তার ওপর বেড়ে দিতেন ভাত এবং সুগন্ধী সম্ভার, ঘরে তৈরি এক প্রকার আচার আর এক লোকমা টাটকা নারকেলের চাটনি।

রামেশ্বরম যে-কারণে ধর্মীয় তীর্থযাত্রীদের কাছে অতি পবিত্র বলে গণ্য হত সেই বিখ্যাত শিব মন্দিরটি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বে। আমাদের এলাকাটি ছিল ব্যাপকভাবে মুসলমান অধ্যুষিত, তবে কিছু সংখ্যক হিন্দু পরিবারও ছিল, সম্প্রীতির সঙ্গে মুসলমান পড়শীদের সঙ্গে বসবাস করত তারা। আমাদের মহল্লায় অনেক কালের পুরনো একটা মসজিদ ছিল, সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনার জন্য আমাকে সেখানে নিয়ে যেতেন বাবা। আরবীতে উচ্চারিত প্রার্থনার অর্থ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, কিন্তু আমার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল যে তা স্রষ্টার কাছে পৌঁছাত। প্রার্থনার পর আমার বাবা কখন বেরিয়ে আসবেন তার অপেক্ষায় বাইরে বসে থাকত নানা ধর্মের লোকজন, তার জন্য অপেক্ষা করত তারা। তাদের অনেকে পানির পাত্র এগিয়ে দিত তার দিকে, বাবা সে সব পাত্রের পানিতে আঙুলের ডগা ডুবিয়ে দোয়া পড়তেন। এই পানি তখন তারা যে যার বাড়িতে নিয়ে যেত অসুস্থ লোকদের জন্য। সুস্থ হয়ে ওঠার পর লোকজন ধন্যবাদ জানাতে আসত আমাদের বাড়িতে সে কথাও আমার মনে পড়ে। আমার বাবা সব সময় হাসতেন আর তাদের বলতেন সর্বদয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে।

রামেশ্বরম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, পক্ষী লক্ষ্মণা শাস্ত্রী, ছিলেন আমার বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই দুজন সম্পর্কে আমার শৈশবের প্রথম দিককার বর্ণাঢ্য স্মৃতিগুলোর একটা হচ্ছে, নিজ নিজ ঐতিহ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে তারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় মগ্ন। প্রশ্ন করার মত বড় হয়ে ওঠার পর, বাবার কাছে আমি প্রার্থনার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে জানতে চাই। বাবা আমাকে বলেন, প্রার্থনার মধ্যে রহস্যের কিছুই নেই। বরং লোকজনের মধ্যে পারস্পরিক আধ্যাত্মিক যোগাযোগ সম্ভব হয় প্রার্থনার মাধ্যমে। 'তুমি যখন প্রার্থনা কর', তিনি বলেন, 'তখন তুমি তোমার দেহের সীমা অতিক্রম করে যাও আর পরিণত হও মহাজগতের অংশে, যা ধনদৌলত, বয়স, জাতপাত কিংবা লোভের কোনও বিভাজন মানে না'।

আমার বাবার সাধ্য ছিল জটিলতম আধ্যাত্মিক ধারণাগুলো সহজ ভাষায়, একেবারে সাদামাটা তামিলে বর্ণনা করার। একবার তিনি আমাকে বলেন, 'নিজের

www.pathagar.com

সময়ে, নিজের জায়গায়, প্রকৃতই নিজে যা, এবং যে স্তরে পৌঁছেছে—ভাল বা খারাপ—তাতে চিরন্তন সত্তার সমগ্রতার মধ্যে প্রতিটা মানুষই হচ্ছে নির্দিষ্ট উপাদান। সুতরাং অসুবিধা, ভোগান্তি আর সমস্যা- সংকট নিয়ে উৎকণ্ঠা কেন? সমস্যা যখন আসবে তখন তোমার ভোগান্তির প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা কর। দুঃখ-দুর্দশা সর্বদা অন্তর্দৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি করে।'

'তোমার কাছে যারা সাহায্য ও উপদেশ নিতে আসে তাদের কেন এ কথা বল না?' বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করি। তিনি আমার কাঁধে হাত রাখেন আর সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকান। কিছুক্ষণ তিনি কিছুই বলেন না, যেন তার কথা উপলব্ধি করার সামর্থ্য আমার আছে কি না বিচার করছিলেন। তারপর তিনি নিচু, গভীর কণ্ঠস্বরে জবাব দিলেন। তার উত্তর অদ্ভূত এক শক্তি আর প্রবল আগ্রহে আমাকে পরিপূর্ণ করে তুলল :

> মানুষ যখনই নিজেকে নিঃসঙ্গ দেখতে পায়, তখন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে সে সঙ্গি খুঁজতে শুরু করে। যখনই তারা কোনও সমস্যায় পড়ে, তখনই কাউকে খুঁজতে থাকে যে তাদের সাহায্য করতে পারবে। যখনই তারা কোনও কানাগলিতে পৌঁছায়, তখনই এমন কাউকে খুঁজতে থাকে যে তাদের বেরিয়ে যাবার পথ দেখাতে পারবে। প্রতিটা পৌনঃপুনিক মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণা, আকুল আকাঙ্খা, এবং কামনা খুঁজে পায় নিজের বিশেষ সাহায্যকারি। নিদারুন যন্ত্রণা নিয়ে যারা আমার কাছে আসে তাদের ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমি একজন মধ্যগ, প্রার্থনার ভিতর দিয়ে অশুভ শক্তির হাত থেকে তাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে। এটা মোটেও সঠিক পথ নয় এবং এটা কখনও অনুসরণ করা উচিৎ নয়। ভাগ্যের ভীতি-তাড়িত দৃশ্য এবং আমাদের আত্মতৃপ্তির শত্রুকে খুঁজে বের করতে যা আমাদের সমর্থ করে সেই দৃশ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে।

আমার মনে পড়ে সূর্যোদয়ের আগে *নামাজ* আদায়ের ভিতর দিয়ে আমার বাবা তার দিন শুরু করতেন ভোর ৪টায়। *নামাজ* শেষে তিনি পায়ে হেঁটে

www.pathagar.com

আমাদের ছোট নারকেল বাগানে যেতেন, আমাদের বাড়ি থেকে বাগানটা ছিল প্রায় ৪ মাইল দূরে। এক সঙ্গে বাঁধা প্রায় এক ডজন নারকেল কাঁধে নিয়ে তিনি ফিরে আসতেন, কেবল তার পরেই নাশতা খেতেন। বয়স ষাট বছর পেরিয়ে যাবার পরও এই ছিল তার রুটিন।

আমি সারা জীবন ধরে আমার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ভিতর দিয়ে চেষ্টা করেছি বাবার সমকক্ষ হতে। যে মৌলিক সত্য বাবা আমার কাছে উন্মোচিত করেছিলেন তা বোঝার জন্য আমি প্রবল চেষ্টা করেছি, আর এই বিশ্বাস অনুভব করেছি যে ঐশ্বরিক শক্তি বলে কোনও সত্তা রয়েছে, যে সত্তা মানুষকে বিভ্রম, দুর্দশা, বিষণ্নতা ও ব্যর্থতা থেকে তুলে নিতে পারে এবং পথ প্রদর্শন করে মানুষকে তার প্রকৃত স্থানে নিয়ে যেতে পারে এবং একবার যদি কোনও ব্যক্তি তার আবেগ ও শরীরগত দাসত্বকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, তাহলেই সে পেয়ে যায় মুক্তি, সুখ ও মানসিক প্রশান্তির পথ।

আমার বাবা যখন রামেশ্বরম থেকে ধানুসকোডি (সেথুক্কারাই নামেও পরিচিত) পর্যন্ত ধর্মযাত্রা করে ফিরে আসার জন্য একটা কাঠের নৌকা তৈরি করার পরিকল্পনা নিলেন, তখন আমার বয়স প্রায় ছয় বছর। আহমেদ জালালুদ্দিন নামের এক আত্মীয়ের সহায়তা নিয়ে আমার বাবা নৌকাটি নির্মাণ করছিলেন সাগরতীরে। জালালুদ্দিন পরে আমার বোন জোহরাকে বিয়ে করেছিল। আমি লক্ষ্য করি নৌকাটি আকার নিচ্ছে। কাঠের আগুনের উত্তাপ দিয়ে পানিরোধক বেষ্টনী ও কাঠাম টেকসই করা হয়েছিল। আমার বাবার নৌকা নির্মাণের কাজ ভালই এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু একদিন ঘন্টায় ১০০ মাইল গতিবেগের সাইক্লোন সেথুক্কারাইয়ের আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে আমাদের নৌকাটি উড়িয়ে নিয়ে গেল। যাত্রী–বোঝাই ট্রেন নিয়ে ভেঙে পড়ল পাম্বান ব্রিজ। এ ঘটনার আগে পর্যন্ত আমি কেবল সমুদ্রের সৌন্দর্য্যই দেখেছিলাম, এখন এর অনিয়ন্ত্রণযোগ্য শক্তি একটা রহস্যের প্রকাশ হিসেবে দেখা দিল আমার কাছে।

নৌকাটির অসময়ে সমাপ্তি যতদিনে ঘটল, ততদিনে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে আহমেদ জালালুদ্দিন, বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও। সে আমার চেয়ে প্রায় ১৫ বছরের বড় ছিল আর আমাকে আজাদ নামে ডাকত। প্রতি সন্ধ্যায় এক সাথে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটতে বেরোতাম। মস্ক স্ট্রিট থেকে হাঁটতে আরম্ভ করে আমরা দ্বীপের বালুময় তীরের দিকে এগিয়ে যেতাম, ওই সময়টায় জালালুদ্দিন ও আমি কথা বলতাম প্রধানত আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে। নানারকম তীর্থের কারণে ওই ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার মতই পরিবেশ ছিল

www.pathagar.com

রামেশ্বরমে। আমরা প্রথমে এসে থামতাম শিব মন্দিরে। এই মন্দিরের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে, দেশের দূরতম প্রান্ত থেকে আসা যে কোনও তীর্থযাত্রীর মত আমরাও, অনুভব করতাম যেন আমাদের ভিতর দিয়ে শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে।

স্রষ্টা সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলত জালালুদ্দিন যেন স্রষ্টার সঙ্গে তার কাজের অংশীদারিত্ব ছিল। তার সমস্ত সন্দেহ সে স্রষ্টার কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করত যেন সে সব নিরসন করার জন্য স্রষ্টা খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অপলকে তাকিয়ে থাকতাম জালালুদ্দিনের দিকে। তারপর তাকাতাম মন্দিরের চারপাশে জড়ো হওয়া তীর্থযাত্রীদের বিশাল ভিড়ের দিকে, তারা সমুদ্রে পূণ্যস্নান করছে, আচার-অনুষ্ঠান পালন করছে এবং প্রার্থনা উচ্চারণ করছে শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে সেই একই অজ্ঞাত-এর উদ্দেশ্যে, যাকে আমরা নিরাকার সর্বশক্তিমান হিসেবে মান্য করি। আমি কখনও সন্দেহ করিনি যে আমাদের মসজিদের প্রার্থনা যেখানে পৌঁছায়, সেই একই গন্তব্যে পৌঁছায় মন্দিরের প্রার্থনাও। আমি শুধু বিস্ময়ে ভাবতাম যে স্রষ্টার সঙ্গে জালালুদ্দিনের অন্য আর কোনও বিশেষ যোগাযোগ আছে কি না। জালালুদ্দিনের বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছিল সীমিত, প্রধানত তাদের পরিবারের অভাব-অনটনের কারণে। হয়তো এই কারণেই আমার লেখাপড়া অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সে আমাকে সব সময় উৎসাহ জোগাত আর দারুণ আনন্দে উপভোগ করত আমার সাফল্য। নিজের ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য জালালুদ্দিনকে কখনও আফসোস করতে দেখিনি আমি। বরং জীবন তাকে যা দিয়েছে তাতেই পূর্ণ কৃতজ্ঞ ছিল সে সব সময়।

ঘটনাক্রমে যে সময়ের কথা আমি বলছি, সেই সময়ে সারা দ্বীপে সে ছিল একমাত্র ব্যক্তি যে ইংরেজি লিখতে পারত। প্রয়োজন হলে যে-কোনও লোকের চিঠি লিখে দিত সে। আমার পরিবারে কিংবা প্রতিবেশীদের মধ্যেও জালালুদ্দিনের সমান শিক্ষা ছিল না অথবা বাইরের দুনিয়ার ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গেও কোনও যোগ ছিল না কারো।

জালালউদ্দিন সবসময় আমাকে বলত শিক্ষিত লোকজন সম্পর্কে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে, সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অর্জনগুলো সম্পর্কে। আমাদের সংকীর্ণ পরিবেশের বাইরে একটা 'সাহসী, নতুন দুনিয়া' সম্পর্কে সেই আমাকে সচেতন করে তুলেছিল।

আমার শৈশবের দীনহীন পরিবেশে বই ছিলো এক দুর্লভ বস্তু। স্থানীয় অবস্থার তুলনায়, যাহোক, এসটিআর মানিকাম–এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটা ছিলো বেশ বড়। এই মানিকাম ছিলো একজন সাবেক বিপ্লবী কিংবা উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী। যতটা পারি পড়ার জন্য সে আমাকে উৎসাহ যোগাত এবং প্রায়ই আমি বই ধার নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে যেতাম।

আরেক ব্যক্তি যে আমার শৈশবের ওপর বিশাল প্রভাব ফেলেছিলো সে হচ্ছে আমার প্রথম চাচাত ভাই শামসুদ্দিন। রামেশ্বরমে সে ছিলো সংবাদপত্রের একমাত্র

www.pathagar.com

পরিবেশক। পাম্বান থেকে সকালের ট্রেনে রামেশ্বরম স্টেশনে এসে পৌঁছোত সংবাদপত্রগুলো। শামসুদ্দিনের সংবাদপত্র এজেন্সি ছিলো একক ব্যক্তির একটা সংগঠন। রামেশ্বরম শহরের এক হাজার শিক্ষিত মানুষের পড়ার চাহিদা মেটাতো সে। এই সংবাদপত্রগুলো প্রধানত কেনা হতো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চলমান অগ্রগতি সম্পর্কে টাটকা খবরাখবর জানার জন্য। এছাড়াও রাশিফল ইত্যাদি জানাও ছিলো পাঠকের লক্ষ্য। বহুজাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কিছু পাঠক আলোচনা করত হিটলার, মহাত্মা গান্ধী ও জিন্নাহ্‌কে নিয়ে। সবকিছুই শেষপর্যন্ত একটা বিষয়ের দিকেই ধাবিত হতো আর সেটা হলো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে পেরিয়ার ইভি রামস্বামীর আন্দোলনের বিপুল রাজনৈতিক প্রবাহ। *দিনমনি* ছিল সর্বাধিক বিক্রিত সংবাদপত্র। যেহেতু মুদ্রিত বিষয় পড়ার সামর্থ্য তখনও আমার হয়নি, তাই শামসুদ্দিন তার গ্রাহকদের কাছে সংবাদপত্রগুলো বিলি করার আগে সেগুলোয় প্রাকশিত ছবিতে নজর বুলিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট হতে হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালে, তখন আমার বয়স আট বছর। কখনই আমি বুঝতে পারিনি এমন সব কারণে বাজারে হঠাৎ করেই বেড়ে গেল তেঁতুল-বিচির চাহিদা। আমি তেঁতুল-বিচি সংগ্রহ করে মস্ক স্ট্রিটের একটা দোকানে বিক্রি করতে থাকি। এক দিনের সংগ্রহে যে এক *আনা* দাম পেতাম তাতেই নিজেকে রাজকুমার মনে হত। যুদ্ধ সম্পর্কে জালালুদ্দিন আমাকে গল্প শোনাত, পরে তার চিহ্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাতাম আমি *দিনমনির* সংবাদ-শিরোনামে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আমাদের এলাকা পুরোপুরি ভাবে যুদ্ধের প্রভাব-মুক্ত ছিল। কিন্তু খুব শীগগিরই মিত্রবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হল ভারত এবং জরুরি অবস্থার মত একটা ঘোষণা দেওয়া হল। রামেশ্বরম স্টেশনে ট্রেন না-থামার অনিশ্চয়তা হিসেবে প্রথম ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিল। সংবাদপত্রগুলো এখন বান্ডিল করে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে দেওয়া হত রামেশ্বরম ও ধানুসকোডির মধ্যবর্তী রামেশ্বরম রোডে। এর ফলে বান্ডিল ধরার কাজে একজন সাহায্যকারী খুঁজে নিতে বাধ্য হল শামসুদ্দিন আর, যেন স্বাভাবিক ভাবেই, আমাকেই নিয়োগ করা হল ওই কাজে। এভাবে আমার প্রথম রোজগার অর্জনে সাহায্য করল শামসুদ্দিন। অর্ধ-শতাব্দী পর, এখনও আমি প্রথমবারের মত নিজের অর্থ উপার্জনের সেই গর্ব অনুভব করি।

প্রতিটা শিশুই কিছু পরিমাণ বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে একটা নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও আবেগপূর্ণ পরিবেশে. আর নির্দিষ্ট পন্থায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের দ্বারা। আমি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলাম সততা ও আত্ম-শৃঙ্খলা ; মায়ের কাছ থেকে ধার্মিকতা ও গভীর দয়ালুতার বিশ্বাস। আমার মত আমার তিন ভাই ও বোনও

www.pathagar.com

এসব পেয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। কিন্তু জালালুদ্দিন ও শামসুদ্দিনের সঙ্গে যে সময় আমি কাটিয়েছিলাম, সেই সময়ই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিল আমার শৈশবের অনন্যতায়, এবং আমার পরবর্তী জীবনে সকল পার্থক্য রচনা করে দিয়েছিল।

শৈশবে আমার তিনজন বন্ধু ছিল ঘনিষ্ঠ—রামানাধা শাস্ত্রী, অরবিন্দন এবং শিবপ্রকাশন। এরা ছিল গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের। শিশু ছিলাম বলেই আমাদের ধর্মীয় পার্থক্য ও লালন-পালন থেকে সৃষ্ট কোন পার্থক্যই নিজেদের মধ্যে আমরা কেউই অনুভব করতাম না। বস্তুত রামানাধা শাস্ত্রী ছিলো পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর ছেলে, পক্ষী ছিলেন রামেশ্বরম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। পরে রামানাধা রামেশ্বরম মন্দিরের পৌরহিত্যের দায়িত্ব নিয়েছিলো তার বাবার কাছ থেকে, 'সফররত তীর্থযাত্রীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার ব্যবসায় জড়িয়েছিলো অরবিন্দন' এবং শিব প্রকাশ ক্যাটারিং কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ নিয়েছিলো সাউদার্ন রেলওয়েজে।

বার্ষিক শ্রীসীতারামকল্যাণম উৎসব চলাকালে আমাদের পরিবার মন্দির থেকে বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলে প্রভূর প্রতীক নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি পাটাতনযুক্ত নৌকার ব্যবস্থা করত, অনুষ্ঠানস্থলটি ছিলো পুকুরের মাঝখানে আর ঐ জায়গাটিকে বলা হতো রামতীর্থ, জায়গাটা ছিলো আমাদের বাড়ির খুব কাছেই। আমার মা ও দাদী রাতের বেলা বিছানায় আমাদের পরিবারের বাচ্চাদের *রামায়ণ* থেকে নানা কাহিনী এবং রসুলের জীবনের নানা গল্প শোনাতেন। রামেশ্বরম এলিমেন্টারী স্কুলে আমি যখন ফিফথ-স্টান্ডার্ড 'এর ছাত্র তখন একদিন নতুন এক শিক্ষক এলেন আমাদের ক্লাসে। আমি একটা টুপি পরতাম মাথায় যাতে করে বোঝা যেত আমি একজন মুসলিম এবং আমি সবসময় সামনের সারিতে রামানাধা শাস্ত্রীর পাশে বসতাম, সে একটা পৈতে পরত। মুসলিম এক বালকের সঙ্গে একজন হিন্দু পুরোহিতের পুত্র বসবে তা সহ্য করতে পারলেন না নতুন শিক্ষক। তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমাদের সামাজিক মর্যাদা মোতাবেক আমাকে বলা হলো উঠে গিয়ে পিছনের বেঞ্চিতে বসতে। আমি খুব দুঃখ অনুভব করলাম, আর রামানাধা শাস্ত্রীও দুঃখ পেল। পিছনের সারিতে যখন আমি চলে গেলাম তখন সে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলো। পিছনের সারিতে আমি চলে যাবার সময় তার কান্নার দৃশ্য একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে রাখলো আমার মনের ওপর।

স্কুল শেষ হবার পর আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম আর আমাদের শ্রদ্ধেয় বাবা-মাকে এই ঘটনা সম্পর্কে বললাম। লক্ষ্মণা শাস্ত্রী ঐ শিক্ষককে ডেকে পাঠালেন এবং আমাদের উপস্থিতিতে তাকে বললেন যে নির্দোষ শিশুদের অন্তরে সামাজিক অসাম্য এবং সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার বিষ ছড়ানো তার উচিৎ নয়। তিনি শিক্ষককে বললেন হয় ক্ষমা চাইতে নয়তো স্কুল ছেড়ে দিয়ে দ্বীপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে। শিক্ষক শুধু তার ব্যবহারের জন্যেই দুঃখ প্রকাশ করলেন তাই নয় লক্ষ্মণা শাস্ত্রীর সুদৃঢ় মনোভাব তার মনটাকে সংস্কারও করে দিলো।

www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে রামেশ্বরমের ছোট সমাজটি ছিলো বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষদের নিয়ে গঠিত। যাই হোক, আমার বিজ্ঞান শিক্ষক শিবসুব্রামানিয়া আয়ার ছিলেন এক ধরনের বিদ্রোহী, যদিও তিনি নিজে ছিলেন গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের এবং তার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। সামাজিক বাধাগুলো ভেঙে ফেলার জন্য তিনি সর্বোত্তম চেষ্টা চালিয়েছিলেন যাতে করে বিভিন্ন স্তরের লোকজন সহজভাবে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। তিনি আমার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতেন এবং বলতেন, 'কালাম, আমি তোমার উন্নতি চাই যাতে করে বড় শহরের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তুমি অবস্থান করতে পারো।'

একদিন তিনি আমাকে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তার স্ত্রী ধর্মীয়ভাবে পবিত্র তার রান্নাঘরে বসে খাওয়ার জন্য একজন মুসলমান বালককে নিমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এই চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। রান্নাঘরে তিনি আমাকে খাবার দিতে অস্বীকার করলেন। শিবসুব্রামানিয়া আয়ার মোটেও থমকে গেলেন না, স্ত্রীর প্রতি রাগও করলেন না, বরং তিনি আমাকে নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করলেন এবং খাবার খাওয়ার জন্য আমার পাশেই বসে পড়লেন। তার স্ত্রী রান্নাঘরের দরজার পিছন থেকে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবলাম যেভাবে আমি ভাত খেলাম, পানি পান করলাম কিংবা খাবার পর মেঝে পরিষ্কার করলাম তার মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন কি-না। তার বাড়ি থেকে চলে আসার সময় শিবসুব্রামানিয়া আয়ার আবারও তার সঙ্গে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন আমাকে পরের সপ্তাহান্তে। আমার ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে তিনি আমাকে হতাশ হতে নিষেধ করে বললেন, 'একবার যদি তুমি প্রথা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে এ ধরনের সমস্যা তোমাকে মোকাবেলা করতে হবে।' পরের সপ্তাহে আমি যখন তার বাড়িতে গেলাম, শিবসুব্রামানিয়া আয়ারের স্ত্রী আমাকে তার রান্নাঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং নিজের হাতে আমাকে খাবার দিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিলো। আর ভারতের স্বাধীনতাও ছিলো অত্যাসন্ন। 'ভারতীয়রা নিজেরাই নির্মাণ করবে নিজেদের ভারত', ঘোষণা দিলেন গান্ধীজী। এক অপরিমেয় আশাবাদে পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো সারা দেশ। জেলা সদর রামনাথপুরম-এ গিয়ে লেখাপড়ার জন্য রামেশ্বরম্ ত্যাগ করার অনুমতি চাইলাম আমি বাবার কাছে।

যেন সশব্দে চিন্তা করছেন এমনভাবে তিনি বললেন, 'আবুল! আমি জানি বড় হবার জন্য তোমাকে দূরে যেতে হবে। সূর্যের নীচে কি সীগাল ওড়ে না, একাকী ও বাসাহীন? তোমার বিশাল আকাঙ্খার স্থানে পৌঁছানোর জন্য তোমার স্মৃতির দেশের প্রতি তোমার আকুল আকাঙ্খা অবশ্যই তুমি ছাড়িয়ে যাবে, আমাদের ভালোবাসা তোমাকে বাঁধবে না আর আমাদের প্রয়োজনও তোমাকে আটকে

www.pathagar.com

রাখবে না।' কাহলিল জিবরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আমার দ্বিধাগ্রস্থ মাকে বললেন, 'তোমার সন্তান তোমার নয়। তারা জীবনের পুত্র ও কন্যা। তারা তোমার ভিতর দিয়ে এসেছে কিন্তু তোমার থেকে আসেনি। তুমি তাকে হয়ত তোমার ভালোবাসা দিতে পারো কিন্তু তোমার চিন্তা দিতে পার না। যেহেতু তাদের নিজস্ব চিন্তা আছে।'

তিনি আমাকে ও আমার তিন ভাইকে মসজিদে নিয়ে গেলেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে সুরা *আল ফাতিহা* পাঠ করলেন। রামেশ্বরম্ *স্টেশনে* ট্রেনে আমাকে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'এই দ্বীপ হয়ত তোমার দেহের আবাস হতে পারে কিন্তু তোমার আত্মার নয়। তোমার আত্মা বাস করে আগামীর বাড়িতে যেখানে রামেশ্বরমের আমরা কেউই যেতে পারি না, এমনকি আমাদের স্বপ্নেও নয়। স্রষ্টা তোমার মঙ্গল করুন, আমার বাছা!'

শামসুদ্দিন ও আহমেদ জালালুদ্দিন রামনাথপুরম পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলো আমাকে শোয়ার্টজ হাই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া এবং সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। রামনাথপুরম ছিলো প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের একটা দুর্দান্ত শহর, কিন্তু রামেশ্বরমের বৈচিত্র্য এবং সুসঙ্গতি সেখানে ছিলো অনুপস্থিত। আমি বাড়ির অভাব খুবই অনুভব করতাম আর রামেশ্বরমে যাবার প্রতিটা সুযোগই আঁকড়ে ধরতাম। রামনাথপুরমে শিক্ষা সুযোগের টান মোটেও জোরালো ছিলো না অন্তত আমার মায়ের তৈরি দক্ষিণ ভারতীয় মিষ্টি *পোলির* আকর্ষণের চেয়ে। বস্তুত বারো প্রকার এই মিষ্টি তিনি তৈরি করতে পারতেন, যেসব উপাদান দিয়ে মা এই মিষ্টি তৈরি করতেন তার প্রত্যেকটার আলাদা সৌরভ বের করে আনার সামর্থ্য ছিলো তার।

আমার গৃহকাতরতা সত্ত্বেও নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আমি দৃঢ়চিত্ত ছিলাম, কারণ আমি জানতাম বাবা আমার সাফল্য সম্পর্কে বিপুল আশা করেছিলেন। বাবা আমাকে কালেক্টর হিসেবে কল্পনা করেছিলেন এবং আমি ভেবেছিলাম বাবার স্বপ্ন বাস্তব করে তোলা আমার কর্তব্য, যদিও রামেশ্বরমের আরাম- আয়েশ, নিরাপত্তা ও পরিচিত বলয়ের অভাব আমি দুর্দান্তভাবে অনুভব করছিলাম।

ইতিবাচক চিন্তাশক্তি সম্পর্কে জালালুদ্দিন আমার সঙ্গে কথা বলত এবং আমি প্রায়ই গৃহকাতরতা অথবা বিষণ্নতা অনুভব করলে তার সেই কথাগুলো স্মরণ করতাম। যেমনটা সে বলেছিলো তা করার জন্য আমি কঠিন চেষ্টা করতাম, তাতে আমার চিন্তা ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম, এবং তাতে আমার লক্ষ্যের উপর প্রভাব পড়ত। ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সেই লক্ষ্য আমাকে রামেশ্বরমে ফিরিয়ে নিয়ে যায়নি, বরং আমাকে আরও অনেক দূর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আমার শৈশবের বাড়ি থেকে।

www.pathagar.com

২

রামনাথপুরমে শোয়ার্ট্জ হাই স্কুলে আমি একটু গুছিয়ে নেবার পর আমার ভিতরের পনের-বছর-বয়স্ক মানুষটা আবার জেগে উঠল। আমার শিক্ষক, ইয়াডুরাই সলোমন, ছিলেন তরুণ মনের জন্য এক আদর্শ গাইড, যে মন তখনও জানে না তার সামনে কী রকম সম্ভাবনা আর বিকল্প ধারা পড়ে আছে। নিজের উষ্ণ ও খোলামেলা মনোভাব দিয়ে ক্লাসে তিনি তার ছাত্রদের মনে স্বস্তি জাগিয়ে তুলতেন। তিনি বলতেন যে একজন খারাপ ছাত্র একজন দক্ষ শিক্ষকের কাছ থেকে যা শিখতে পারে তার চেয়ে একজন ভাল ছাত্র একজন খারাপ শিক্ষকের কাছ থেকে অনেক বেশি শিখতে পারে।

রামনাথপুরমে আমার অবস্থানকালে তার সাথে আমার যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তা ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার সাহচর্যে আমি শিখেছিলাম যে, যে-কোনও ব্যক্তি তার নিজের জীবনের ঘটনাবলীর ওপর বিপুল প্রভাব খাটানোর অনুশীলন আয়ত্ব করতে পারে। ইয়াডুরাই সলোমন বলতেন, 'জীবনে সফল হতে হলে আর ফলাফল অর্জন করতে হলে, তোমাকে অবশ্যই তিনটে প্রবল শক্তি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আর সেগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করতে হবে— আকাঙ্খা, বিশ্বাস, আর প্রত্যাশা।'

ইয়াডুরাই সলোমন, পরবর্তীকালে যিনি হয়েছিলেন একজন রেভারেন্ড, আমাকে শিখিয়েছিলেন যে কোনও কিছু ঘটুক বলে আমি যা চাই তার আগে

www.pathagar.com

আমাকে তা কামনা করতে হবে এবং আমাকে পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে হবে যে তা ঘটবে। আমার নিজের জীবন থেকেই একটা উদাহরণ টানা যেতে পারে। একেবারে শৈশবকালে আমি মোহাবিষ্ট হতাম আকাশের রহস্যময়তায় ও পাখিদের উড্ডয়নে। আমি সারস ও সীগালের উড্ডয়ন লক্ষ্য করতাম আর ওড়ার জন্য আকুল হতাম। যদিও মফঃস্বলের বালক ছিলাম, তবুও আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে এক দিন আমিও আকাশে ভাসব। প্রকৃত পক্ষে আমি *ছিলাম* রামেশ্বরমের প্রথম শিশু যে আকাশে উড়েছিল।

ইয়াডুরাই সলোমন ছিলেন এক মহান শিক্ষক, কারণ সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মূল্য সম্পর্কে একটা বোধ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সলোমন আমার আত্ম-শক্তি উঁচুতে তুলে দিয়েছিলেন আর আমাকে প্রভাবিত করেছিলেন, আমি তো ছিলাম সেই মা-বাবার সন্তান শিক্ষার সুবিধা থেকে যারা বঞ্চিত হয়েছিলেন, তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে যা ইচ্ছা করি তা হবার সামর্থ্য আমার আছে। 'মনে বিশ্বাস থাকলে, তোমার ভাগ্য তুমি পরিবর্তন করতে পারবে', তিনি বলতেন।

একদিন, আমি তখন ফোর্থ ফর্মে পড়ি, আমার গণিত শিক্ষক রামকৃষ্ণ আয়ার অন্য এক ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন। অন্যমনস্কতার কারণে আমি ওই শ্রেণীকক্ষে ঢুকে পড়ি আর পুরাতন প্রথা অনুযায়ী রামকৃষ্ণ আয়ার আমার ঘাড় চেপে ধরেন আর পুরো ক্লাসের সামনে আমাকে বেত মারেন। বেশ কয়েক মাস পর, যখন গণিতে আমি ফুল মার্ক পেয়েছি, সকালের অ্যাসেম্বলিতে গোটা স্কুলের সামনে ঘটনাটা বর্ণনা করে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন। 'যাকেই আমি বেত মারি সেই মহান ব্যক্তিতে পরিণত হয়! আমার কথাটা মনে রেখ তোমরা, এই ছেলেটা তার স্কুল ও শিক্ষকদের জন্য গৌরব বয়ে আনবে।' আগের যন্ত্রণা উশম হয়েছিল তার এই প্রশংসায়!

শোয়ার্টজ-এ আমার লেখাপড়া যখন সম্পূর্ণ হল, তখন আমি নিজের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসী এক বালক। আরও পড়াশোনা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে এক সেকেন্ডও ভাবতে হয়নি। সেই সব দিনে আমাদের কাছে পেশাগত শিক্ষার সম্ভাবনা বলতে কিছু ছিল না ; উচ্চ শিক্ষা বলতে বোঝাত কলেজে পড়া। সবচেয়ে কাছের কলেজটি ছিল তিরুচ্চিরাপ্পল্লিতে, সেকালে লেখা হত ত্রিচিনোপলি, এবং সংক্ষেপে ত্রিচি।

১৯৫০ সালে আমি উপস্থিত হলাম ত্রিচির সেন্ট জোসেফ্'স কলেজে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করতে। পরীক্ষার গ্রেড অনুযায়ী আমি খুব উজ্জ্বল ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু রামেশ্বরমে আমার দুই বন্ধুকে ধন্যবাদ, আমি এক রকম ধৈর্য-গুণ অর্জন করেছিলাম বাস্তবিক অর্থেই।

www.pathagar.com

শোয়ার্টজ থেকে যখনই আমি রামেশ্বরমে ফিরে যেতাম, আমার বড় ভাই মুস্তাফা কামাল তখনই আমাকে তার কাজে একটু সাহায্য করার জন্য ডেকে নিত, রেলওয়ে স্টেশন রোডে একটা মুদি দোকান চালাত সে, আর আমার দায়িত্বে দোকান ছেড়ে দিয়ে কয়েক ঘন্টার জন্য উধাও হয়ে যেত। আমি বিক্রি করতাম তেল, পেঁয়াজ, চাল এবং অন্যান্য দ্রব্য। আমি আবিষ্কার করলাম সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেশি বিক্রি হয়ে যায় সিগারেট ও বিড়ি। অবাক হয়ে ভাবতাম, গরীব মানুষেরা তাদের কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ এভাবে ধোঁয়া গিলে উড়িয়ে দেয় কেন। মুস্তাফাকে সাহায্য করতে না হলে আমার ছোটভাই কাশিম মোহাম্মদের কিওস্কে বসতাম আমি। সেখানে বিক্রি করতাম সমুদ্র শঙ্খ দিয়ে তৈরি নানা প্রকার সৌখিন দ্রব্য।

সেন্ট জোসেফ্'স-এ রেভারেন্ড ফাদার টিএন সেকুয়েইরার মত একজন শিক্ষককে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন, তাছাড়াও ছিলেন আমাদের হোস্টেল ওয়ার্ডেন। তিনতলা হোস্টেল ভবনে আমরা প্রায় একশ' শিক্ষার্থী বসবাস করতাম। রেডারেন্ড ফাদার হাতে একটা বাইবেল নিয়ে প্রতি রাতে প্রত্যেকটি ছেলের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তার শক্তি ও ধৈর্য ছিল বিস্ময়কর। ছেলেদের প্রতিটা মুহূর্তের যত্ন নিতেন তিনি পরম কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে। দীপাবলীতে, তার নির্দেশে, হোস্টেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্রাদার ও উৎসবের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিটা কক্ষে গিয়ে ধর্মীয় স্নানের জন্য চমৎকার গিঙ্গেলি তেল বিতরণ করত।

সেন্ট জোসেফ্'স ক্যাম্পাসে আমি চার বছর ছিলাম। আমার কামরায় আমি ছাড়া আরও দুজন থাকত। একজন ছিল শ্রীরঙ্গমের এক গোঁড়া আয়েঙ্গার আর অন্যজন কেরালার এক সিরিয়ান খৃস্টান। আমরা তিনজন একসঙ্গে দারুণ একটা সময় কাটিয়েছিলাম। হোস্টেলে আমার তৃতীয় বর্ষ চলাকালে আমাকে নিরামিষ মেসের সচিব বানানো হলে আমরা রোববারের মধ্যাহ্নভোজে রেক্টর রেভারেন্ড ফাদার কালাথিলকে আমন্ত্রণ জানাই। আমাদের মেনুতে ছিল নানা রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার। ফলাফল ছিল অপ্রত্যাশিত, তবে রেভারেন্ড ফাদার আমাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেননি। রেভারেন্ড ফাদার কালাথিলের সঙ্গে প্রতিটা মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছিলাম, তিনি শিশুসুলভ উৎফুল্লতা নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন আমাদের চপল কথাবার্তায়। আমাদের সবার জন্য সেটা ছিল এক স্মরণীয় ঘটনা।

সেন্ট জোসেফ'স-এ আমার শিক্ষকরা ছিলেন কাঞ্চি পরমাচার্যের খাঁটি অনুগামী। পরমাচার্য 'দান ক্রিয়া উপভোগ' করতে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করতেন। ক্যাম্পাসে এক সাথে হেঁটে বেড়ানো আমাদের গণিত শিক্ষক অধ্যাপক থোথাথ্রি আয়েঙ্গার ও অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রীর বর্ণিল স্মৃতি আজও আমার মনে প্রেরণা জোগায়।

সেন্ট জোসেফ'স-এ আমি যখন শেষ বর্ষে তখন ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে। আমি মহান ধ্রুপদী সাহিত্যিকদের রচনা পড়তে শুরু করি,

www.pathagar.com

তলস্তয়, স্কট ও হার্ডি ছিল আমার বিশেষ রকমের প্রিয়, তারপর আমি দর্শন বিষয়ক রচনাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হই। ঠিক এই সময়টাতেই পদার্থবিদ্যার প্রতি সৃষ্টি হয় আমার বিপুল আগ্রহ।

সেন্ট জোসেফ'স-এ পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক চিন্না ডুরাই ও অধ্যাপক কৃষ্ণমূর্তি সাবঅ্যাটোমিক ফিজিক্স বিষয়ে পাঠ দিতেন। তার ফলে বস্তুর রেডিও অ্যাকটিভ ক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় ও হাফ-লাইফ পিরিয়ডের ধারণার সাথে আমার পরিচয় ঘটে। রামেশ্বরমে আমার বিজ্ঞান শিক্ষক শিবসুব্রামানিয়া আয়ার আমাকে কখনও শেখাননি যে অধিকাংশ সাবঅ্যাটোমিক বস্তু অস্থির এবং অন্য বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর সেগুলো বিভাজিত হয়ে যায়। এসব বিষয় আমি জানতে পারছিলাম প্রথমবারের মত। কিন্তু যখন তিনি আমাকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কঠোরভাবে চেষ্টা করার শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেহেতু সকল যৌগিক বস্তুতে ক্ষয় হচ্ছে সহজাত ব্যাপার, তখন কি আসলে তিনি একই বিষয়ে কথা বলছিলেন না? আমি ভাবি, কেন কিছু মানুষ মনে করে বিজ্ঞান মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় খোদার কাছ থেকে? আমি এটাকে যেভাবে দেখি তাহল বিজ্ঞানের পথ সর্বদা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। আমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান হচ্ছে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি ও আত্ম-উপলব্ধির পথ।

এমন কি বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাও রূপকথার বাসা হতে পারে। আমি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক বইয়ের আগ্রহী পাঠক এবং মহাকাশের বস্তু সম্পর্কে পড়তে আনন্দ পাই। আমাকে স্পেস ফ্লাইটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করার সময় অনেক বন্ধু কখনও কখনও জ্যোতিষি বিদ্যার মধ্যে ঢুকে পড়েন। সততার সঙ্গে বললে বলতে হয়, আমাদের সৌরজগতে অবস্থিত দূরবর্তী গ্রহসমূহের প্রতি লোকদের বিপুল গুরুত্ব দেওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে তা আমি সত্যি কখনও বুঝতে পারিনি। শিল্প হিসেবে জ্যোতিষিবিদ্যার বিরুদ্ধে বলার আমার কিছুই নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে তাকে গ্রহণযোগ্য করতে চাইলে তা আমি বাতিল করে দেব। আমি জানি না গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং এমনকি উপগ্রহ সম্পর্কেও এইসব মিথ কিভাবে উদ্ভূত হয়েছিলো। আর সেই মিথ অনুযায়ী লোকেরা বিশ্বাস করে যে এইসব বস্তু মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। আমি যেমনটা মনে করি, পৃথিবী হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী গ্রহ। জন মিলটন এ বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার Paradise Lost কবিতায় ঃ

..... What if the Sun
Be center to the World, and other stars...
The planet earth, so steadfast though she seem,
In sensibly three different motions move?

এই গ্রহের যেখানেই তুমি যাও সেখানেই তুমি দেখতে পাবে গতি আর জীবন। এমনকি আপাত দৃষ্টিতে অনড় বস্তু যেমন পাথর, ধাতু, কাঠ, মাটি ইত্যাদি

www.pathagar.com

সব কিছুই গতিময়তায় পূর্ণ— কারণ এসবের প্রতিটা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে অবিরাম নেচে চলেছে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের দ্বারা সেগুলোর উপর আরোপিত অবরোধের প্রতি সাড়া দিতে এই গতি উৎপন্ন হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা যা চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব সেগুলোকে কাছাকাছি ধরে রাখতে। নির্দিষ্ট পরিমান শক্তি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি মানুষের মতই ইলেকট্রনও অবরোধ পছন্দ করে না। নিউক্লিয়াস যত শক্ত করে ইলেকট্রনকে ধরে রাখবে, ইলেকট্রনের ঘুর্ণনবেগও তত বেশি হবে ঃ বস্তুত একটি অণুতে ইলেকট্রনের আটক অবস্থার ফলাফল থেকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার ঘুর্ণন গতির সৃষ্টি হতে পারে! এই উঁচু বেগমাত্রার কারণে এটমকে অনমনীয় অবস্থার মত মনে হয়, ঠিক যেমন অতিদ্রুতগতিতে ঘূর্ণায়মান ফ্যানকে একটা চাকতির মতো মনে হয়। আরও জোরালোভাবে এটমের ওপর চাপ প্রয়োগ করা খুবই অসুবিধাজনক—এভাবে বস্তুসমূহ পরিচিত কঠিন অবয়ব পেয়ে থাকে। প্রতিটা কঠিন বস্তু, এভাবে, নিজের মধ্যে প্রচুর খালি জায়গা ধারণ করে এবং অনড় সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে ধারণ করে বিপুল গতি। ব্যাপারটা এমন যেন আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটা মূহূর্তে পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিবের নাচ।

যখন আমি সেন্ট জোসেফ'স-এ বি. এসসি. ডিগ্রি কোর্সে যোগ দিই, তখনও আমি উচ্চ শিক্ষার অন্য আর কোনও সুযোগ সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। বিজ্ঞানের একজন ছাত্রের জন্য সহজলভ্য চাকরির সুযোগ সম্পর্কেও আমার কোনও তথ্য জানা ছিল না। একটা বি. এসসি. ডিগ্রি অর্জনের পরই কেবল আমি উপলব্ধি করি যে পদার্থবিদ্যা আমার বিষয় নয়। আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে। অনেক আগেই আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে যোগ দিতে পারতাম, ঠিক আমার ইন্টারমিডিয়েট কোর্স শেষ করার পর পরই। কখনও না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়াও ভাল, এই কথা আমি নিজেকে বললাম মাদ্রাজ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে (এমআইটি) ভর্তির আবেদন জমা দিয়ে। সেই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কারিগরি শিক্ষার মনিরত্ন।

নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকায় আমার নাম উঠল, কিন্তু এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রায় এক হাজার রূপি প্রয়োজন, কিন্তু আমার বাবার পক্ষে অত টাকা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। সেই সময় আমার বোন জোহরা আমার পাশে দাঁড়াল, নিজের সোনার বালা ও চেইন বন্ধক রেখে আমাকে সে টাকা জোগাড় করে দিল। আমার সামর্থ্যের প্রতি তার এই বিশ্বাস আর আমাকে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে দেখতে চাওয়ার তার এই দৃঢ়তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। নিজের উপার্জিত অর্থে বন্ধকি থেকে তার বালা ছাড়িয়ে আনার শপথ নিলাম আমি। সময়ের ওই পর্যায়ে টাকা উপার্জনের যে একটা মাত্র উপায় আমার সামনে ছিল তা হল কঠিন ভাবে পড়াশোনা করে একটা বৃত্তি অর্জন করা। আমি পুরো দমে সামনে এগিয়ে চললাম।

www.pathagar.com

এমআইটিতে আমাকে সবচেয়ে বেশি মোহাবিষ্ট করেছিল দুটো অব্যবহৃত বিমান পোত। ফ্লাইং মেশিনের নানারকম সাবসিস্টেম প্রদর্শনের জন্য ও দুটো রাখা হয়েছিল। ওগুলোর প্রতি অদ্ভূত এক আকর্ষণ অনুভব করতাম আমি, আর অন্য শিক্ষার্থীরা হোস্টেলে ফিরে যাওয়ার পরও দীর্ঘ সময় ওগুলোর নিকটে বসে থাকতাম, আকাশে মুক্তভাবে ওড়ার, পাখির মত, মানুষের ইচ্ছায় মুগ্ধ। আমার প্রথম বর্ষ সম্পূর্ণ করার পর, যখন একটা বিশেষ শাখা বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, আমি তাৎক্ষণিকভাবে নিজের জন্য পছন্দ করলাম অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এত দিনে লক্ষ্যটা আমার মনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল : আমি বিমান ওড়াতে চলেছি। এ ব্যাপারে আমি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলাম, আমার জেদের অভাব সত্ত্বেও, যা সম্ভবত এসেছিল আমার দারিদ্র্যের পটভূমি থেকে। এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করি। এতে হতাশা ছিল, কিন্তু আমার বাবার উৎসাহব্যাঞ্জক কথা আমাকে স্থির রেখেছিল। 'যে অন্যদের জানে সে শিক্ষিত, কিন্তু জ্ঞানী হল সেই ব্যক্তি যে নিজেকে জানে। জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা কোন কাজে আসে না।'

এমআইটিতে আমার কোর্সে তিনজন শিক্ষক আমার ভাবনাকে আকৃতি দিয়েছিলেন। তাদের সমন্বিত অবদান ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল যার উপর পরে আমি আমার পেশাগত ক্যারিয়ার নির্মাণ করি। এই তিনজন শিক্ষক হলেন অধ্যাপক স্পন্ডার, অধ্যাপক কেএভি পান্ডালাই ও অধ্যাপক নরসিংহ রাও। তাদের প্রত্যেকেরই ছিল অত্যন্ত উঁচু ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তাদের সবারই একটা বিষয় ছিল অভিন্ন— ছাত্রদের মেধার ক্ষুধা মেটানোর সামর্থ্য।

অধ্যাপক স্পন্ডার আমাকে পড়াতেন টেকনিক্যাল অ্যারোডাইনামিক্স। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে সমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অস্ট্রিয়ান ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে নাৎসিদের হাতে তিনি বন্দি হয়েছিলেন এবং একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটক থাকেন। বোধগম্য কারণেই জার্মানদের প্রতি তার মধ্যে বিরাগ সৃষ্টি হয়েছিলো। ঘটনাচক্রে, অ্যারোনটিক্যাল বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন জার্মান, অধ্যাপক ওয়াল্টার রেপেনথিন। আরেকজন সুপরিচিত অধ্যাপক, ড. কুর্ট ট্যাংক, ছিলেন খ্যাতিমান অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যিনি এক-আসন বিশিষ্ট জার্মান ফাইটার বিমান Focke—Wulf FW 190-এর নকশা তৈরি করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেটি ছিল অনন্যসাধারণ জঙ্গি বিমান। ড. ট্যাংক পরে বাঙ্গালোরে অবস্থিত হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল)-এ যোগ দেন এবং ভারতের প্রথম জেট ফাইটার HF-24 Marut-এর নকশার দায়িত্ব পান।

এ অবস্থার মধ্যেও অধ্যাপক স্পন্ডার নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেন এবং উঁচু পেশাগত মান বজায় রাখেন। তিনি সব সময় ছিলেন শান্ত, উদ্যমী আর

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রিত। তিনি সর্বসাম্প্রতিক প্রযুক্তির সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতেন এবং চাইতেন তার ছাত্ররাও তাই করুক। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ভর্তি হওয়ার আগে আমি তার পরামর্শ নিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, নিজের ভবিষ্যৎ আশা নিয়ে কারো উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ নয় কখনও। তার চেয়ে বরং পর্যাপ্ত ভিত্তি স্থাপন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক স্পন্ডার লক্ষ্য করতেন যে, শিক্ষা সুযোগ বা শিল্প অবকাঠামোর অভাব ভারতীয়দের কোনও সমস্যা নয় — তাদের সমস্যা ছিল শৃঙ্খলা ও তাদের পছন্দকে যুক্তিবাদী করে তোলার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার ব্যর্থতা। অ্যারোনটিক্স কেন? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নয় কেন? কেন নয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং? সকল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীকে আমি নিজে বলব যে, যখন তারা নিজেদের বিশেষ ক্ষেত্রে পছন্দ করবে, তখন অপরিহার্য ভাবে বিবেচনা করতে হবে যে ওই পছন্দ তাদের ভিতরকার অনুভূতি ও উচ্চাকাঙ্খা প্রকাশ করছে কি না।

অধ্যাপক কেএভি পান্ডালাই আমাকে শেখাতেন অ্যারো-স্ট্রাকচার ডিজাইন ও বিশ্লেষণ। তিনি ছিলেন সদা উৎফুল্ল, বন্ধু ভাবাপন্ন ও উদ্যমী শিক্ষক, প্রতি বছরের শিক্ষা কোর্সে তিনি নিয়ে আসতেন তরতাজা মনোভঙ্গি। অধ্যাপক পান্ডালাই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের কাছে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গুপ্তবিষয় উন্মোচন করেছিলেন। এমন কি আজও আমি বিশ্বাস করি, অধ্যাপক পান্ডালাইয়ের শিক্ষা যারা পেয়েছে তারা সবাই একমত হবে যে তিনি ছিলেন মহান পন্ডিত ব্যক্তি — কিন্তু তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ গর্বও পরিলক্ষিত হত না। শ্রেণী-কক্ষে বিভিন্ন পয়েন্টে তার সঙ্গে অমত পোষণ করার স্বাধীনতা ছিল তার ছাত্রদের।

অধ্যাপক নরসিংহ রাও গণিতবিদ, তিনি আমাদের পড়াতেন তাত্ত্বিক অ্যারোডাইনামিক্স। আমি এখনও তার ফ্লুইড ডাইনামিক্স শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি স্মরণ করতে পারি। তার ক্লাসগুলোয় হাজির হওয়ার পর, অন্য যে কোনও বিষয়ের তুলনায় আমি গাণিতিক পদার্থবিদ্যা বেশি পছন্দ করতে শুরু করলাম। প্রায়ই আমি অ্যারোনটিক্যাল ডিজাইন পর্যালোচনা করার জন্য একটা 'সার্জিক্যাল নাইফ' বহন করি। অ্যারোডাইনামিক প্রবাহের সমীকরণ করতে প্রমাণাদি গ্রহণে অধ্যাপক রাওয়ের সদয় পরামর্শ যদি না পেতাম, তাহলে এই রূপক যন্ত্রটা আমি অর্জন করতে পারতাম না।

অ্যারোনটিকস একটা মোহনীয় বিষয়, এটা নিজের মধ্যে ধারণ করে আছে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। স্বাধীনতা ও পলায়নের মধ্যে, গতি ও আন্দোলনের মধ্যে, ধ্বস ও প্রবাহের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে তা এই বিজ্ঞানের রহস্য। এই সত্য আমার সামনে উন্মোচন করেছিলেন আমার শিক্ষকরা। তাদের অমূল্য শিক্ষার ভিতর দিয়ে তারা আমার মধ্যে অ্যারোনটিকস সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের মেধা, চিন্তার স্বচ্ছতা আর বিশুদ্ধতার জন্য কামনা আমাকে চালিত করেছিল চাপ প্রয়োগযোগ্য মধ্যম গতির ফ্লুইড ডাইনামিকস-মোডস, শক

www.pathagar.com

ওয়েভ সৃষ্টি ও শক, ক্রমবর্ধমান গতিতে ফ্লো সেপারেশন উদ্দীপ্ত করা, শক স্টল ও শক-ওয়েভ ড্র্যাগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পড়াশোনার মধ্যে ঢুকে যেতে।

ধীরে ধীরে আমার মনে জায়গা নিল তথ্যের বিপুল ভান্ডার। এরোপ্লেনের কাঠামগত অবয়ব নতুন অর্থ নিতে লাগল— বাইপ্লেন, মনোপ্লেন, টেইললেস প্লেন, ক্যানার্ড কনফিগারড্ প্লেন, ডেল্টা-উইং প্লেন, এ সমস্ত কিছু আমার জন্য ধারণ করতে আরম্ভ করল ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব। তিন শিক্ষক, স্ব স্ব ক্ষেত্রে তারা সবাই ছিলেন কর্তাব্যক্তি, আমাকে সাহায্য করেছিলেন একটা যৌগিক জ্ঞান সন্নিবিষ্ট করতে।

এমআইটিতে আমার তৃতীয় ও শেষ বছরটি ছিলো উত্তরণের একটি বছর এবং আমার পরবর্তী জীবনের উপর এর প্রভাব পড়েছিল। সেই সব দিনে, রাজনৈতিক আলোকবর্তিকার একটা নতুন আবহাওয়া ও শিল্প স্থাপনার চেষ্টা ছড়িয়ে পড়েছিলো সারাদেশে। স্রষ্টায় আমার বিশ্বাস পরীক্ষা করতে হয়েছিলো আমাকে এবং দেখতে হয়েছিলো যে সেটা বৈজ্ঞানিক চিন্তার ছাঁচে খাপ খায় কি-না। গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটা বিশ্বাস ছিলো জ্ঞানের প্রতি একমাত্র বৈধ অভিগমন। যদি তাই হয়, আমি ভেবেছিলাম, তাহলে বস্তুই একমাত্র বাস্তবতা আর আধ্যাত্মিক প্রপঞ্চ বস্তুর একটা প্রকাশ ছাড়া আর কি? সমস্ত নৈতিক মূল্য কি আপেক্ষিক, এবং সংবেদজ উপলব্ধি সত্য ও জ্ঞানের একমাত্র উৎস? এসব বিষয়ে আমি ভাবতাম, 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' ও আমার নিজের আধ্যাত্মিক আগ্রহের প্রশ্ন আলাদা করার চেষ্টা চালাতাম। যে মূল্যবোধের ধারায় আমি বেড়ে উঠেছিলাম তা গভীরভাবে ছিল ধর্মীয়। আমি এই শিক্ষা পেয়েছিলাম যে আধ্যাত্মিক এলাকার মধ্যে আসল বাস্তবতা রয়েছে জড় বিশ্ব ছাড়িয়ে, এবং জ্ঞান আহরণ করা যায় কেবল অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

ইতিমধ্যে আমার কোর্সের কাজ যখন শেষ করে ফেলেছি, তখন আমাকে একটা প্রকল্পে কাজে লাগান হল আরও চারজন সহকর্মীর সঙ্গে মিলে একটা লো-লেভেল অ্যাটাক এয়ারক্র্যাফটের নকশা করার জন্য। আমি অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন অংকন ও প্রস্তুতের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। বিমানের প্রপালসন, স্ট্রাকচার, কন্ট্রোল ও ইন্সট্রুমেন্টেশন নকশার কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল আমার টিম মেটরা। একদিন আমার ডিজাইন শিক্ষক অধ্যাপক শ্রীনিবাসন, তখন এমআইটির পরিচালক, আমার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে হতাশাব্যাঞ্জক বলে ঘোষণা করলেন। বিলম্বের কারণ হিসেবে এক ডজন অজুহাত দিলাম আমি, কিন্তু তার কোনওটিই মনে ধরল না অধ্যাপক শ্রীনিবাসনের। আমি শেষ পর্যন্ত তার কাছে কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এক মাসের সময় চাইলাম। অধ্যাপক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'দেখ, আজ শুক্রবার বিকেল। আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিচ্ছি। সোমবার সকালে যদি ড্রয়িং না পাই তাহলে

www.pathagar.com

তোমার বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে।' আমি একেবারে বোবা হয়ে গেলাম। বৃত্তিটা ছিল আমার লাইফলাইন, সেটা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ব। যেভাবে বলা হয়েছে সেই মত কাজটা শেষ করা ছাড়া আর কোনও পথ দেখতে পেলাম না। সেই রাতে আমি ড্রয়িং বোর্ড নিয়েই পড়ে থাকলাম, বাদ দিয়ে গেলাম নৈশভোজ। পরবর্তী সকালে মাত্র এক ঘন্টার বিরতি দিলাম পরিষ্কার হয়ে সামান্য কিছু মুখে দেবার জন্য। রোববার সকালে, কাজ শেষ করে আনার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন, হঠাৎ করে কামরায় কারো উপস্থিতি অনুভব করলাম। একটু দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন অধ্যাপক শ্রীনিবাসন। জিমখানা থেকে সরাসরি এসেছিলেন, তাই তার পরনে ছিল টেনিসের পোশাক। আমার অগ্রগতি দেখতে এসেছিলেন তিনি। আমার কাজ পরীক্ষা করার পর অধ্যাপক শ্রীনিবাসন সস্নেহে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আর পিঠ চাপড়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি জানি তোমাকে কঠিন চাপের মধ্যে রাখছিলাম আর অসম্ভব এক ডেডলাইনের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করতে বলছিলাম। এত চমৎকার পারফর্ম করবে তুমি তা আমি কখনও প্রত্যাশা করিনি।'

প্রকল্প কালের বাকি সময়ে এমআইটি তামিল সংঘম (সাহিত্য সমাজ) আয়োজিত এক রচনা প্রতিযোগিতায় আমি অংশগ্রহণ করি। তামিল আমার মাতৃভাষা, এবং এর উৎস নিয়ে আমি গর্বিত, যার গতিপথ অনুসরণ করলে *রামায়ণ*-পূর্ব কালের মহামুনি অগস্ত্য পর্যন্ত পৌঁছান যাবে ; এ ভাষায় রচিত সাহিত্য খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দির পুরনো। এই চমৎকার ভাষার আওতার বাইরে বিজ্ঞান থাকতে পারে না তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আমি অতিশয় প্রত্যয়ী ছিলাম। আমি তামিলে একটা প্রবন্ধ লিখি 'আমাদের নিজস্ব বিমান তৈরি করা যাক' শিরোনামে। প্রবন্ধটি দারুণ আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং প্রতিযোগিতায় আমি বিজয়ী হই। জনপ্রিয় তামিল সাপ্তাহিক *আনন্দ বিকাতান* -এর সম্পাদক 'দেবন'-এর কাছ থেকে আমি প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করি।

এমআইটিতে আমার সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী স্মৃতি অধ্যাপক স্পন্ডারের সঙ্গে জড়িত। বিদায় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আমরা গ্রুপ ছবি ওঠাচ্ছিলাম। সামনে উপবিষ্ট অধ্যাপকদের রেখে সকল স্নাতক ছাত্র তিন সারিতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অধ্যাপক স্পন্ডার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে খুঁজতে লাগলেন। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তৃতীয় সারিতে। 'সামনের সারিতে এসে আমার পাশে বসো', তিনি বললেন। অধ্যাপক স্পন্ডারের আমন্ত্রণে আমি হতচকিত হয়ে পড়লাম। 'তুমি আমার সেরা ছাত্র এবং ভবিষ্যতে তোমার শিক্ষকদের বিপুল সুনাম বয়ে আনতে কঠোর পরিশ্রম তোমাকে সাহায্য করবে।' প্রশংসায় বিহবল কিন্তু স্বীকৃতিতে সম্মানিত হয়ে ছবি তোলার জন্য আমি বসলাম অধ্যাপক স্পন্ডারের পাশে। 'ঈশ্বর তোমার আশা, তোমার বেঁচে থাকা, তোমার পথ প্রদর্শক হোন, আর তিনি ভবিষ্যতে তোমার চলার পথে আলো দিন', অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষটি এভাবে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

www.pathagar.com

এমআইটি থেকে ট্রেইনি হিসেবে আমি গেলাম বাঙ্গালোরে অবস্থিত হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড (এইচএএল)-এ। সেখানে একটা দলের অংশ হিসেবে আমি ইঞ্জিন ওভারহলিং-এর কাজ করতাম। বিমানের ইঞ্জিন ওভারহলিং বিষয়ে খোলা-হাতের কাজ ছিল অত্যন্ত শিক্ষামূলক। ক্লাসরুমে শেখা কোনও নিয়ম যখন ফলবতী হয় বাস্তব অভিজ্ঞতায়, তখন তা থেকে সৃষ্টি হয় উত্তেজনার এক অদ্ভূত অনুভূতি— যেন একদল অচেনা মানুষের মধ্যে পুরনো বন্ধুকে দেখতে পেয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তার দিকে দৌড়ানো। এইচএএলে পিস্টন আর টারবাইন ইঞ্জিন উভয়ের ওভারহলিং-এর কাজ করতাম আমি। গ্যাস ডাইনামিকস-এর আবছা ধারণা আর *আফটার বার্নিং* বিষয়ক নিয়মের বিভাজন প্রক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমার মনে। আমি রেডিয়াল ইঞ্জিন-কাম-ড্রাম পরিচালনার প্রশিক্ষণও পেয়েছিলাম।

আমি শিখেছিলাম ওয়্যার ও টিয়ারের জন্য একটা ক্র্যাংকশ্যাফ্ট কিভাবে চেক করতে হয় ; আর টুইস্টের জন্য ক্র্যাংকশ্যাফ্ট ও একটা সংযোগ রড। একটা সুপার-চার্জড্ ইঞ্জিনে যুক্ত একটা ফিক্সড্- পিচ ফ্যানের ক্রমাংকন করি আমি। প্রেসার ও এক্সিলারেশন-কাম-স্পিড কন্ট্রোল সিস্টেম খুলে দিই, এবং টার্বো-ইঞ্জিনের এয়ার স্টার্টার সাপ্লাই সিস্টেম্স। প্রপেলার ইঞ্জিনের রিভার্সিং এবং ফেদারিং ও আন-ফেদারিং বুঝতে পারা ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এইচএএলের টেকনিশিয়ানদের *বেটা* (ব্লেড অ্যাঙ্গল কন্ট্রোল)-এর নিখুঁত শিল্প এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। বড় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না, তাদের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার যার নির্দেশ দিচ্ছিল তার বাস্তবায়নও করছিল না তারা। বেশ কয়েক বছর ধরে তারা খোলা-হাতে কাজ করছিল এবং এটাই তাদের কাজ করার এক অনুভূতি জাগিয়েছিল।

এইচএএল থেকে একজন গ্রাজুয়েট অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বেরিয়ে আসার পর কাজের দুটো বিকল্প সুযোগ ছিল আমার সামনে, দুটোই আকাশে ওড়ার আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্নের কাছাকাছি । একটা এয়ার ফোর্সে এবং অন্যটি ডাইরেক্টরেট অব টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড প্রডাকশন ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার)-এ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। দুটোতেই আমি আবেদন করলাম। প্রায় যুগপৎ দুটো জায়গা থেকেই ডাকা হল সাক্ষাৎকারের জন্য। এয়ার ফোর্স রিক্রুটমেন্ট কর্তৃপক্ষ আমাকে ডেকে পাঠাল দেরাদুনে আর ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার) দিল্লীতে। করোমন্ডল উপকূলের বালকটি উত্তর ভারত অভিমুখী একটা ট্রেন ধরেছিল। আমার গন্তব্য ছিল ২০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে। আর আমার মাতৃভূমির বিস্তীর্ণতা দেখার সুযোগও হল আমার সেই প্রথম।

www.pathagar.com

৩

কম্পার্টমেন্টের জানলা দিয়ে আমি দেখতে লাগলাম দ্রুত ধাবমান পল্লী অঞ্চল। ক্ষেত-খামারে শাদা ধুতি ও পাগড়ি পরা পুরুষেরা, আর ধান ক্ষেতের সবুজ পটভূমিতে বর্ণবহুল পোশাক পরিহিতা নারীদের দেখে মনে হচ্ছিল চমৎকার তৈলচিত্রের দৃশ্যের মত। জানলায় আমি বসে ছিলাম আঠার মত। প্রায় সবখানেই লোকজন কোনও না কোনও কাজে লিপ্ত ছিল, আর তাতে ছিল ছন্দ ও শান্তিপূর্ণতা —পুরুষেরা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গবাদি পশু, ঝর্ণা থেকে পানি আনছে নারীরা। কোনও কোনও সময় হয়তো একটা বাচ্চার আবির্ভাব ঘটছে আর সে হাত নাড়ছে ট্রেনের উদ্দেশ্যে।

ক্রমাগত উত্তরের দিকে যেতে যেতে যেভাবে ভূদৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে তা বিস্ময়কর। গঙ্গা নদীর দু'পাশে সমৃদ্ধ সমতল উর্বর ভূমি শিকার হয়েছে আগ্রাসন, ক্ষয়-ক্ষতি ও পরিবর্তনের। প্রায় ১৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিমের পর্বত পেরিয়ে এ অঞ্চলে এসেছিল গৌরবর্ণের আর্যরা। দশম শতাব্দীতে এসেছিল মুসলমানরা, পরে যারা স্থানীয় অধিবাসীদের ভিতর মিশে গিয়েছিল আর এ দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। এক সাম্রাজ্য হটিয়ে দিয়েছিল অন্য সাম্রাজ্যকে। ধর্মীয় বিজয় অভিযান অব্যাহত ছিল। এই পুরো সময়ে কর্কট ক্রান্তির দক্ষিণে ভারতের এই অংশ বেশির ভাগটাই থেকে গিয়েছিল অস্পৃষ্ট, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত শ্রেণীর আড়ালে নিরাপদ। নর্মদা, তপ্তি, মহানদী, গোদাবরি ও কৃষ্ণ নদী ভারতীয়

www.pathagar.com

উপদ্বীপের জন্য নিরাপত্তা রক্ষার জাল বিছিয়েছিল। আমাকে দিল্লীতে নিয়ে যাবার জন্য ট্রেনটা অতিক্রম করে গেল এসব কিছু।

আমি এক সপ্তাহের যাত্রা বিরতি করলাম দিল্লীতে, মহান *সুফী* সাধক হযরত নিজামুদ্দিনের এই নগর। সেখানে ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার)-এ ইন্টারভিউ দিলাম। আমার ইন্টারভিউ ভালই হল। রুটিন মাফিক কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল আমাকে, আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার জ্ঞান সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই তোলা হয়নি। তারপর আমি দেরাদুন গেলাম এয়ার ফোর্স সিলেকশন বোর্ডের সামনে আমার ইন্টারভিউ দিতে। সিলেকশন বোর্ডে মেধার চেয়ে 'ব্যক্তিত্বের' উপর গুরুত্ব দেওয়া হল বেশি। হয়তো তারা অনুসন্ধান করছিল শারীরিক যোগ্যতা আর স্পষ্ট আচরণ। আমি বেশ উত্তেজিত কিন্তু নার্ভাস হয়েছিলাম, দৃঢ়প্রত্যয়ী কিন্তু উদ্বিগ্ন ছিলাম। এয়ার ফোর্সে আটজন অফিসার নির্বাচন করার জন্য ২৫ জনের ব্যাচে আমি নবম স্থান পেলাম। আমি দারুন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। বিমান বাহিনীতে যোগ দেবার সুযোগ আমার আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে তা উপলব্ধি করতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিলেকশন বোর্ড থেকে বেরিয়ে এসে একটা পাহাড় চূড়ায় দাঁড়ালাম আমি। অনেক নিচে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছিল। আমি জানতাম সামনের দিনগুলো আরও সংকটময় হবে। প্রশ্ন ছিল যার উত্তর দিতে হবে এবং কর্ম-পরিকল্পনা যা প্রস্তুত করতে হবে। আমি সোজা চলে গেলাম ঋষিকেশ।

আমি গঙ্গায় স্নান করে এর জলের পবিত্রতায় পরমানন্দ লাভ করলাম। তারপর পায়ে হেঁটে এলাম শিবানন্দ আশ্রমে, পাহাড়ের খানিকটা উঁচুতে সেটা অবস্থিত। ভিতরে ঢোকার সময় আমি প্রচন্ড কম্পন অনুভব করলাম। বিপুল সংখ্যক *সাধু*কে দশাপ্রাপ্ত অবস্থায় উপবিষ্ট দেখলাম চারপাশে। বইতে পড়েছিলাম যে সাধুরা হচ্ছে আধ্যাত্মিক মানুষ—যারা স্বজ্ঞালব্ধ ভাবে সব কিছু জানে। বিষণ্ন মনে যে সন্দেহগুলো আমাকে জ্বালাতন করত তার জবাব খুঁজতাম আমি।

আমি সাক্ষাৎ করলাম স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে—বুদ্ধের মত দেখতে মানুষটা, পরে আছে। তুষার-ধবল ধুতি আর কাঠের খড়ম। জলপাইয়ের মত তার গায়ের রং এবং কালো চোখ। তার অপ্রতিরোধ্য এবং প্রায় শিশুসুলভ হাসি আর মহিমান্বিত ব্যবহারে আমি চমকিত হলাম। স্বামীজীর কাছে আমি নিজের পরিচয় দিলাম। আমার মুসলিম নাম তার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। আমি আর কিছু বলার আগেই তিনি আমার দুঃখের উৎস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমার দুঃখ তিনি কিভাবে জানলেন তার কোনও ব্যাখ্যা তিনি দিলেন না আর আমিও জানতে চাইলাম না।

বিমান বাহিনীতে যোগদানের আমার ব্যর্থ চেষ্টার কথা তাকে বললাম। তিনি মৃদু হাসলেন, প্রায় তৎক্ষণাৎ মুছে দিলেন আমার সকল উদ্বিগ্নতা। তারপর তিনি মৃদু কিন্তু অত্যন্ত গভীর গলায় বললেন,

www.pathagar.com

আকাঙ্খা, যখন তার উদ্ভব ঘটে হৃদয় ও আত্মা থেকে, যখন তা বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ়, তখন তাকে আচ্ছন্ন করে ভীষণ বিদ্যুৎচুম্বকীয় শক্তি। এই শক্তি প্রতি রাতে নিষ্কাষিত হয় ইথারে, মন যখন নিদ্রার স্তরে থাকে। প্রতি সকালে তা চেতন স্তরে ফিরে আসে মহাজাগতিক প্রবাহের নতুন শক্তি নিয়ে। যা কল্পনা করা হয়েছে তা নিশ্চিত ভাবেই প্রতীয়মান হবে। তুমি নির্ভর করতে পারো, যুবক, এই অনন্ত প্রতিশ্রুতির উপর— যেমন নিশ্চিতভাবে তুমি নির্ভর করতে পারো চিরন্তনভাবে অটুট সূর্যোদয়ের.....এবং বসন্তের প্রতিশ্রুতির উপর।

ছাত্র যখন তৈরি, তখন শিক্ষকের আগমন ঘটবে—কী সত্যি! এই তো এক শিক্ষক যিনি পথ দেখাচ্ছেন এক ছাত্রকে যে কি না প্রায় বিপথে যেতে বসেছিল! 'তোমার নিয়তিকে গ্রহণ কর আর জীবনকে নিয়ে এগিয়ে চল। বিমান বাহিনীর পাইলট হওয়ার ভাগ্য নয় তোমার। তুমি কি হবে তার নিয়তি এখনও উন্মোচিত নয়, কিন্তু আগেই তা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এই ব্যর্থতার কথা ভুলে যাও, মনে কর তোমার নিয়তি-নির্দিষ্ট পথে চলার জন্য এ ছিল অপরিহার্য। এর পরিবর্তে তোমার অস্তিত্বের আসল উদ্দেশ্য অনুসন্ধান কর। নিজেকে সমর্পন কর ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে', স্বামীজী বললেন।

আমি দিল্লীতে ফিরে এলাম এবং আমার ইন্টারভিউয়ের ফলাফল জানার জন্য ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার)-এ খোঁজ নিলাম। জবাবে আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল নিয়োগপত্র। মাসিক ২৫০ রূপি মূল বেতনে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পরদিন সেখানে আমি কাজে যোগদান করলাম। যদি এই আমার নিয়তি হয়ে থাকে, আমি ভাবলাম, তাহলে তাই হোক। শেষ পর্যন্ত, মানসিক শান্তিতে আমি পূর্ণ হলাম। বিমান বাহিনীতে ঢুকতে না-পারার ব্যর্থতায় আমার মনে আর কোনও তিক্ততা ছিল না। এসব ছিল ১৯৫৮ সালের ঘটনা।

ডাইরেক্টরেটে আমাকে নিয়োগ করা হল টেকনিক্যাল সেন্টার (এভিয়েশন)-এ। আমি যদি এরোপ্লেনে উড়তে নাই পারি, অন্তত সেগুলো ওড়াতে সাহায্য করতে পারব। ডাইরেক্টরেটে আমার প্রথম বছরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আর ভরদরাজনের সহযোগিতায় সুপারসনিক টার্গেট এয়ারক্র্যাফটের উপর একটা নকশার কাজ করেছিলাম আমি। পরিচালক ড. নীলকান্তন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন আমার কাজের। বিমান রক্ষণাবেক্ষণের শপ-ফ্লোর এক্সপোজারের দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠান হল কানপুরে এয়ারক্র্যাফট অ্যান্ড আর্মামেন্ট টেস্টিং ইউনিট (এঅ্যান্ডএটিইউ)-এ। ওই সময় তারা Gnat Mk I বিমানের ট্রপিক্যাল ইভ্যালুয়েশন-এ জড়িত ছিল। এর অপারেশন সিস্টেমের মূল্যায়ন কাজে আমি অংশগ্রহণ করি।

www.pathagar.com

এমন কি সেই সব দিনেও কানপুর ছিল ঘনবসতিপূর্ণ নগরী। কোনও শিল্প-শহরে বসবাসের সেটাই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। ঠান্ডা আবহাওয়া, জনমানুষের ভিড়, হৈ চৈ আর ধোঁয়া ইত্যাদি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত রামেশ্বরমে যাতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। সবচেয়ে ঝামেলার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম সকালের নাশতা থেকে রাতের খাবার পর্যন্ত ডাইনিং টেবিলে আলুর অবিরাম উপস্থিতিতে। আমার কাছে এটা ছিল এই নগরীতে একাকীত্বের অনুভূতির মত। রাস্তায় যে সব লোকজন চোখে পড়ত তারা সবাই গ্রাম থেকে এসেছিল কারখানাগুলোয় কাজের সন্ধানে, পরিবারের সুরক্ষা আর তাদের মাটির গন্ধ ফেলে এসেছিল তারা পিছনে।

দিল্লীতে আমার প্রত্যাবর্তনে আমাকে জানান হল যে একটা *DART* টার্গেটের নকশা গ্রহণ করা হয়েছে ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার)-এ এবং ডিজাইন টিমে আমাকে রাখা হয়েছে। আমি এই কাজ শেষ করলাম দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মিলে। তারপর একটা Human Centrifuge-এর প্রাথমিক নকশার কাজ নিলাম। পরে ভার্টিক্যাল টেকঅফ ও ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম-এর নকশা তৈরি ও উন্নয়নের কাজ করলাম। হট ককপিট-এর উন্নয়ন ও নির্মাণের কাজেও আমি সহযোগিতা করি। তিন বছর পেরিয়ে গেল। তারপর বাঙ্গালোরে জন্ম নিল দ্য অ্যারোনটিক্যাল ডেভলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট (এডিই) এবং নতুন এই প্রতিষ্ঠানে আমাকে বদলি করা হল।

নগর হিসেবে বাঙ্গালোর সরাসরি বিপরীত ছিল কানপুরের। বস্তুত, আমি অনুভব করি আমাদের দেশের একটা অতিপ্রাকৃত ধরনের পন্থা আছে তার জনগণের চরমসীমা বের করে আনার। আমার ধারণা, এর কারণ ভারতীয়রা অনেক শতাব্দীর অভিবাসনে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন শাসকের প্রতি আনুগত্য আমাদের একক বশ্যতার ক্ষমতা হরণ করেছে। পরিবর্তে আমরা যুগপৎ একই সঙ্গে অর্জন করেছি সহমর্মিতা ও নিষ্ঠুরতা, সংবেদশীলতা ও নির্মমতা, গভীরতা ও তরলতার এক অনন্যসাধারণ সামর্থ্য। অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতে আমরা বর্ণবহুল ও ছবিতুল্য বলে প্রতিভাত হতে পারি ; কিন্তু সমালোচকের চোখে, আমাদের বিভিন্ন প্রভুর বাজে রকম নকল ছাড়া আর কিছু নয়। কানপুরে আমি দেখেছিলাম *পান* চিবানো ওয়াজিদ আলী শাহ্-এর নকল, এবং বাঙ্গালোরে এর বিপরীতে কুকুর নিয়ে হাঁটা সাহেবদের। এখানেও আমি ব্যাকুল হয়ে পড়লাম রামেশ্বরমের গভীরতা ও শান্ততার জন্য। পার্থিব ভারতীয়ের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষয় হয়ে গেছে আমাদের নগরসমূহের বিভক্ত স্পর্শকাতরতার দ্বারা। আমার সন্ধ্যাগুলো আমি কাটাতাম বাঙ্গালোরের শপিং প্লাজা আর বাগানগুলো আবিষ্কার করে।

প্রথম বছরে এডিইতে কাজের চাপ অনেক হালকা ছিল। প্রথমে আমার মধ্যে কাজের ধারা সঞ্চার করতে হয়েছিল, যে পর্যন্ত না ক্রমান্বয়ে ছন্দ সৃষ্টি হয়। গ্রাউন্ড-হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট বিষয়ক আমার প্রাথমিক অধ্যয়নের ভিত্তিতে একটা প্রকল্প

www.pathagar.com

দল গঠন করা হল, একটা গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট মেশিন (জিইএম) হিসেবে একটা দেশীয় হোভারক্র্যাফট প্রটোটাইপ-এর নকশা ও উন্নয়ন কাজের জন্য। সেটা ছিল একটা ক্ষুদে কর্মীদল, চারজন সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে এডিইর পরিচালক ড. ওপি মেডিরাট্টা আমাকে দলের নেতৃত্ব দিতে বললেন। ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল তৈরির জন্য তিন বছর সময় দেওয়া হয়েছিল আমাদের।

যে কোন মানের দিক থেকে প্রকল্পটা ছিল আমাদের যৌথ সামর্থ্যের চেয়েও অনেক বড়। আমাদের কারোরই যন্ত্র তৈরির অভিজ্ঞতা ছিল না, ফ্লাইং মেশিন তৈরি তো দূরের কথা। কোনও ডিজাইন বা প্রতিরূপ ছিল না যার সাহায্য নিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। আমরা শুধু জানতাম যে আমাদের একটা সফল বাতাসের-চেয়ে-ভারী ফ্লাইং মেশিন তৈরি করতে হবে। হোভারক্র্যাফট বিষয়ক যত কিছু লেখালেখি ছিলো সব সংগ্রহ করে আমরা পড়ি, কিন্তু এ বিষয়ে খুব লেখালেখি ছিল না। এক্ষেত্রে যাদের জ্ঞান আছে এমন লোকদের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্ট করি আমরা, কিন্তু তেমন কাউকেই খুঁজে পাই না। একদিন সীমিত তথ্য ও সূত্র নিয়ে কাজে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

একটা ডানাবিহীন, হালকা, দ্রুতগতির মেশিন তৈরির এই প্রচন্ড চেষ্টা খুলে দিলো আমার মনের জানালা। আমি খুব দ্রুত অন্তত দেখতে পেয়েছিলাম একটা হোভারক্র্যাফট ও একটা এয়ারক্র্যাফট-এর মধ্যে প্রতীকি যোগসূত্র। সে যাই হোক, সাত বছর ধরে বাইসাইকেল ফিক্সিং করার পর প্রথম এরোপ্লেন তৈরি করতে পেরেছিলেন রাইট ভাইয়েরা! জিইএম প্রকল্পে উদ্ভাবনী দক্ষতা ও ক্রমোন্নতির বিশাল সুযোগ দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ড্রইং বোর্ডের উপর কয়েক মাস কাটানোর পর আমরা সরাসরি হার্ডওয়্যার কাজে আত্মনিয়োগ করি।

আমার মত পটভূমির কোনও ব্যক্তির— যে পটভূমি হচ্ছে পল্লী অঞ্চল কিংবা ক্ষুদে শহর, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাবা-মার সীমিত শিক্ষা— তো এ রকম একটি পটভূমির কোনও ব্যক্তির সবসময় যা বিপদ তা হল সে একটা কোণে পশ্চাদপসরণ করবে এবং শুধু অস্তিত্বের জন্যই সেখানে সংগ্রাম করবে, যতক্ষণ না বড় কোন ঘটনা তাকে চালিত করে আরও অধিক অনুকূল পরিবেশের মধ্যে। আমি জানতাম আমাকেই আমার নিজের সুযোগগুলো তৈরি করে নিতে হবে।

অংশের পর অংশ, সাবসিস্টেমের পর সাবসিস্টেম, স্তরের পর স্তর কাজ এগিয়ে চলল। এই প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে আমি শিখলাম যে, একবার যদি তোমার মন একটা নতুন স্তরে প্রসারিত হয় তাহলে আর কখনও তা আগের মাত্রায় ফিরে যাবে না।

ঐ সময়ে ভিকে কৃষ্ণ মেনন ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আমাদের ক্ষুদ্র প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত ছিলেন, এই বিষয়টিকে তিনি মনে করতেন ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের উন্নয়ন কাজের সূচনা হিসেবে। বাঙ্গালোরে যখনই তিনি থাকতেন তখনই তিনি কিছুটা সময় বের করে নিতেন আমাদের প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য। আমাদের সামর্থ্যের ব্যাপারে তার আস্থা আমাদের ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছিল। অ্যাসেম্বলি শপে আমি প্রবেশ

www.pathagar.com

করতাম আমার অন্যান্য সমস্যা বাইরে রেখে, ঠিক আমার বাবা নামাজ পড়ার জন্য যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করতেন, বাইরে রেখে আসতেন তার জুতো।

কিন্তু জিইএম সম্পর্কে কৃষ্ণ মেননের মতামত প্রত্যেকেই যে গ্রহণ করেছিলো তা নয়। সহজলভ্য যন্ত্রাংশ দিয়ে আমাদের এই এক্সপেরিমেন্ট উৎফুল্ল করতে পারেনি আমাদের সিনিয়র সহকর্মীদের। এমনকি অনেকেই আমাদের বলতেন খামখেয়ালি উদ্ভাবকদের একটি দল যারা দৌড়াচ্ছে অসম্ভব এক স্বপ্নের পেছনে। 'navvie'-দের নেতা হওয়ায় আমি ছিলাম নির্দিষ্টভাবে তাদের লক্ষ্যবস্তু। আমাকে গণ্য করা হয়েছিল একজন অমার্জিত গেঁয় লোক হিসেবে যে কিনা বিশ্বাস করে যে বাতাসে আরোহণ ছিলো তার করায়ত্ত। আমাদের বিরুদ্ধ মতামতের ভার আমার চির-আশাবাদী মনকে আরও বেশি জোরালো করেছিল। এডিই-তে কয়েকজন সিনিয়র বিজ্ঞানীর মন্তব্যে আমার মনে পড়ত ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত রাইট ভাইদের নিয়ে লেখা জন ট্রোব্রিজ-এর বিখ্যাত স্যাটায়ার কবিতার কিছু অংশ :

...with thimble and thread
And wax and hammer, and buckles and screws,
And all such things as geniuses use ;—
Two bats for patterns, curious fellows!
A charcoal-Pot and a pair of bellows.

প্রকল্পটা যখন প্রায় এক বছর অতিক্রম করেছে, তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন এডিইতে তার একটা রুটিন পরিদর্শনে এলেন। আমি তাকে আমাদের অ্যাসেম্বলি শপে নিয়ে এলাম। ভিতরে একটা টেবিলের উপর রাখ ছিলো জিইএম মডেলটি। যুদ্ধের ময়দানের জন্য বাস্তবসম্মত একটা হোভারক্র্যাফট তৈরির এক বছরের অক্লান্ত চেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছিল তাতে। মন্ত্রী একটার পর একটা প্রশ্ন করলেন আমাকে, আগামী বছরের মধ্যেই এই প্রটোটাইপ টেস্ট ফ্লাইটে যাবে তা নিশ্চিত হতে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি ড. মেডিরাট্টাকে বলেছিলেন, 'কালাম যে গ্যাজেট অধিকার করেছে তার সাহায্যে জিইএম ফ্লাইট সম্ভব'।

হোভারক্র্যাফটের নামকরণ করা হয়েছিল *নন্দী*, শিবের বাহন ষাঁড়টির নামানুসারে। একটা প্রটোটাইপের ক্ষেত্রে, এর আকার, যোগ্যতা ও পূর্ণতা ছিল আমাদের প্রত্যাশার বাইরে, আমরা একটা অবকাঠাম পেয়েছিলাম। আমার সহকর্মীদের আমি বললাম, 'এই যে একটা ফ্লাইং মেশিন, এটা নির্মাণ করেছে একদল বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি নয় বরং দক্ষ প্রকৌশলীরা। এটার দিকে চেয়ে থেক না— চেয়ে থাকার জন্য এটা তৈরি করা হয়নি, এটা তৈরি করা হয়েছে ওড়ার জন্য।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন *নন্দী*তে চড়ে আকাশ বিহার করলেন, তার সঙ্গে ছিল নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত কর্মকর্তারা। মন্ত্রীর দলে একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন ছিলেন, কয়েক হাজার ঘন্টা আকাশে ওড়ার রেকর্ড ছিল তার লগ বুকে। আমার

www.pathagar.com

মত অনভিজ্ঞ এক বেসামরিক পাইলটের সঙ্গে ওড়ার সম্ভাব্য বিপদ থেকে মন্ত্রীকে রক্ষা করতে নিজেই ফ্লাইং মেশিনটা চালানোর প্রস্তাব দিলেন তিনি আর ইশারা করলেন যন্ত্রটা থেকে আমাকে বেরিয়ে আসার জন্য। আমার তৈরি যন্ত্রটা ঠিক ভাবে ওড়াতে পারার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম, সুতরাং আপত্তি জানিয়ে আমি মাথা নাড়লাম। এই শব্দহীন কথাবার্তা লক্ষ্য করে মেনন একটা হাসি দিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেনের অপমানকর প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন এবং যন্ত্রটা চালানোর সংকেত দিলেন আমাকে। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। 'হোভারক্র্যাফট উন্নতির মূল সমস্যা সমাধান করা গেছে তা তুমি দেখিয়েছ। আরও শক্তিশালী একটা প্রাইম মুভার তৈরি কর আর তাতে দ্বিতীয়বার চড়ার জন্য আমাকে ডাক দিও', কৃষ্ণ মেনন আমাকে বললেন। সন্দেহবাদী গ্রুপ ক্যাপ্টেন (এখন এয়ার মার্শাল) গোলে পরবর্তী কালে আমার এক ভাল বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন।

নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রকল্প সম্পূর্ণ করলাম আমরা। আমাদের সঙ্গে ছিল একটা ওয়ার্কিং হোভারক্র্যাফ্‌ট, প্রায় ৪০ মিমি এয়ার কুশন আর ৫৫০ কেজি লোড নিয়ে চলছিল সেটা, সেই সঙ্গে কড়তার ওজন। ড. মেডিরাট্টা দৃশ্যত এই সাফল্যে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কৃষ্ণ মেননের মন্ত্রীত্ব শেষ হয়ে গেল, ফলে তার প্রতিশ্রুত দ্বিতীয়বার ফ্লাইং মেশিনে চড়তে পারলেন না। একটা দেশীয় হোভারক্র্যাফ্‌ট সামরিক বাহিনীতে সংযোজন করার যে স্বপ্ন তার ছিল, সে স্বপ্ন অনেকেরই ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, এমন কি আজও, হোভারক্র্যাফট আমদানি করতে হয় আমাদের। মতবিরোধের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আমার জন্য এটা ছিল নতুন এক অভিজ্ঞতা। যত দূর আমার ধারণা ছিল যে আকাশ পর্যন্ত হচ্ছে সীমা, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সীমা আরও নিকটের ব্যাপার। কিছু বাউন্ডারি আছে যা নির্দেশ দেয় জীবনকে : এতটা ওজন তুমি তুলতে পার ; এতটা দ্রুত তুমি শিখতে পার ; এতটা পরিশ্রমের সঙ্গে তুমি কাজ করতে পার ; এতটা দূর তুমি যেতে পার!

বাস্তবের মুখোমুখি হতে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম। আমার হৃদয় মন আমি সঁপে দিয়েছিলাম *নন্দী*তে। আমি হতাশ হয়েছিলাম আর আমার মোহভঙ্গ ঘটেছিল। বিভ্রম ও অনিশ্চয়তার এই সময়টায় শৈশবের স্মৃতি ফিরে এসেছিল আমার কাছে আর সেগুলোর নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছিলাম আমি।

পক্ষী শাস্ত্রী বলতেন, 'সত্য অন্বেষণ কর, সত্য তোমাকে মুক্তি দেবে।' বাইবেলে বলা হয়েছে, 'চাও এবং তুমি পাবে।' একদিন ড. মেডিরাট্টা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমাদের হোভারক্র্যাফটের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। যখন বললাম যে ওড়ার মত নিখুঁত অবস্থায় যন্ত্রটা রয়েছে, তিনি আমাকে বললেন আগামীকাল গুরুত্বপূর্ণ একজন দর্শনার্থীর জন্য প্রদর্শনের আয়োজন করতে। আমি যতদূর জানতাম, পরের সপ্তাহে কোনও ভিআইপির সফরসূচি ছিল না আমাদের

www.pathagar.com

গবেষণাগারে। যা হোক ড. মেডিরাট্টার নির্দেশ আমি পৌঁছে দিলাম আমার সহকর্মীদের কাছে আর আমরা নতুন এক আশার সঞ্চার অনুভব করলাম।

ড. মেডিরাট্টা পরদিন একজন দর্শনার্থীকে নিয়ে এলেন আমাদের হোভারক্র্যাফটের কাছে— একজন লম্বা, সুদর্শন, দাড়িওয়ালা লোক। তিনি যন্ত্রটা সম্পর্কে আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তার চিন্তার স্বচ্ছতা ও বিষয়মুখিতায় আমি চমৎকৃত হলাম। 'আপনি কি আমাকে এই যন্ত্রে চড়াতে পারেন?' তিনি জানতে চাইলেন। তার অনুরোধে আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলাম আমি। শেষ পর্যন্ত, এই একজনকে পাওয়া গেল যিনি আমার কাজে আগ্রহী হলেন।

আমরা দশ মিনিট হোভারক্র্যাফটে চড়লাম, মাটি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার উপরে। আমরা ঠিক উড়ছিলাম না, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বাতাসে ভাসছিলাম। দর্শনার্থী আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন আমার নিজের সম্পর্কে, হোভারক্র্যাফটে চড়ানোর জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং চলে গেলেন। তবে যাবার আগে নিজের পরিচয় দিয়ে গেলেন— তিনি ছিলেন অধ্যাপক এমজিকে মেনন, টাটা ইন্সটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টিআইএফআর)-এর পরিচালক। এক সপ্তাহ পর, আমার কাছে একটা ফোন এল ইন্ডিয়ান কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (ইনকসপার) থেকে। রকেট ইঞ্জিনিয়ারের একটা পোস্টে আমাকে ইন্টারভিউ দিতে ডাকা হল। সেই সময়ে আমি ইনকসপার সম্পর্কে যা জানতাম তাহল, বোম্বাই (এখন মুম্বাই)-তে টিআইএফআর-এর ট্যালেন্ট পুল নিয়ে গঠিত একটা কমিটি, ভারতে মহাকাশ গবেষণা সংগঠিত করার জন্য যার উদ্ভব।

ইন্টারভিউতে হাজির হতে আমি বোম্বাই গেলাম। ইন্টারভিউতে আমাকে যে সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে সে সবের ধরন সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। এ নিয়ে পড়াশোনা করার অথবা অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার মত সময় ছিল না হাতে। লক্ষ্মণা শাস্ত্রীর কণ্ঠে *ভগবৎ গীতা* প্রতিধ্বনিত হল আমার কানে ঃ

> সকল প্রাণী দ্বিত্বের মোহ নিয়ে জন্মায়.... অভিভূত থাকে কামনা ও ঘৃণা থেকে উত্থিত দ্বিত্বের দ্বারা.... কিন্তু যাদের মধ্যে পাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যারা দ্বিত্বের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত, তারা স্থিরচিত্তে আমার উপাসনা করে।

আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে বিজয়ী হওয়ার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে বিজয়ী হওয়ার দরকার নেই মনে করা। তুমি যখন স্বাভাবিক আর সন্দেহ মুক্ত থাকবে, তখনই তুমি ভাল ফলাফল করতে পারবে। ঘটনা যেভাবে ঘটবে সেভাবেই নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। যেন অধ্যাপক এমজিকে মেননের সফর কিংবা ইন্টারভিউতে হাজির হবার জন্য টেলিফোন ইত্যাদিতে আমার কিছু যায় আসে না, এটাই সর্বোত্তম মনোভাব হবে বলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম।

www.pathagar.com

আমার ইন্টারভিউ নিলেন ড. বিক্রম সারাভাই, তার সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক এমজিকে মেনন এবং তৎকালীন অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি মি. শরাফ। কামরায় যখন আমি প্রবেশ করলাম, তখনই তাদের উষ্ণতা ও বন্ধুসুলভ মনোভাব আমি অনুভব করতে পারলাম। প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ড. সারাভাইয়ের উষ্ণতায় আমি চমৎকৃত হলাম। ইন্টারভিউ গ্রহণকারীরা সাধারণত যেমন অহংকার ও পৃষ্ঠপোষকসুলভ মনোভাব দেখিয়ে থাকে কোনও তরুণ ইন্টারভিউ প্রদানকারীর সঙ্গে তার কোনও চিহ্নই ছিল না সেখানে। ড. সারাভাইয়ের প্রশ্ন আমার বিদ্যমান জ্ঞান ও দক্ষতা খুঁড়ে তুলল না; বরং তারা ব্যস্ত ছিলেন যে সম্ভাবনা আমি ধারণ করি নিজের মধ্যে তা আবিষ্কার করায়। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে যেন আরও বড় কিছু সন্ধান করছিলেন। পুরো সাক্ষাৎকারের বিষয়টি আমার কাছে মনে হল সত্যের সামগ্রিক এক মুহূর্ত, যার মধ্যে আমার স্বপ্ন বড় এক ব্যক্তির বড় এক স্বপ্নে আবৃত ছিল।

আমাকে পরামর্শ দেওয়া হল কয়েক দিন থেকে যাবার জন্য। যাহোক, পরদিন সন্ধ্যায় আমাকে নির্বাচন করার কথা জানান হল। রকেট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাকে আত্মভূত করা হবে ইনকসপারে। ঠিক এই রকম একটা ব্রেকথ্রুর স্বপ্নই দেখে আমার মত কোনও তরুণ।

ইনকাসপারে আমার কাজ শুরু হল টিআইএফআর কম্পিউটার সেন্টারে পরিচিতিমূলক কোর্সে। এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা ছিল ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার)-এর পরিবেশ থেকে। লেবেল কোনও বিষয় ছিল না। নিজের পজিশন জাহির করার কিংবা অন্যদের প্রতিকূলতার বস্তু হওয়ার প্রয়োজন ছিল না কারো।

১৯৬২ সালের দ্বিতীয়ার্ধের কোনও সময়ে ইনকসপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, থুম্বায় একটা ইকুয়াটরিয়াল রকেট লঞ্চিং স্টেশন স্থাপন করা হবে। থুম্বা ছিল কেরালা রাজ্যের অন্তর্গত ত্রিবান্দ্রাম (এখন থিরুভানান্থাপুরাম)-এর নিকটবর্তী মৎস্যজীবীদের নিঝুম এক গ্রাম। আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির ড. চিটনিস এ জায়গাটিকে উপযুক্ত লোকেশন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, কারণ এ জায়গাটি ছিল পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ইকুয়াটরের অত্যন্ত সন্নিকটে। ভারতে আধুনিক রকেট-ভিত্তিক গবেষণার এই ছিল সূচনা। থুম্বায় নির্বাচিত স্থানটির অবস্থান ছিল রেললাইন ও সমুদ্র উপকূলের মাঝখানে, প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ এবং মাপে প্রায় ৬০০ একর। এই এলাকার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিশাল গির্জা, তার জায়গাটাও অধিগ্রহণের দরকার ছিল। ব্যক্তিগত পক্ষের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ সব সময়ই অসুবিধাজনক আর কালক্ষেপণের ব্যাপার, বিশেষ করে কেরালার মত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়। এর উপর আরও সমস্যা, ধর্মীয় স্থান অধিগ্রহণ। ত্রিবান্দ্রামের তৎকালীন কালেক্টর কে মাধবন নায়ার দারুণ কৌশলে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন। রাইট রেভারেন্ড ড. ডেরেইরার আশীর্বাদ ও সহযোগিতা নিয়ে তিনি সমস্যার সমাধান বের করে দেন।

www.pathagar.com

ড. ডেরেইরা ১৯৬২ সালে ছিলেন ত্রিবান্দ্রামের বিশপ। শীগগিরই সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (সিপিডব্লিউডি)-এর নির্বাহী প্রকৌশলী আরডি জন পুরো এলাকা রূপান্তরিত করে ফেললেন। সেন্ট মেরি ম্যাগডালিন গির্জাটি হল থুম্বা স্পেস সেন্টারের প্রথম অফিস। প্রার্থনার কামরাটা ছিল আমার প্রথম গবেষণাগার, বিশপের কক্ষটা ছিল আমার ডিজাইন ও ড্রয়িং-এর অফিস। আজকের দিন পর্যন্তও গির্জাটাকে রাখা হয়েছে পূর্ণ মহিমায় এবং বর্তমানে এটাকে বানান হয়েছে ভারতীয় মহাকাশ জাদুঘর।

এসবের পরপরই আমাকে আমেরিকায় যেতে বলা হল সফলভাবে রকেট উৎক্ষেপণ কলাকৌশল বিষয়ক ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য, দ্য ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)-এর ওয়ার্ক সেন্টারে। দেশের বাইরে যাবার আগে আমি কয়েক দিনের অবকাশ নিয়ে রামেশ্বরমে গেলাম। আমার যে সুযোগ এসেছে তা শুনে আমার বাবা দারুণ খুশি হলেন। তিনি আমাকে মসজিদে নিয়ে গেলেন এবং শুকরানার জন্য বিশেষ নামাজ পড়লেন। আমি অনুভব করলাম স্রষ্টার ক্ষমতা আমার বাবার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আমার মধ্যে এবং আবার ফিরে যাচ্ছে স্রষ্টার কাছে ; আমরা প্রার্থনার মধ্যে পুরোপুরি আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রার্থনার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, আমার ধারণা, সৃষ্টিশীল আইডিয়ার প্রতি উদ্দীপনা জাগান। মনের ভিতরে রয়েছে সফল জীবনের জন্য প্রত্যাশিত সকল ক্ষমতা। চেতনায় উপস্থিত আছে আইডিয়া, যখন তা সুযোগ পায় বেড়ে ওঠার ও আকার নেওয়ার, তখন তা নিয়ে যেতে পারে সফলতায়। খোদা, আমাদের স্রষ্টা, বিপুল শক্তি ও সামর্থ্য জমা রেখেছেন আমাদের চেতনায় ও ব্যক্তিত্বে। প্রার্থনা আমাদের সাহায্য করে এসব শক্তি উৎসারিত করতে।

আহমেদ জালালুদ্দিন ও শামসুদ্দিন আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিল বোম্বাই বিমান বন্দরে। বোম্বাইয়ের মত বিশাল কোনও নগরীতে এটা ছিল তাদের প্রথম আগমন, ঠিক আমি নিজে যেমন প্রথমবারের মত নিউ ইয়র্কের মত কোনও মেগা সিটিতে যাচ্ছি। জালালুদ্দিন ও শামসুদ্দিন ছিল আত্ম-নির্ভর, ইতিবাচক, আশাবাদী মানুষ। নিজেদের কাজ তারা নিয়েছিল সাফল্যের নিশ্চয়তাসহ। এই দুই ব্যক্তির কাছ থেকেই আমি আমার মনের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলাম। আমি আবেগ ধারণ করতে পারি না। আর বুঝতে পারি অশ্রুতে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। জালালুদ্দিন তখন বলল, 'আজাদ, আমরা সব সময় তোমাকে ভালবেসেছি, আর আমরা তোমাতে বিশ্বাস করেছি। আমরা সব সময় তোমাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করব।' আমার সামর্থ্যের প্রতি তাদের আস্থার এই বিশুদ্ধতা আমার শেষ প্রতিরোধ ভেঙে দেয়, আর আমার গাল বেয়ে নেমে আসে অশ্রু।

www.pathagar.com

২

সৃজন

[১৯৬৩—১৯৮০]

www.pathagar.com

৪

ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের হ্যাম্পটনে অবস্থিত নাসার ল্যাংলি রিসার্চ সেন্টার (এলআরসি)-এ আমি কাজ শুরু করলাম। অ্যাডভান্সড্ অ্যারোস্পেস টেকনোলজির জন্য এটা ছিল প্রাথমিক ভাবে একটা আরঅ্যান্ডডি সেন্টার। এল আরসিতে আমার বর্ণবহুল স্মৃতিমালার একটা হচ্ছে এক খন্ড ভাস্কর্য, পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে তাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একজন রথী দুটো ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, একটায় ফুটে উঠছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর অন্যটায় প্রাযুক্তিক উন্নতি, তাতে রূপকার্থে প্রকাশ পাচ্ছে গবেষণা ও উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃযোগযোগ।

এলআরসি থেকে আমি গেলাম মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের গ্রীনবেল্টে গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার (জিএসএফসি)-এ। এই সেন্টারে নির্মাণ করা হয় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান নাসার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ। সমস্ত মহাশূন্য অভিযানের জন্য নাসার ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে এই কেন্দ্র। আমার সফরের শেষ দিকে আমি গিয়েছিলাম ভার্জিনিয়ার ইস্ট কোস্টে ওয়ালপস আইল্যান্ডে ওয়ালপস ফ্লাইট ফ্যাসিলিটিতে। এই জায়গাটি ছিল নাসার রকেট কর্মসূচির ঘাঁটি। এখানে আমি দেখতে পেলাম রিসেপশন লবিতে একটা তৈলচিত্র ঝোলান আছে। পশ্চাৎ ভূমিতে কয়েকটা উড়ন্ত রকেটসহ একটা যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্য ছিল তাতে। এই থিম নিয়ে আঁকা তৈলচিত্র কোনও ফ্লাইট ফ্যাসিলিটিতে অতি

www.pathagar.com

সাধারণ ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু ছবিটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার কারণ রকেট উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে যে দিক থেকে সে দিককার সৈন্যরা কেউ শ্বেতাঙ্গ ছিল না, তাদের চেহারা ছিল দক্ষিণ এশিয়ার জাতিগুলোর মত আর তেমনি কালচে চামড়ার। একদিন আমার কৌতূহল চরম মাত্রায় পৌঁছাল, আমাকে টেনে নিয়ে গেল তৈলচিত্রটার কাছে। দেখা গেল ছবিটায় টিপু সুলতানের বাহিনী যুদ্ধ করছে বৃটিশদের সঙ্গে। একটা প্রকৃত ঘটনা যা টিপুর নিজের দেশ ভুলে গেছে তা প্রকাশিত হচ্ছে এই তৈলচিত্রে আর দুনিয়ার আরেক প্রান্তে তা স্মরণ করা হচ্ছে। রকেট যুদ্ধের নায়ক হিসেবে একজন ভারতীকে যে মহিমান্বিত করেছে নাসা তাতে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম।

আমেরিকানদের সম্পর্কে ধারণার সারসংক্ষেপ করা যায় বেনজামিন ফ্রাংকলিনের একটা কথায়, 'সেই সব বস্তু যা নির্দেশকে আঘাত করে!' আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে দুনিয়ার এই অংশের লোকজন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার মোকাবেলা করে। তারা দুঃখভোগের চেয়ে বরং সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে।

আমার মা একবার পবিত্র কিতাব থেকে একটা ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন— আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করার পর, আদমকে সেজ্‌দা করতে বললেন ফেরেশতাদের। সবাই আদমের সামনে সেজ্‌দা করল কিন্তু ইবলিস, বা শয়তান, তা করল না। 'তুমি কেন সেজ্‌দা করলে না?' আল্লাহ প্রশ্ন করলেন। 'আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। তাতে করে আমি কি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই?' শয়তান তর্ক করল। আল্লাহ বললেন, 'বেহেশত থেকে দূর হয়ে যা! তোর উদ্ধত অহংকারের জায়গা নয় এটা।' শয়তান আল্লাহর কথা মেনে নিল, তবে আদমের জন্যও একই ভাগ্য বরণের অভিশম্পাত দেওয়ার আগে নয়। একটা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে নির্দেশ লংঘনকারীতে পরিণত হলেন আদম, সুতরাং অবিলম্বে অভিশম্পাত লেগে গেল। আল্লাহ বললেন, 'এই স্থান থেকে দূর হও, আর তোমার বংশধররা যেন সন্দেহ আর অবিশ্বাসের মধ্যে জীবন যাপন করে।'

ভারতীয় সংগঠনগুলোর জীবনকে যা কঠিন করে তুলেছে তাহল এই উদ্ধত অহংকার। এর কারণেই আমরা আমাদের কনিষ্ঠদের কথা, অধিনস্তদের কথা বা নিম্নবর্গের মানুষদের কথা শুনি না। যদি কোনও ব্যক্তির ওপর তুমি পীড়ন চালাও, তাহলে তার কাছ থেকে ভাল কিছুর ফলাফল তুমি আশা করতে পার না। তুমি তাকে নির্যাতন করলেও সে সৃষ্টিশীল ব্যক্তি হয়ে উঠবে তা আশা করা যায় না। বলিষ্ঠতা ও রূঢ়তা, শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দুর্বলের উপর নির্মম নিপীড়ন, শৃঙ্খলা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা ইত্যাদির মধ্যে যে রেখা আছে তা ভাল কথা, কিন্তু সে রেখা টানতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে আজ 'হিরো' ও 'জিরো'র মধ্যে লক্ষণীয় রেখা টানা হয়েছে। এর এক দিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকশ' 'হিরো' আর অন্যদিকে নয়শ' পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ। এ পরিস্থিতি বদলাতে হবে।

নাসা থেকে আমার ফিরে আসার পর পরই, ভারতের প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ করা হল ২১ নভেম্বর ১৯৬৩ সালে। রকেটটার নাম ছিল নাইক-অ্যাপাচি, তৈরি

www.pathagar.com

করা হয়েছিল নাসায়। রকেটটা অ্যাসেম্বল করা হয়েছিল গির্জা ভবনে, যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। রকেটটা পরিবহনের জন্য একমাত্র সুলভ যে ইকুইপমেন্ট পাওয়া গেল সেটা ছিল একটা ট্রাক এবং একটা হস্তচালিত হাইড্রলিক ক্রেন। অ্যাসেম্বল করা রকেটটা গির্জা ভবন থেকে উৎক্ষেপণ মঞ্চে তুলতে হয়েছিল ট্রাকের সাহায্যে। ক্রেন দিয়ে যখন রকেটটা উত্তোলন করা হয়েছে এবং লঞ্চারে স্থাপন করার উপক্রম করা হয়েছে, তখনই সেটা কাত হতে শুরু করল, ক্রেনের হাইড্রলিক সিস্টেমে একটা ছিদ্র হবার ইঙ্গিত দিল। উৎক্ষেপণ সময় সন্ধ্যা ৬টার একেবারে কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম, কাজেই ক্রেন মেরামতের কোনও সুযোগ আমাদের ছিল না। সৌভাগ্যবশত ছিদ্রটা তত বড় ছিল না আর রকেটটা হাত লাগিয়ে তুলে ফেলতে আমরা সক্ষম হলাম, আমাদের সম্মিলিত পেশী শক্তি ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত লঞ্চারের উপর সেটা স্থাপন করলাম।

নাইক-অ্যাপাচি উৎক্ষেপণে আমি ছিলাম রকেট একীভবন ও নিরাপত্তার দায়িত্বে। আমার দুজন সহকর্মী যারা এই উৎক্ষেপণে অত্যন্ত সক্রিয় ও কঠিন ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন ডি ঈশ্বরদাস ও আর আরাভামুডান। রকেট অ্যাসেম্বলি ও উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঈশ্বরদাস। আরাভামুডানকে আমরা ডাকতাম ডান বলে, তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাডার, টেলিমেট্রি ও গ্রাউন্ড সাপোর্টের। উৎক্ষেপণটা হয়েছিল মসৃণ এবং সমস্যা-মুক্ত। আমরা অসাধারণ ফ্লাইট ডাটা পেয়েছিলাম আর ফিরে এসেছিলাম গৌরব ও সংসাধনের অনুভূতি নিয়ে।

পরের সন্ধ্যায় আমরা আয়েশ করছি ডিনার টেবিলে, ঠিক তখনই খবর পেলাম টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ডালাসে নিহত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। আমরা আতংকিত হলাম। কেনেডির শাসনামলটা ছিল আমেরিকায় অসাধারণ একটা যুগ। ১৯৬২ সালের মিসাইল সংকটে কেনেডির তৎপরতার বিষয় খুব আগ্রহ নিয়ে আমি পড়তাম। কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসাইল সাইট নির্মাণ করেছিল, যেখান থেকে আমেরিকান শহরগুলোর ওপর হামলা চালানো সম্ভব হত। কেনেডি একটা ব্লকেড বা 'কোয়ারেন্টিন' আরোপ করলেন, কিউবায় কোনও আক্রমণাত্মক মিসাইল স্থাপনে বাধা দিলেন। আমেরিকা আরও হুমকি দিল যে, কিউবা থেকে পশ্চিমা যে কোনও দেশের উপর সোভিয়েত পারমাণবিক হামলা হলে সে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর পাল্টা হামলা চালাবে। চৌদ্দ দিনের টান টান নাটকের পর সংকট নিরসন করলেন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট খ্রুশ্চেভ, তিনি কিউবার স্থাপনা অপসারণ ও মিসাইলগুলো রাশিয়ায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন।

পরদিন অধ্যাপক সারাভাইয়ের বিস্তারিত আলোচনা ছিল আমাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তিনি নতুন এক

www.pathagar.com

ফ্রন্টিয়ার সৃষ্টি করছিলেন। এক নতুন প্রজন্ম, ৩০ ও ৪০-এর দশকের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী, সবাই স্পন্দিত হচ্ছিল অভূতপূর্ব এক গতিশীলতায়। ইনকসপারে আমাদের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ছিল আমাদের ডিগ্রি বা প্রশিক্ষণ নয়, আমাদের সামর্থ্যের উপর অধ্যাপক সারাভাইয়ের বিশ্বাস। নাইক-অ্যাপাচির সফল উৎক্ষেপণের পর, একটা ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল নির্মাণের যে স্বপ্ন তার ছিল সেই স্বপ্ন তিনি আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক সারাভাইয়ের আশাবাদ ছিল অত্যন্ত সংক্রামক। থুম্বায় তার আগমণের নির্দিষ্ট খবর লোকজনকে যেন বৈদ্যুতিক করে তুলত আর সমস্ত গবেষণাগার, ওয়ার্কশপ ও ডিজাইন অফিস গুঞ্জন করতে থাকত অবিরাম কর্মতৎপরতায়। লোকেরা দৃশ্যত চব্বিশ ঘন্টা কাজ করত। কারণ তারা অধ্যাপক সারাভাইকে নতুন কিছু দেখাতে চাইত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, এমন কিছু যা আগে আর কখনও করা হয়নি আমাদের দেশে—তা হোক একটা নতুন ডিজাইন কিংবা ফেব্রিকেশনের একটা নতুন পদ্ধতি অথবা এমন কি অদ্ভুত কোন প্রশাসনিক প্রসিডিওর। অধ্যাপক সারাভাই প্রায়ই একক কোনও ব্যক্তি বা কোনও দলকে একাধারে নানাবিধ কাজ দিতেন। প্রথম দিকে মনে হত ওসব কাজ পরস্পরের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন, পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যেত ওগুলো পরস্পরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক সারাভাই যখন স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (এসএলভি) সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, প্রায় এক নিঃশ্বাসে, সামরিক বিমানের জন্য রকেট -অ্যাসিস্টেড টেক-অফ সিস্টেম (আরএটিও) বিষয়ে আমি যেন পড়াশোনা করি। এই মহান দ্রষ্টার মনে ছাড়া এ দুটো বিষয়ের স্পষ্ট কোনও যোগাযোগ ছিল না। আমি জানতাম যে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে আর আমার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং আগে বা পরে চ্যালেঞ্জিং কোনও কাজ করার সুযোগ আমার গবেষণাগারে প্রবেশ করবে।

অধ্যাপক সারাভাই তরুণদের অভিনব ভাবনা বের করে আনার ও তা তাদের মনে আঁকার চেষ্টা করতেন। তার এমন জ্ঞান ও বিচার বোধ ছিল যা দিয়ে তিনি কোনও ভাল কিছু হয়ে থাকলে উপলব্ধি করতে পারতেন। তবে এটাও জানতেন কখন থামতে হবে। আমার মতে, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ নিরীক্ষক ও উদ্ভাবক। আমাদের সামনে যখন কাজের বিকল্প কোর্স থাকত, যার ফলাফল সম্পর্কে আগেই কিছু বলা ছিল শক্ত, তখন তার সামাধান বের করে দিতেন অধ্যাপক সারাভাই। ১৯৬৩ সালে ইনকসপারে এই ছিল পরিস্থিতি। একদল তরুণ, অনভিজ্ঞ, কিন্তু উদ্যমী ও উৎসাহী ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছিল সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আর নির্দিষ্টভাবে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠার কাজ। এটা ছিল আস্থার দ্বারা নেতৃত্বের এক বিশাল উদাহরণ।

রকেট উৎক্ষেপণ এলাকাটি পরে বিকশিত হল থুম্বা ইকুয়াটরিয়াল রকেট লঞ্চ স্টেশন (টিইআরএলএস) নামে। ফ্রান্স, ইউএসএ ও ইউএসএসআর-এর সক্রিয়

www.pathagar.com

সহযোগিতায় টিইআরএলএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির নেতা—অধ্যাপক বিক্রম সারাভাই—চ্যালেঞ্জের পূর্ণ সংশ্লেষ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা এড়িয়ে যাননি। ইনকসপার যে দিন গঠন করা হয় ঠিক সেই দিন থেকেই তিনি সচেতন ছিলেন একটা অখন্ড জাতীয় মহাকাশ কর্মসূচি আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। সেই সঙ্গে রকেট তৈরির সাজ-সরঞ্জাম ও উৎক্ষেপণ স্থাপনার উন্নয়ন।

এই ব্যাপারটা মনে রেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আহমেদাবাদে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি এবং স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টারে যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করা হয় সেগুলো ছিল রকেট ফুয়েল, প্রপালসন সিস্টেম, অ্যারোনটিক্স, অ্যারোস্পেস ম্যাটেরিয়াল, অ্যাডভান্সড ফেব্রিকেশন টেকনিক, রকেট মটর ইন্সট্রুমেন্টেশন, কন্ট্রোল অ্যান্ড গাইডেন্স সিস্টেম, টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং সিস্টেম এবং মহাশূন্যে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। ঘটনা পরম্পরায় বছর জুড়ে এই গবেষণাগার সৃষ্টি করেছে বিপুলসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী।

ভারতীয় অ্যারোস্পেস কর্মসূচির সত্যিকারের যাত্রা শুরু হয়েছিল রোহিনী সাইন্ডিং রকেট (আরএসআর) প্রগ্রাম থেকেই। একটা ক্ষেপণাস্ত্র এবং একটা সাইন্ডিং রকেটকে স্বতন্ত্র করে কোন বিষয়টা? প্রকৃতপক্ষে এগুলো তিনটি আলাদা ধরনের রকেট। সাউন্ডিং রকেট সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় পৃথিবীর নিকটবর্তী পরিবেশ অনুসন্ধানের কাজে, অ্যাটমসফিয়ারের ওপরের অঞ্চলসহ। উচ্চতার একটা সীমা পর্যন্ত এগুলো বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক পেলোড নিয়ে যেতে পারে, তবে পেলোডের নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের জন্য প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত গতি প্রয়োগ করতে পারে না। অন্যদিকে লঞ্চ ভেহিকল এমনভাবে নকশা করা হয় যা কৃত্রিম উপগ্রহ বা প্রযুক্তিগত পেলোডকে নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের বেগসহ ইনজেক্ট করতে পারে। একটা লঞ্চ ভেহিকলের শেষ স্তর প্রয়োজনীয় বেগ দিয়ে থাকে কৃত্রিম উপগ্রহে নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের জন্য। এটা একটা জটিল কার্যক্রম যাতে প্রয়োজন হয় গাইডেন্স ও কন্ট্রোল সিস্টেম। একটা ক্ষেপণাস্ত্র, একই পরিবারের সদস্য হলেও, আরও বেশি জটিল পদ্ধতির অন্তর্গত। বিশাল টার্মিনাল ভেলোসিটি ও অনবোর্ড গাইডেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে এতে আরও যোগ করতে হয় লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানার সামর্থ্য। লক্ষ্যবস্তু যখন থাকে দ্রুতগতিতে ধাবমান আর কৌশলে অভিযান চালানোয় পারদর্শী, তখন ক্ষেপণাস্ত্রেও যোগ করতে হয় টার্গেট-ট্র্যাকিং ফাংশন।

আরএসআর কর্মসূচি ছিল ভারতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাউন্ডিং রকেট উন্নয়ন ও ফেব্রিকেশন। এই কর্মসূচির অধীনে অপারেশনাল সাউন্ডিং রকেটের একটা পরিবার প্রস্তুত করা হয়েছিল। এসব রকেটের ছিল বিস্তৃত রেঞ্জিং সামর্থ্য, আর আজ পর্যন্ত কয়েক শ রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক গবেষণা কাজে।

www.pathagar.com

আমার এখনও স্মরণ আছে যে প্রথম রোহিনী রকেটটিতে সংযোজিত ছিল ৩২ কেজি ওজনের একটা একক প্রপালসন মোটর। এটা ৭ কেজি পেলোড উত্তোলন করেছিল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উঁচুতে। এর পর পর আরও একটা রকেট ছোঁড়া হয়, তাতে ১০০ কেজি পেলোড উৎক্ষেপণ করা হয় ভু-পৃষ্ঠ থেকে ৩৫০ কিলোমিটার উঁচুতে।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রকেটের উন্নয়ন কার্যক্রমকে দেখা যেতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীর দেখা টিপু সুলতানের স্বপ্নের পুনরুজ্জীবন। টিপু সুলতান যখন নিহত হন, তখন বৃটিশরা ১৭৯৯ সালে তুরুখানাহাল্লীর যুদ্ধে ৭০০ রকেট ও ৯০০ রকেটের সাবসিস্টেম দখল করেছিল। টিপুর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ২৭টি ব্রিগেড, এদের বলা হত কুশুন, আর প্রতিটা ব্রিগেডে ছিল রকেট নিক্ষেপকারীদের নিয়ে একটি করে কোম্পানি, এদের বলা হত জুর্ক। উইলিয়াম কনগ্রিভ এই রকেটগুলো ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়। বৃটিশরা সেখানে এইসব রকেট নিয়ে যে গবেষণা চালায় আজকের দিনে তাকে আমরা 'রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং' বলি। সে কালে অবশ্যই কোনও গ্যাট, আইপিআর অ্যাক্ট, অথবা পেটেন্ট ব্যবস্থা ছিল না। টিপু সুলতানের মৃত্যুর সাথে সাথে ভারতীয় রকেট বিজ্ঞানেরও মৃত্যু ঘটে—অন্তত ১৫০ বছরের জন্য।

ইতিমধ্যে বিদেশে রকেট প্রযুক্তি ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। রাশিয়ায় কন্সতান্তিন ৎসিওলকোভ্স্কি (১৯০৩), যুক্তরাষ্ট্রে রবার্ট গডার্ড (১৯১৪) এবং জার্মানিতে হেরমান ওবার্থ (১৯২৩) রকেটবিজ্ঞানকে পৌঁছে দেন নতুন মাত্রায়। নাৎসি জার্মানিতে ভের্নার ফন ব্রাউন-এর গ্রুপ V-2 নামে নিকটপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন করে এবং মিত্রবাহিনীর উপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করে দেয়। যুদ্ধের পর ইউএসএ এবং ইউএসএসআর উভয়েই জার্মান রকেট প্রযুক্তি হস্তগত করে আর আটক করে রকেট ইঞ্জিনিয়ারদের। এদের দিয়ে তারা মিসাইল ও ওয়ারহেড উৎপাদনের মাধ্যমে শুরু করে তাদের ভয়াবহ অস্ত্র-প্রতিযোগিতা।

ভারতে রকেট বিজ্ঞান পুনর্জন্ম লাভ করেছে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির কল্যাণে। অধ্যাপক সারাভাই এই স্বপ্নকে মূর্ত করে তোলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। অসংখ্য ব্যক্তি একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে মহাকাশ গবেষণার এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যে রাষ্ট্রে অসংখ্য মানুষ খাদ্য-সংকটে ভোগে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরু বা অধ্যাপক সারাভাই তাদের লক্ষ্য থেকে পিছপা হননি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ঃ ভারতীয়রা যদি বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাদের বাস্তব-জীবনের সমস্যায় প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। আমাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য এর ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল না তাদের।

www.pathagar.com

৫

অধ্যাপক সারাভাই প্রায়ই থুম্বায় আসতেন। প্রতিবারই তিনি পুরো দলের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতেন খোলামেলা ভাবে। তিনি কখনও নির্দেশ দিতেন না। বরং মুক্ত মত বিনিময়ের ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে যেতেন সামনের দিকে যাতে অনেক সমস্যার সমাধান আমরা বের করতে পারতাম সহজেই। ফলপ্রসূ নেতৃত্বের প্রধান গুণের সমস্যার সম্মিলিত বোঝাপড়ার বিষয়টি তিনি বিবেচনা করতেন। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখ, আমার কাজ হল সিদ্ধান্ত নেওয়া ; কিন্তু আমার দলের সদস্যরা আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছে কি না সেটাও বিবেচনা করা সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

আসলে অধ্যাপক সারাভাই ধারাবাহিকভাবে কতকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা ছিল অনেকের জন্য লাইফ-মিশন। আমরা আমাদের নিজেদের রকেট তৈরি করব। নিজেদের স্যাটেলাইট তৈরি করব। আর এসব করা হবে একটার পর একটা নয়, একই সঙ্গে। একটা বহুমাত্রিক ধারায়। সাউন্ডিং রকেটের জন্য পেলোড উৎপাদনে, একটা নির্দিষ্ট পেলোড নিয়ে রকেটে তা সংযুক্ত করার পরিবর্তে, আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বিভিন্ন অবস্থানে এবং বিভিন্ন সংগঠনে কর্মরত পেলোড বিজ্ঞানীদের সাথে। আমি এমন কি এও বলতে পারি যে, সাউন্ডিং রকেট কর্মসূচির সবচেয়ে অসাধারণ সাফল্য ছিল দেশব্যাপী মিউচুয়াল ট্রাস্ট গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

www.pathagar.com

আমার বৈধ কর্তৃত্ব খাটানোর চেয়ে লোকজনকে আমি বুঝিয়ে কাজ করাতাম বুঝতে পেরে অধ্যাপক সারাভাই আমাকে পেলোড বিজ্ঞানীদের আনুষঙ্গিক সহায়তা দানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের প্রায় সব ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি জড়িত ছিল সাউন্ডিং রকেট কর্মসূচিতে, প্রত্যেকের ছিল নিজ নিজ দায়িত্ব, নিজের বিষয় এবং নিজের পেলোড। এসব পেলোড এমনভাবে তৈরি করা হত যাতে করে ফ্লাইট কন্ডিশনে এগুলো যথাযথ ভাবে কাজ করে। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য রকেটে যুক্ত করা হত এক্স-রে পেলোড ; অ্যাটমসফিয়ারে উপরের স্তরে গ্যাস কম্পজিশন বিশ্লেষণের জন্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাস স্পেক্ট্রমিটারে যুক্ত পেলোড ; হাওয়ার অবস্থা, প্রবাহ ও গতি বুঝতে সোডিয়াম পেলোড। অ্যাটমসফিয়ারের বিভিন্ন স্তর আবিষ্কার করার জন্য আয়োনসফেরিক পেলোডও আমাদের ছিল। টিআইএফআর, ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি (এনপিএল) ও ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি (পিআরএল)-এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তো মিলিতভাবে আমাকে কাজ করতে হয়েছিলই, তাছাড়াও আমি একত্রে কাজ করেছিলাম ইউএসএ, ইউএসএসআর, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপানের পেলোড বিজ্ঞানীদের সঙ্গে।

আমি প্রায় সময় কাহলিল জিবরানের রচনা পড়ি। আর সব সময় তার লেখায় আবিষ্কার করি জ্ঞানের কথা। 'ভালবাসা ছাড়া যে রুটি তৈরি করা হয় সে রুটি তিক্ত রুটি যা একজন মানুষের ক্ষুধা অর্ধেক মেটাতে পারে,'— যারা হৃদয় ঢেলে কাজ করতে পারে না তারা সাফল্য অর্জন করে আধাআধি যার থেকে সৃষ্টি হয় তিক্ততা। তুমি যদি একজন লেখক হও অথচ মনের গোপন বাসনা থাকে একজন ডাক্তার বা আইনজ্ঞ হবার, তাহলে তোমার লেখা পাঠকদের পড়ার ক্ষুধা মেটাবে অর্ধেকটা, পুরোপুরি নয়। তুমি যদি শিক্ষক হও যে কিনা ব্যবসায়ী হতে চাও, তাহলে তোমার পাঠদান তোমার ছাত্রদের জ্ঞানের তৃষ্ণা পুরোপুরি নিবারণ করতে পারবে না। তুমি যদি এমন একজন বিজ্ঞানী হও যে বিজ্ঞানকে অপছন্দ করে, তাহলে তোমার কাজ অর্ধেক প্রয়োজন মেটাবে তোমার মিশনের। ব্যক্তিগত সুখহীনতা ও ফলাফল অর্জনে ব্যর্থতা নতুন নয়। কিন্তু অধ্যাপক ওডা ও সুধাকরের উদাহরণ যখন সামনে আসে তখন অন্যরকম ভাবনা আসাটাই স্বাভাবিক। নিজেদের কাজের মধ্যে তারা যোগ করেছিলেন তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, আর হয়তো তাদের হৃদয়ের স্ফটিক-স্বচ্ছস্বপ্ন। নিজেদের কাজের সঙ্গে তারা এতটা আবেগপ্রবণ ভাবে যুক্ত ছিলেন যে, তাদের চেষ্টায় কোনও সাফল্য না এলে তারা ভীষণ বেদনার্ত হতেন।

www.pathagar.com

অধ্যাপক ওডা ছিলেন জাপানের ইন্সটিটিউট অব স্পেস অ্যান্ড এ্যারোনটিক্যাল সায়েন্সেস (আইএসএএস)-এর এক্স-রে পেলোড বিজ্ঞানী। উঁচু ব্যক্তিত্ব আর উজ্জ্বল দ্যুতিময় চোখের মানুষ হিসেবে তাকে আমার মনে আছে। কাজের প্রতি তার উৎসর্গকৃত মনোভাব ছিল দৃষ্টান্তমূলক। আইএসএএস থেকে তিনি এক্সরে পেলোড আনতেন, অধ্যাপক ইউআর রাও-এর তৈরি এক্স-রে পেলোডসহ ওই পেলোড আমার দল রোহিনী রকেটের নাকের ডগায় বসিয়ে দেওয়ার জন্য প্রকৌশলগত কাজকর্ম করত। ভূ-পৃষ্ট থেকে ১৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় সেই নাকের ডগা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত ইলেকট্রনিক টাইমারের সাহায্যে পাইরোস বিস্ফোরণে। এভাবে মহাশূন্যে এক্স-রে সেন্সর স্থাপন করা হত চাহিদা অনুযায়ী নক্ষত্রমন্ডলী থেকে নির্গত বস্তুর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। অধ্যাপক ওডা ও অধ্যাপক রাও একত্রে ছিলেন মেধা ও আত্মত্যাগের এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত, সচরাচর যা দেখা যায় না। একদিন আমি যখন আমার টাইমার ডিভাইস নিয়ে অধ্যাপক ওডার পেলোডের জন্য একীভবনের কাজ করছিলাম, তখন তিনি জাপান থেকে আনা টাইমার ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমার কাছে ওগুলো মনে হল দুর্বল, কিন্তু অধ্যাপক ওডা অনড় হয়ে রইলেন তার জাগায় যে ভারতীয় টাইমারের বদলে জাপানী টাইমার ব্যবহার করতে হবে। আমি তার পরামর্শ মেনে নিয়ে টাইমার বদল করলাম। রকেট চমৎকারভাবে আকাশে উঠল আর নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছাল। কিন্তু টেলিমেট্রি সিগনাল থেকে জানা গেল, টাইমার যথাযথভাবে কাজ না করায় মিশন ব্যর্থ হয়েছে। অধ্যাপক ওডা এতটাই বিষণ্ন হয়েছিলেন যে তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। আমি হতবাক হয়ে পড়েছিলাম অধ্যাপক ওডার এই আবেগপূর্ণতা দেখে। তিনি স্পষ্টত হৃদয়-মন সঁপে দিয়েছিলেন তার কাজে।

পেলোড প্রিপারেশন ল্যাবরেটরিতে সুধাকর ছিল আমার সহকর্মী। উৎক্ষেপণ-পূর্ব শিডিউলের অংশ অনুযায়ী আমরা বিপদজনক সোডিয়াম ও থার্মাইট মিশ্রণ পূর্ণ করছিলাম ও দূরনিয়ন্ত্রণ উপায়ে চাপ প্রয়োগ করছিলাম। চিরাচরিত ভাবে থুম্বার দিনটা ছিল গরম ও আর্দ্র। এ ধরনের ছয়টি অপারেশনের পর সুধাকর ও আমি মিশ্রণ যথাযথ পূর্ণ হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্য পেলোড রুমে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ তার কপাল থেকে এক ফোটা ঘাম পড়ল সোডিয়ামে, আর কি হচ্ছে আমরা বুঝে ওঠার আগেই, প্রচন্ড এক বিস্ফোরণে কামরাটা কেঁপে উঠল। একেবারে অসাড় কয়েকটি মুহূর্তে আমি বুঝতে পারিনি কি করতে হবে। আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল, আর পানি দিয়ে সোডিয়ামের আগুন নেভান যেত না। এই অবস্থার মধ্যেও সুধাকর কিন্তু চেতনা হারায়নি। খালি হাতেই সে জানলার কাচ ভেঙে ফেলল আর আক্ষরিক অর্থেই আমাকে জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিয়ে নিজেও লাফিয়ে পড়ল। আমি কৃতজ্ঞতায় সুধাকরের হাত

www.pathagar.com

স্পর্শ করলাম। তার হাত থেকে তখন রক্ত ঝরছিল, যন্ত্রণার মধ্যেও হাসছিল সে। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কারণে সুধাকরকে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

টিইআরএলএসে আমি জড়িত ছিলাম রকেট তৈরির তৎপরতা, পেলোড অ্যাসেম্বলি, টেস্টিং এবং ক্রমোন্নতি ইত্যাদি ছাড়াও পেলোড হাউজিং ও জেটিসনেবল নোজ কোন-এর মত সাবসিস্টেম নির্মাণের কাজেও। স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে নোজ কোন নিয়ে আমার কাজ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কম্পোজিট ম্যাটারিয়ালের ক্ষেত্রে।

এটা খুব কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার যে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে যে সব ধনুক পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, ভারতীয়রা কাঠ, পেশীতন্তু ও শিং দিয়ে তৈরি কম্পোজিট (যৌগিক) ধনুক ব্যবহার করত একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, মধ্যযুগীয় ইউরোপে ওই ধরনের ধনুক তৈরির আরও অন্তত ৫০০ বছর আগে। কম্পোজিটের বহুমুখ-কর্মশক্তি সম্পন্নতা আমাকে চমৎকৃত করেছিল। এই দিক থেকে যে এতে থাকে অত্যন্ত আকাঙ্খিত গঠনগত, থার্মাল, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক সমৃদ্ধি। মানুষের তৈরি এই বস্তুতে আমি এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে তাড়াহুড়া করে এক রাতের মধ্যে এ বিষয়ে সব কিছু জানতে চেয়েছিলাম। এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব লেখা আমি পড়তাম যা পাওয়া যেত হাতের কাছে। আমি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম গ্লাস ও কার্বন ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) কম্পোজিট সম্পর্কে।

একটা এফআরপি কম্পোজিট বিন্যাস্ত করা হয় ম্যাট্রিক্সে ইনঅর্গানিক ফাইবার বুননের মাধ্যমে—এতে এফআরপি কম্পোজিট জমাট হয় এবং অংশগুলোকে একটা আকার দেয়। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী টিইআরএলএসকে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সায়েন্স কক্ষ্যনিটির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে থুম্বায় আসেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি আমাদের গবেষণাগারে দেশের প্রথম ফিলামেন্ট উইন্ডিং মেশিন প্রদান করেন। এই ঘটনা আমার দলকে বিপুল পরিতৃপ্তি এনে দিল, যে দলে ছিলেন সিআর সত্য, পিএন সুব্রামানিয়ান ও এমএন সত্যনারায়ণ। নন-ম্যাগনেটিক পেলোড হাউজিং বানাতে আমরা তৈরি করলাম হাই-স্ট্রেংথ গ্লাস ক্লোথ লেমিনেট এবং টু-স্টেজ সাউন্ডিং রকেটে সেগুলো মহাকাশে পাঠালাম। এ ছাড়া ৩৬০ এমএম ডায়ামিটারের মোটর কেসিংও আমরা পরীক্ষা করলাম। ধীরগতিতে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, দুটো ভারতীয় রকেট জন্ম নিল থুম্বায়। নভঃদেব ইন্দ্রের দরবারের দুই পৌরাণিক নর্তকী রোহিনী ও মেনকার নামে রকেট দুটোর নামকরণ করা হয়েছিল। ভারতীয় পেলোড মহাকাশে উৎক্ষেপণের জন্য ফরাসি রকেটের প্রয়োজন ছিল না আর। ইনকসপারে অধ্যাপক সারাভাই যে

www.pathagar.com

আস্থা ও কমিটমেন্টের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই পরিবেশ না হলে কি এসব করা যেত? তিনি প্রতিটা ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি সমস্যা সমাধানে প্রত্যেককে সরাসরি অংশ নেওয়ার মনোভাব তৈরি করে দিয়েছিলেন। দলের সদস্যদের অংশগ্রহণে সমাধান হত নির্ভেজাল আর বাস্তবায়নের দিকে সামগ্রিক কমিটমেন্টের ফল লাভের জন্য সমগ্র দলের আস্থা অর্জন করত তা।

অধ্যাপক সারাভাই নিজের হতাশা কখনও লুকানোর চেষ্টা করতেন না। তিনি সৎ ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কথা বলতেন আমাদের সাথে। কোনও কোনও সময় আমি দেখতাম, ব্যাপার যতটা ইতিবাচক নয় তার চেয়ে বেশি ইতিবাচক করে তুলতেন তিনি, তারপর আমাদের উৎফুল্ল করে তুলতেন প্রত্যয় উৎপাদনের তার প্রায় জাদুকরি শক্তিতে। আমরা ড্রয়িং বোর্ডে থাকলে, তিনি উন্নত বিশ্ব থেকে কাউকে নিয়ে আসতেন টেকনিক্যাল সহযোগিতার জন্য। আমাদের সামর্থ্য প্রসারিত করতে আমাদের সবার প্রতি ওটাই ছিল তার চ্যালেঞ্জের ধারা।

একই সময়ে, আমরা কোনও নির্দিষ্ট বিষয় অর্জনে ব্যর্থ হলেও, যেটুকু আমরা অর্জন করতাম তারও প্রশংসা করতেন তিনি। প্রথম রোহিনী-৭৫ রকেট যখন ১৯৬৭ সালের ২০ নভেম্বর টিইআরএলএস থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, সেই সময় আমরা প্রায় সবাই তার বশীভূত ছিলাম।

পরের বছর প্রথম দিকে অধ্যাপক সারাভাই জরুরি ভিত্তিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন দিল্লীতে। এতদিনে আমি অধ্যাপক সারাভাইয়ের কর্ম পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি সব সময় উদ্যম আর আশাবাদিতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। মনের ওই রকম একটা অবস্থায় অনুপ্রেরণার আকস্মিক ঝলক ছিল প্রায় স্বাভাবিক। দিল্লীতে পৌঁছে আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করলাম অধ্যাপক সারাভাইয়ের সেক্রেটারির সঙ্গে, আমাকে বলা হল রাত সাড়ে তিনটার সময় হোটেল অশোকায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। দিল্লী খানিকটা অপরিচিত জায়গা। আমার মত লোকের জন্য এখানকার আবহাওয়াও তেমন অনুকূল নয়, আমি অভ্যস্ত দক্ষিণ ভারতের গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায়, সুতরাং ডিনার শেষ করে হোটেলের লাউঞ্জে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি সব সময় একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সেটা এই চেতনায় যে খোদার সঙ্গে আমি কাজের একটা অংশীদারীত্ব রক্ষা করি। আমি সচেতন ছিলাম যে আমার যা ক্ষমতা আছে ভাল কাজের জন্য তার চেয়ে আরও বেশি সামর্থ্য আমার প্রয়োজন, আর একমাত্র খোদাই আমার প্রয়োজনীয় সাহায্য আমাকে দিতে পারেন। নিজের সামর্থ্যের একটা প্রকৃত হিসেব আমি করেছিলাম, তারপর ৫০ শতাংশ তা উন্নীত করি, আর নিজেকে সঁপে দিই খোদার হাতে। এই অংশীদারীত্বে আমার প্রয়োজনীয় সব শক্তি আমি পেয়েছি, এবং প্রকৃতই তার প্রবাহ অনুভব করেছি নিজের মধ্যে। আজ আমি নিশ্চিত করতে পারি যে এই শক্তির আকারেই খোদার

www.pathagar.com

রাজ্য বিরাজমান রয়েছে তোমার মধ্যে, তোমার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে আর তোমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে।

বিভিন্ন ধরন ও স্তরের অভিজ্ঞতা আছে যা এই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কখনও কখনও, যখন আমরা প্রস্তুত থাকি, তখন তার সঙ্গে যোগাযোগ আমরা অনুভব করি অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান দিয়ে। এটা আসতে পারে অন্য আরেক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে, একটা শব্দ থেকে, একটা প্রশ্ন থেকে, একটা ইঙ্গিত বা এমন কি একটা দৃষ্টিপাত থেকে। অনেক সময় এটা আসতে পারে একটা বইয়ের ভিতর দিয়ে, একটা আলাপচারিতার ভিতর দিয়ে, একটা বাগবৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়ে, এমন কি কবিতার একটা লাইন অথবা ছবির একটা দৃশ্য থেকেও। সামান্যতম সতর্কতা ছাড়াই, নতুন কিছু ঢুকে পড়ে তোমার জীবনে আর শুরু করতে একটা গোপন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একটা সিদ্ধান্ত যে তুমি সম্পূর্ণ অসচেতন থাকবে হয়তো।

অভিজাত লাউঞ্জের চারদিকে আমি তাকালাম। কেউ একজন একটা বই ফেলে রেখে গিয়েছিল কাছের একটা সোফার উপর। যেন সেই ঠান্ডা রাত্রির ক্ষুদ্র ঘন্টাগুলো কিছুটা উষ্ণ চিন্তায় পূর্ণ করতে আমি বইটা তুলে নিলাম এবং পৃষ্ঠা ওল্টাতে শুরু করলাম। আমি অবশ্যই বইটার কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টেছিলাম, কিন্তু আজ আর তার কিছু মনে করতে পারি না।

বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত একটা জনপ্রিয় বই ছিলো সেটা। আমি বইটা আসলে পড়ছিলাম না। শুধু প্যারাগ্রাফগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে যাচ্ছিলাম আর পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিলাম। অকস্মাৎ বইটার একটা প্যাসেজের উপর আমার চোখ পড়ল, অংশটা ছিল জর্ড বার্নার্ড শ-এর রচনা থেকে একটা উদ্ধৃতি। ঐ উদ্ধৃতির মর্মকথা ছিল এই যে, বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা নিজেদের মানিয়ে নেয় দুনিয়ার সঙ্গে। কেবল মুষ্টিমেয় কিছু বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ নিজেদের সঙ্গে দুনিয়াকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। দুনিয়ার সমস্ত অগ্রগতি নির্ভর করে এই বিচারবুদ্ধিহীন লোকজন ও তাদের উদ্ভাবনামূলক কিন্তু প্রায়ই অনিশ্চিত কাজ কর্মের উপর। বার্নার্ড শ-এর প্যাসেজ থেকে বইটা আমি পড়তে শুরু করেছিলাম। বইটির লেখক শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে উদ্ভাবনা প্রক্রিয়া ও ধারণা যে সব নির্দিষ্ট মিথে বোনা তা বর্ণনা করেছেন। আমি কৌশলগত পরিকল্পনার মিথ সম্পর্কে পড়ি। সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে কৌশলগত এবং প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা 'বিস্ময়' নয় ধরনের ফলাফল প্রচন্ডভাবে বাড়িয়ে দেয়। লেখকের মতামত ছিল যে একজন প্রকল্প ব্যবস্থাপকের পক্ষে অনিশ্চয়তা নিয়ে জীবনযাপন করতে শেখাটা অত্যাবশ্যকীয়।

হোটেলের লবিতে রাত একটার সময় দুই ঘন্টা পরের একটা সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করাটা নিশ্চয়ই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব ছিল না, আমার জন্যও না অধ্যাপক সারাভাইয়ের জন্যও না। তবে অধ্যাপক সারাভাই সব সময়ই এ ধরনের কান্ড করে থাকতেন। দেশে তিনি মহাকাশ গবেষণা চালাচ্ছিলেন একটা—তার স্টাফ ছিল কম, কাজ করতে হত বেশি—তারপরও সাফল্যপূর্ণ আচরণ ছিল তার মধ্যে।

www.pathagar.com

হঠাৎ করে আরেকটা লোকের ব্যাপারে আমি সচেতন হলাম, যিনি এসে আমার বিপরীত দিকে একটা সোফায় বসলেন। ভদ্রলোক বেশ বলিষ্ঠ চেহারার, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি এবং অত্যন্ত পরিপাটি। পোশাক পরিচ্ছদে সব সময়ই আমি অগোছালো, কিন্তু এই ভদ্রোলোকের পোশাকে দেখা যাচ্ছে আভিজাত্য। তাকে যথেষ্ট সতর্ক দেখা যাচ্ছিল।

লোকটার মধ্যে একটা অদ্ভূত চুম্বকীয় শক্তি ছিল যা আমার উদ্ভাবন বিষয়ক ভাবনার ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে দিল। এবং বইটাতে আমি আবার মনোযোগ দেওয়ার আগেই অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ডাক পড়ল। যেখান থেকে বইটা নিয়েছিলাম কাছের সেই সোফার উপর বইটা রেখে দিলাম। আমার বিপরীত দিকের সোফার উপর বসা লোকটিকেও যখন অধ্যাপক সারাভাইয়ের কামরায় ডাকা হল তখন আমি অবাক হলাম। কে এই লোক? আমার উত্তর পেতে বেশি দেরি হল না। আমরা আসন গ্রহণ করার আগেই অধ্যাপক সারাভাই আমাদের দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। লোকটি ছিলেন বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরের গ্রুপ ক্যাপ্টেন ভি এস নারায়ণন।

অধ্যাপক সারাভাই আমাদের দু'জনের জন্য কফির অর্ডার দিলেন এবং সামরিক বিমানের জন্য একটা রকেট- অ্যাসিস্টেড টেক-অফ সিস্টেম (আর এটিও) তৈরির পরিকল্পনা আমাদের সামনে মেলে ধরলেন। এটা আমাদের যুদ্ধ বিমানগুলোকে হিমালয়ের ক্ষুদ্র রানওয়ে থেকে টেক-অফ করতে সাহায্য করবে। অল্পকথার মধ্যে গরম কফি পরিবেশন করা হয়েছিল। অধ্যাপক সারাভাইয়ের স্বভাবসুলভ আচরণের সঙ্গে এর কোন মিল ছিল না। কিন্তু আমরা কফি শেষ করা মাত্র অধ্যাপক সারাভাই উঠে দাঁড়ালেন এবং তার সঙ্গে আমাদের যেতে বললেন দিল্লি নগরীর প্রান্তে অবস্থিত তিলপাত রেঞ্জে। আমরা লবি অতিক্রম করে যাবার সময় আমি কৌতূহলবশত এক নজর তাকালাম সেই সোফাটার দিকে যেটার ওপর বইটা রেখে গিয়েছিলাম। বইটা তখন আর সেখানে ছিল না।

রেঞ্জে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘন্টা গাড়ি চালাতে হল। অধ্যাপক সারাভাই আমাদের দেখালেন একটা রাশিয়ান আরএটিও। 'রাশিয়া থেকে এই পদ্ধতির মোটর যদি আমি আপনাদের পাইয়ে দিই, তাহলে কি আপনারা আঠার মাসের মধ্যে এটা করতে পারবেন?' অধ্যাপক সারাভাই আমাদের কাছে জানতে চাইলেন। 'হাঁা, আমরা পারব!' গ্রুপ ক্যাপ্টেন ভিএস নারায়ণন ও আমি প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলাম। অধ্যাপক সারাভাইয়ের মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তাতে প্রতিফলিত হচ্ছিল আমাদের আবিষ্টতা।

হোটেল অশোকায় আমাদের ফিরিয়ে আনার পর অধ্যাপক সারাভাই ব্রেকফাস্ট মিটিং-এ চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। সেই সন্ধ্যায় আমার নেতৃত্বে ভারতীয় সামরিক বিমানের শর্ট রানওয়েতে উড্ডয়নের জন্য একটা যন্ত্র তৈরির খবর প্রচার করা হল। অসংখ্য আবেগে আমার মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—

www.pathagar.com

সুখ, কৃতজ্ঞতা, পরিপূর্ণতার এক অনুভূতি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বল্প-পরিচিত একজন কবির লেখা একটা কবিতার এই লাইনগুলো আমার মনে ভেসে উঠছিল:

For all your days prepare
And meet them ever alike
When you are the anvil, bear—
When you are the hammer, strike.

আরএটিও মোটর বিমানে যুক্ত করা হয়েছিল টেক-অফ রানের সময় নির্দিষ্ট অপারেটিং কন্ডিশনে অতিরিক্ত ধাক্কা প্রক্ষেপণের জন্য এবং সেই কন্ডিশনগুলো ছিল যেমন আংশিকভাবে বোমা-ধ্বস্ত রানওয়ে, হাই অ্যাল্টিচিউড এয়ারফিল্ড, অতিরিক্ত লোড, অথবা অত্যন্ত চড়া পরিবেষ্টক তাপমাত্রা। এয়ার ফোর্সের এস-২২ ও এইচএফ-২৪ বিমানের জন্য বেশ কিছু আরএটিও অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছিল।

তিলপাত রেঞ্জে যে রাশিয়ান আরএটিও মোটর আমাদের দেখান হয়েছিল সেটা সমর্থ ছিল মোট ২৪৫০০ কেজি-সেকেন্ড ঘাতসহ ৩০০০ কেজি ধাক্কা উৎপাদনে। সেটার ওজন ছিল ২২০ কেজি এবং ইস্পাতের তৈরি একটা ডাবল বেজ প্রপেল্যান্ট ছিল সেটার। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও), এইচএএল, ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার) এবং বিমান বাহিনীর সদরদপ্তরের সহযোগিতায় নির্মাণ কাজ করা হয়েছিল স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টারে।

হাতের কাছে পাওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর, আমি একটা ফাইবারগ্লাস মোটর কেসিং পছন্দ করলাম। একটা কম্পোজিট প্রপেল্যান্টের অনুকূলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। এর সুবিধা ছিল, এটা সর্বোচ্চ ধাক্কা প্রয়োগ করতে পারে এবং পুরোপুরি ভাবে এটা ব্যবহারের জন্য দীর্ঘসময় ধরে জ্বলতে পারে। আমি এছাড়াও অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

আরএটিও নিয়ে কাজ করার সময় দুটো অসাধারণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া সাধিত হয়েছিল। প্রথমটি হল দেশের মহাশূন্যে গবেষণার দশ বছরের একটা প্রফাইল প্রকাশ, এটা প্রস্তুত করেছিলেন অধ্যাপক সারাভাই। এই প্রফাইল শুধুমাত্র একজন শীর্ষব্যক্তি তার দলের কাজকর্ম তুলে ধরার জন্য তৈরি করেছিলেন তা নয়, এটা ছিল মুক্ত আলোচনার এক থিম পেপার, পরবর্তী সময়ে যা রূপান্তরিত হত একটা কর্মসূচিতে। বস্তুত, আমার কাছে এটা ছিল এক ব্যক্তির রোমান্টিক ইশতেহার, নিজের দেশের মহাশূন্য গবেষণা কর্মসূচিকে যিনি গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন।

www.pathagar.com

ইনকসপারে যে আইডিয়ার জন্ম হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল প্রধান পরিকল্পনাটি। এতে আরও যুক্ত ছিল টেলিভিশন ও উন্নয়নমূলক শিক্ষা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থার রিমোট সেন্সিং ইত্যাদির জন্য কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার। এর সঙ্গে আরও যোগ করা হয়েছিল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল-এর উন্নয়ন ও উৎক্ষেপণ।

আগের বছরগুলোয় যেমন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সক্রিয়ভাবে পাওয়া গিয়েছিল, এবারের পরিকল্পনায় স্পষ্টতই তা শিথিল হয়ে গেল। এবার হতে হল পুরোপুরি আত্মনির্ভর। পৃথিবীর নিচু কক্ষপথে হালকা ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য একটা এসএলভি তৈরির বিষয়টি পরিকল্পনায় আলোচিত হয়েছিল। এর অর্থ ছিল, ভারতে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহকে গবেষণাগারের মডেল থেকে মহাশূন্যে স্থাপনযোগ্য প্রকৃত আকারে উন্নীত করা এবং অ্যাপোজি, বুস্টার মোটর, মোমেন্টাম হুইল ও সোলার প্যানেল ডেভলপমেন্ট মেকানিজম্-এর মত বিস্তৃত রেঞ্জের স্পেসক্র্যাফট সাবসিস্টেমের উন্নতি সাধন।

দ্বিতীয় কাজ ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটা মিসাইল প্যানেল গঠন করা। নারায়ণন ও আমি সদস্য হিসেবে তাতে অন্তর্ভূক্ত হই। আমাদের নিজেদের দেশে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির আইডিয়া ছিল উত্তেজনাকর, এবং আমরা বিভিন্ন অগ্রসর দেশের ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে পর্যালোচনা করে ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত করলাম।

ট্যাকটিক্যাল মিসাইল ও স্ট্রাটেজিক মিসাইলের মধ্যে পার্থক্য প্রায় সময়ই বেশ মজার। সাধারণভাবে, 'স্ট্রাটেজিক' বলতে বোঝায় যে এই ক্ষেপণাস্ত্র হাজার হাজার কিলোমিটার উড়তে পারবে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে দূরত্বের বদলে লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানার বেলায় এই টার্ম ব্যবহৃত হয়। স্ট্রাটেজিক মিসাইল হল সেই সব মিসাইল যা শত্রুর একেবারে হৃৎপিন্ডে আঘাত করতে সক্ষম। ট্যাকটিক্যাল অস্ত্র সেগুলো যা প্রভাব খাটায় যুদ্ধে, আর সে যুদ্ধ হতে পারে স্থলভাগে, সমুদ্রে অথবা আকাশে, অথবা এই তিন ক্ষেত্রেই। এই শ্রেণীকরণ আজকের দিনে নির্বোধ বলে প্রতীয়মান হতে পারে, যেমন একটা উদাহরণ ইউএস এয়ার ফোর্সের ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য টমাহক ব্যবহৃত হয় ট্যাকটিক্যাল শ্রেণীতে যার পাল্লা প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার। সেইসব দিনে স্ট্রাটেজিক মিসাইল সমার্থক ছিল ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল (আইআরবিএম)-এর এবং এর পাল্লা ছিল ১৫০০ নটিক্যাল মাইল বা ২৭৮০ কিলোমিটার এবং আরও সমার্থক ছিল ইন্টার- কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল (আইসিবিএম)-এর যার পাল্লা ছিল আরও বেশি।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন নারায়ণনের একটা আকাঙ্খা ছিল গাইডেড মিসাইলের। রাশিয়ান মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রগ্রামের উচ্চাভিলাষের অনুরাগী ছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

'ওখানে যখন এটা করা যেতে পারে, তখন এখানে করা যাবে না কেন? মহাশূন্য গবেষণা যেখানে ইতিমধ্যে মিসাইল প্রযুক্তির ভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছে।' নারায়ণন আমাকে খোঁচা দিতেন।

১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালের দুটো যুদ্ধের তিক্ত শিক্ষা ভারতীয় নেতৃত্বকে সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কৌশলগত অবস্থানসমূহ রক্ষার জন্য ইউএসএসআর থেকে বিপুল পরিমাণ সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল (এসএএম) আনতে হয়েছিল। গ্রুপ ক্যাপ্টেন নারায়ণন দেশে এই মিসাইল তৈরির ব্যাপারে প্রচন্ড আবেদন করেছিলেন।

মিসাইল প্যানেল নিয়ে যখন আমরা কাজ করছিলাম আরএটিও মোটরের উপর, তখন নারায়ণন ও আমি ছাত্র ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করছিলাম যেখানে দরকার সেখানেই নিজেদের বদল করে। তিনি রকেট বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং আমি খুব কৌতূহলী ছিলাম এয়ারবোর্ন উইপন সিস্টেম সম্পর্কে। নারায়ণনের মেধা প্রয়োগের শক্তি ও গভীরতা ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক। অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে সূর্য ওঠারও আগে তিলপাত রেঞ্জে আমাদের সফরের সেই প্রথম দিনটি থেকে নারায়ণন ব্যস্ত ছিলেন তার আরএটিও মোটর নিয়ে। চাওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় সব কিছু তিনি জোগাড় করে রেখেছিলেন। ৭৫ লাখ রূপি তহবিল গঠন করে ফেলেছিলেন এবং আরও খরচ-খরচার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতিও তিনি নিয়ে রেখেছিলেন। 'আপনার যা লাগবে সেটার নাম শুধু আমাকে বলবেন, আমি আপনাকে জিনিসটা এনে দেব, কিন্তু সময় চাইবেন না', তিনি বলেন। সময়ে সময়ে আমি তার অধৈর্য দেখে হাসতাম, আর তাকে পড়ে শোনাতাম টি. এস. এলিয়টের Hollow Men শীর্ষক কবিতার এই লাইনগুলো ঃ

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow.

প্রতিরক্ষা R&D সেই সময়ে প্রচন্ডভাবে নির্ভরশীল ছিল আমদানিকৃত সরঞ্জামের উপর। দৃশ্যত দেশীয় কোনও কিছুই সহজলভ্য ছিল না। আমরা একটা কেনাকাটার তালিকা ও আমদানি পরিকল্পনা তৈরি করলাম। কিন্তু এটা আমাকে নিরানন্দ করে তুলল— বিকল্প কিছু কি ছিল না? এই জাতি কি স্ক্রুড্রাইভার-প্রযুক্তিতেই পড়ে থাকবে মুখ থুবড়ে? ভারতের মত একটা গরীব দেশের এ ধরনের উন্নয়নের সামর্থ্য আছে?

একদিন অনেক দেরিতেও অফিসে কাজ করার সময় একজন তরুণ সহকর্মী জয় চন্দ্র বাবুকে দেখলাম বাড়িতে যাচ্ছে। কয়েক মাস আগে বাবু আমাদের সাথে

www.pathagar.com

যোগ দিয়েছে। তার সম্পর্কে একটা মাত্র বিষয় যা জানতাম তা হল, তার মনোভাব অত্যন্ত ইতিবাচক আর স্পষ্ট। আমি তাকে আমার অফিসের ভিতর ডেকে নিয়ে আমার একটা চিন্তা প্রকাশ করলাম। 'তোমার কোনও পরামর্শ আছে?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। বাবু কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকল, তারপর বলল পরবর্তী সন্ধ্যায় আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তাকে কিছু হোমওয়ার্ক করতে দেওয়া হোক।

পরের সন্ধ্যায় নির্ধারিত সময়ের আগেই বাবু আমার কাছে এল। প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। 'আমরা এটা করতে পারব, স্যার! আরএটিও সিস্টেম প্রস্তুত করতে পারব আমদানি করা জিনিস ছাড়াই। একমাত্র বাধা হচ্ছে সাবকন্ট্রাক্টিং আর প্রকিওরমেন্ট সম্পর্কে সংগঠনের অস্থিতিস্থাপক মনোভাব। কিন্তু আমাদানি এড়াতে হলে এ দুটোর সাহায্য নিতেই হবে।' সে আমাকে সাতটা পয়েন্ট দিল—পুরো সংগঠনের পরিবর্তে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আর্থিক অনুমোদন, পদমর্যাদা যাই হোক এ কাজে সংশ্লিষ্ট প্রতিটা কর্মীর জন্য বিমান ভ্রমণ, কেবল একজনের কাছে জবাবদিহিতা, এয়ার-কার্গোর মাধ্যমে মালামাল উত্তোলন, প্রাইভেট সেক্টরে সাব-কন্ট্রাক্ট, কারিগরি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কাজের আদেশ, এবং অভিযানমূলক ব্যয়ের প্রসিডিওর।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের দাবি অশ্রুতপূর্ব, তবু তার প্রস্তাবে কিছু যুক্তি দেখতে পেলাম আমি। আরএটিও প্রকল্প ছিল একটা নতুন খেলা, সুতরাং নতুন নিয়ম যদি এ খেলায় প্রযুক্ত হয় তাতে ভুল কিছু নেই। আমি একটা পুরো রাত ধরে বাবুর পরামর্শের এপিঠ-ওপিঠ ভেবে দেখলাম এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টা অধ্যাপক সারাভাইয়ের কাছে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। অধ্যাপক সারাভাই দ্বিতীয়বার ভাবলেন না। প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

বাবু উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবসায় বিচারবুদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেছিল। বিদ্যমান কর্ম প্যারামিটারের মধ্যে সব কিছু দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিতে হলে তোমাকে নিয়োগ করতে হবে অধিক লোকবল, অধিক উপাদান, অধিক অর্থ। তুমি তা না করতে পারলে তোমার প্যারামিটার বদলাও! বাবুর মধ্যে ছিল সহজাত ব্যবসায়ী মানুষ, ফলে আমাদের সঙ্গে বেশিদিন সে থাকেনি। আইএসআরও ছেড়ে সে চলে গিয়েছিল নাইজেরিয়ায়। আর্থিক বিষয়ে বাবুর সাধারণ জ্ঞানের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না।

আরএটিও মোটর কেসিং-এর জন্য ফিলামেন্ট ফাইবার গ্লাস/এপোক্সি ব্যবহার করে একটা কম্পোজিট স্ট্রাকচারের জন্য আমরা একটা পন্থা অবলম্বন করেছিলাম। একটা হাই এনার্জি কম্পোজিট প্রপেল্যান্ট এবং একটা ইভেন্ট-বেজড ইগনিশন ও জেটিসনিং সিস্টেমও আমরা তৈরি করেছিলাম যথাসময়ে। এয়ার ক্র্যাফট থেকে জেট এক পাশে সরিয়ে দেবার জন্য একটা ক্যান্টেড নোজল-এর নকশা করা হয়েছিল। প্রকল্প শুরুর দ্বাদশ মাসে আমরা আরএটিওর প্রথম স্ট্যাটিক পরীক্ষা চালাতে সক্ষম হলাম। পরবর্তী চার মাসের মধ্যে আমরা আরও ৬৪টি পরীক্ষা চালাই। অথচ প্রকল্পে আমরা কাজ করছিলাম মাত্র ২০ জন প্রকৌশলী!

www.pathagar.com

৬

ভবিষ্যতের স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্‌ল (এসএলভি) এই সময়েই পরিকল্পিত হয়েছিল। মহাশূন্য প্রযুক্তির অপরিসীম আর্থসামাজিক কল্যাণের বিষয়টি বুঝতে পেরে অধ্যাপক সারাভাই ১৯৬৯ সালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমাদের নিজেদের স্যাটেলাইট নির্মাণ ও উৎক্ষেপণে দেশীয় সামর্থ্য অর্জনের কাজটি পুরো দমে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল ও বড় আকৃতির রকেট উৎক্ষেপণের জন্য একটি সম্ভাব্য জায়গার সন্ধানে আকাশ থেকে পূর্ব উপকূল পর্যবেক্ষণে ব্যক্তিগত ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক সারাভাই পূর্ব উপকূলের দিকে মনোযোগ স্থির করেছিলেন তার কারণ, পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘূর্ণনের পুরো সুবিধা যাতে নিতে পারে লঞ্চ ভেহিকল। তিনি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করলেন মাদ্রাজ (এখন চেন্নাই) থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে শ্রীহরিকোটা দ্বীপ, আর এভাবেই জন্ম নিল এসএইচএআর রকেট লঞ্চ স্টেশন। কাস্তে আকৃতির দ্বীপটি চওড়ায় ছিল সর্বোচ্চ ৮ কিলোমিটার আর অবস্থান ছিল উপকূল বরাবর। মাদ্রাজ নগরীর সমান সেটা বড় ছিল। এর পশ্চিম প্রান্তভাগে সৃষ্টি হয়েছিল বাকিংহাম ক্যানাল ও পুলিক্যাট লেক।

১৯৬৮ সালে আমরা গঠন করলাম ইন্ডিয়ান রকেট সোসাইটি। এর অনতিপরেই, ইনকসপারকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমী (আইএনএসএ)-এর অধীনে একটা অ্যাডভাইসরি বডি হিসেবে পুনর্গঠিত করা

www.pathagar.com

হল। অন্যদিকে দেশে মহাকাশ গবেষণা পরিচালনার জন্য ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি (ডিএই)-এর অধীনে সৃষ্টি করা হল ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (আইএসআরও)।

এই সময় নাগাদ অধ্যাপক সারাভাই একটা ভারতীয় এসএলভির জন্য তার স্বপ্ন পূরণ করতে একটা দল গড়ে ফেলেন। প্রকল্পের নেতা হতে পারায় নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করতে পারি। অধ্যাপক সারাভাই এসএলভির চতুর্থ পর্যায়ের নকশা তৈরির অতিরিক্ত দায়িত্বি আমার ওপর অর্পণ করেন। অন্য তিনটি পর্যায়ের নকশা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় ড. ভিআর গোয়ারিকর, এমআর কুরুপ এবং এই মুথুনায়াগাম-এর উপর।

এমন একটি বিশাল কাজে আমাদের ক'জন মাত্র কর্মীকে লাগানোর ভাবনা এসেছিল কিভাবে অধ্যাপক সারাভাইয়ের মাথায়? একটা কারণ হতে পারে আমাদের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদীক্ষা। ড. গোয়ারিকর অনন্যসাধারণ কাজ করছিলেন কম্পোজিট প্রপেল্যান্টের ক্ষেত্রে। এমআর কুরুপ একটা চমৎকার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রপেল্যান্ট, প্রপালসন ও পাইরোটেকনিকের জন্য। হাই এনার্জি প্রপেল্যান্টের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন মুথুনায়াগাম। চতুর্থ স্তরটা ছিল একটা কম্পোজিট স্ট্রাকচার আর তাতে প্রয়োজন হয়েছিল ফেব্রিকেশন টেকনোলজির ব্যাপক নব-উদ্ভাবন। হয়তো এ জন্যেই আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল।

চতুর্থ স্তরটার ভিত্তি স্থাপন করলাম আমি দুটো পাথরের ওপর—নিশ্চিন্ত অবলম্বন। আমি সব সময় ভুলভ্রান্তিকে গ্রহণ করতাম শিক্ষাপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আমি দুঃসাহসিক হতেও পছন্দ করি। আমার দলের সবার উদ্যোগগুলোর প্রতি সবার মনোযোগও শেখার অংশ হিসেবে আমি সমর্থন করি। সে তারা সফল হোক, বা ব্যর্থ।

আমার দলে প্রতিটা ক্ষুদ্র পদক্ষেপেই অগ্রগতির বিষয়টা স্বীকৃতি পেত আর নতুন শক্তি তাতে সন্নিবেশ করা হত। চতুর্থ স্তর নির্মাণে আমার সহযোগী কর্মীদের আমি প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করতাম। কিন্তু দরকারি উৎসের জন্য পুরোপুরি কাজে লাগতে পারছি কিনা তাতে আমার সন্দেহ ছিল। যে ভাবে আমি সময় ম্যানেজ করছিলাম তাতে কোনও ভুল থেকে যাচ্ছে কি না, তা আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলল। এ পর্যায়ে অধ্যাপক সারাভাই আমাদের কাজের জায়গায় একজন ফরাসি ভিজিটরকে আনলেন, যিনি আমার কাছে সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন ফ্রান্সে আমাদের সহযোগী CNES (Centre Nationale de Etudes Spatiales)-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক কুরিয়েন। ওই সংস্থাটি তখন তৈরি করছিল ডায়মন্ট লঞ্চ ভেহিকল। অধ্যাপক কুরিয়েন ছিলেন আগাগোড়া পেশাদার। অধ্যাপক সারাভাই ও অধ্যাপক কুরিয়েন এক সঙ্গে মিলে আমাকে একটা লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করেছিলেন। যে সব উপায় অবলম্বন করে আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব তা নিয়ে আলোচনা করার সময় তারা আমাকে ব্যর্থতার সম্ভাবনা সম্পর্কেও সতর্ক করে দিলেন। অধ্যাপক কুরিয়েনের

www.pathagar.com

সহযোগিতামূলক শলাপরামর্শের ভিতর দিয়ে চতুর্থ স্তরের সমস্যাগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত। অধ্যাপক সারাভাইয়ের তাড়নায় অধ্যাপক কুরিয়েন তার নিজের ডায়মন্ট কর্মসূচির সাফল্য বার বার ব্যাখ্যা করে শোনাতেন আমাদের।

অধ্যাপক কুরিয়েন ছোট-খাটো কাজ থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বড় সাফল্য অর্জনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অধ্যাপক সারাভাইকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমাদের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা দেখে তিনি এতটাই বিমোহিত হয়েছিলেন যে, আমরা ডায়মন্টের চতুর্থ স্টেজ নির্মাণ করতে পারব কি না তা জানতে চেয়েছিলেন। এতে অধ্যাপক সারাভাইয়ের মুখে কি রকম হাসি ফুটেছিল, আমার তা মনে পড়ে।

আসল ব্যাপারটা হল, ডায়মন্ট ও এসএলভির এয়ারফ্রেম ছিল খাপ খাওয়ানোর অসাধ্য। ডায়ামিটার ছিল একেবারেই আলাদা আর পারস্পরিক বদলের জন্য বেশ কিছু আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম যে ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করব। আমার সহকর্মীরা সমাধান দিতে পারে কি না জানার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি সতর্কতার সঙ্গে সহকর্মীদের রুটিন পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম, যদি তাতে তাদের অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে পাই। এমন কি সামান্যতম সম্ভাবনাও যদি দেখতাম কারো মধ্যে, তাহলে তাকে প্রশ্ন করতে ও তার উত্তর শুনতে আরম্ভ করলাম। আমার কিছু বন্ধু আমাকে সতর্ক করে দিল একটা ব্যাপারে যেটাকে তারা আখ্যায়িত করেছিল আমার সাদাসিধে ভাব হিসেবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিজাইনে ব্যক্তিগত পরামর্শ ও সহকর্মীদের হাতে-লেখা নোট দেওয়া আমি প্রায় নিয়মিত বিষয়ে পরিণত করেছিলাম। তাতে পাঁচ বা দশ দিনের মধ্যে নিশ্ছিদ্র ফলো-আপ অ্যাকশনের অনুরোধ থাকত।

এই পদ্ধতি চমৎকার ভাবে কাজে দিয়েছিল। অধ্যাপক কুরিয়েন প্রমাণ পেলেন, ইউরোপে আমাদের প্রতিপক্ষরা তিন বছরে যা অর্জন করেছে, আমরা তা অর্জন করেছি মাত্র এক বছরের মধ্যে। আমাদের প্লাস পয়েন্ট হিসেবে তিনি ধরেছিলেন যে, আমরা প্রত্যেকেই কাজ করেছি উপর-নিচের সবাই মিলেমিশে। আমার হিসেবটা ছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একবার দল বৈঠকে বসবে। যদিও এতে সময় ও শক্তি খরচ হত, তা সত্ত্বেও এটা আমি অপরিহার্য বিবেচনা করতাম।

একজন নেতা কতটা ভাল? তার জনগণের এবং তাদের অঙ্গীকার ও পূর্ণ অংশীদার হিসেবে প্রকল্পে অংশগ্রহণের চেয়ে বেশি ভাল নয়! যেটুকু ছোট-খাটো সাফল্য অর্জিত হয়েছিল তা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমি তাদের এক সঙ্গে পেয়েছিলাম—ফলাফল, অভিজ্ঞতা, ক্ষুদ্র সাফল্য, আর এ ধরনের বিষয়গুলো—এতে আমার সময় ও শক্তি খরচ মূল্যবান বলেই আমি মনে করতাম। এটা ছিল অঙ্গীকার ও টিমওয়ার্কের চেতনার সামান্য মূল্য। আমার ছোট দলটার মধ্যেই আমি নেতা খুঁজে পেয়েছিলাম, আর জেনেছিলাম যে সকল পর্যায়েই নেতা আছে।

আমরা SLV-IV স্টেজটি ডায়মন্ট এয়ারফ্রেমের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় রদবদল করলাম। ২৫০ কেজি, ৪০০ এমএম ডায়ামিটার স্টেজ থেকে

www.pathagar.com

৬০০ কেজি, ৬৫০ এমএম ডায়ামিটার স্টেজে সেটা রূপান্তরিত করলাম। দু'বছরের চেষ্টার পর যখন সেটা আমরা CNES-এর কাছে হস্তান্তর করতে উদ্যত, ঠিক তখনই ফরাসিরা হঠাৎ করে তাদের ডায়মন্ট বিসি কর্মসূচি বাতিল করে দিল। তারা আমাদের বলল যে, আমাদের স্টেজ ফোর তাদের আর প্রয়োজন নেই। ঘটনাটা ছিল বিশাল আঘাত, দেরাদুনে যেমনটা আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম বিমান বাহিনীতে ঢুকতে, আর বাঙ্গালোরে নন্দী প্রকল্প বিলুপ্ত হয়েছিল এডিইতে, সে সব যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠল।

আমি স্টেজ ফোর নির্মাণে বিশাল আশা রেখেছিলাম, সেই সঙ্গে ছিল আপ্রাণ চেষ্টা, যাতে করে এটা উড়তে পারে একটা ডায়মন্ট রকেটে। এসএলভির অন্য তিনটে স্টেজ ছিল অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর দূরে। যাহোক, ডায়মন্ট বিসির স্টেজ ফোরের হতাশা শিকেয় তুলে রাখতে আমার বেশি সময় লাগেনি। আমি অন্তত এ প্রকল্পের কাজটা আগাগোড়া উপভোগ করেছিলাম। ডায়মন্ট বিসি স্টেজের কারণে আমার মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, যথা সময়ে তা পূরণ করল আরএটিও।

আরএটিও প্রকল্প যখন চলছিল, তখন ধীরে ধীরে আকার নিতে শুরু করেছিল এসএলভি প্রকল্প। একটা লঞ্চ ভেহিকলের সকল প্রধান পদ্ধতির সক্ষমতা ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল থুম্বায়। বসন্ত গোয়ারিকর, এমআর কুরুপ ও মুথুনায়াগাম তাদের অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করেছিলেন টিইআরএলএস।

অধ্যাপক সারাভাই দল-গঠন শিল্পে হয়ে উঠেছিলেন একটা উদাহরণ। একবারের ঘটনায় তাকে একজন যোগ্য ও দায়িত্বশীল এক ব্যক্তিকে যাচাই করে নিতে হয়েছিল, এসএলভির টেলিকমান্ড সিস্টেম তৈরির জন্য। এ কাজে দু'জন ব্যক্তি ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন—একজন ইউআর রাও, অন্যজন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত একজন এক্সপেরিমেন্টার জি মাধবন নায়ার। এই মাধবন নায়ারের আত্মোৎসর্গ ও সক্ষমতায় আমি গভীর ভাবে মুগ্ধ হলেও, আমার মনে হয়নি তার সুযোগের মাত্রা খুব ভাল। অধ্যাপক সারাভাইয়ের নিয়মিত পরিদর্শনের সময় একদিন মাধবন নায়ার অতিশয় সাহসিকতার সঙ্গে প্রদর্শন করলেন তার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য টেলিকমান্ড সিস্টেম। অধ্যাপক সারাভাই একজন প্রতিষ্ঠিত এক্সপার্টের বদলে একজন তরুণ এক্সপেরিমেন্টারকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে বেশি সময় নেননি। মাধবন নায়ার তার নেতার প্রত্যাশা শুধু যে পূরণ করেছিলেন তাই নয়, ছাড়িয়েও গিয়েছিলেন তা। পরে তিনি পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি)-এর প্রকল্প পরিচালক হয়েছিলেন।

এসএলভি ও মিসাইলকে বলা যেতে পারে জ্যেঠতুত ভাই : ধারণায় ও উদ্দেশ্যে আলাদা হলেও এরা এসেছে রকেট বিজ্ঞানের একই রক্ত থেকে। হায়দারাবাদে অবস্থিত ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ল্যাবরেটরি (ডিআরডিএল)-এ ডিআরডিও কর্তৃক একটা বিপুল মিসাইল উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল। এই সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল উন্নয়ন প্রকল্পের গতি বাড়ার সাথে সাথে মিসাইল প্যানেলের বৈঠক আর গ্রুপ ক্যাপ্টেন নারায়ণনের সঙ্গে আমার মিথস্ক্রিয়াও সমান মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালে অধ্যাপক সারাভাই তার একটা রুটিন ভিজিটে থুম্বায় এসেছিলেন। তাকে তখন দেখান হচ্ছিল নোজ-কোন জেটসনিং মেকানিজমের পরিচালন ক্রিয়া। সব সময়ের মতই সেবারও আমাদের কাজের ফলাফল নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। অধ্যাপক সারাভাইকে আমরা অনুরোধ করলাম, একটা টাইমার সার্কিটের ভিতর দিয়ে রীতিমাফিক পাইরো সিস্টেম চালু করতে। অধ্যাপক সারাভাই মৃদু হাসলেন, এবং বোতামে চাপ দিলেন। আমরা আতংকিত হয়ে দেখলাম, কিছুই ঘটেনি। একেবারে নির্বাক হয়ে গেলাম আমরা। আমি তাকালাম প্রমোদ কালে-র দিকে, টাইমার সার্কিটটার নকশা ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন তিনিই। এক মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে আমার এই ব্যর্থতার একটা বিশ্লেষণ করে ফেললাম। আমরা অধ্যাপক সারাভাইকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার অনুরোধ জানালাম, তারপর টাইমার ডিভাইসটা সরিয়ে পাইরোর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ দিয়ে দিলাম। অধ্যাপক সারাভাই আবার চাপ দিলেন বোতামে। পাইরো বিস্ফুরিত হল আর নোজ কোন উৎক্ষিপ্ত হল। অধ্যাপক সারাভাই আমাকে ও কালেকে অভিনন্দন জানালেন ; কিন্তু অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল তার মন রয়েছে অন্য কোথাও। আমরা অনুমান করতে পারলাম না তিনি কি ভাবছেন। তবে অনিশ্চয়তা বেশিক্ষণ থাকল না। অধ্যাপক সারাভাইয়ের সেক্রেটারি টেলিফোনে আমাকে জানালেন, জরুরি আলোচনার জন্য ডিনারের পর অধ্যাপক সারাভাই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

অধ্যাপক সারাভাই অবস্থান করছিলেন কোভালাম প্যালেস হোটেলে , ত্রিবান্দ্রামে এলে সব সময় এই হোটেলেই তিনি থাকতেন। এখন তার কাছ থেকে তলব পেয়ে আমি খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। অধ্যাপক সারাভাই তার রীতিমাফিক ঊষ্ণতা সহযোগে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, বিভিন্ন প্রকার সুযোগসুবিধা যেমন লঞ্চ প্যাড, ব্লক হাউজ, রাডার, টেলিমেট্রি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কথা বললেন—ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় যে সব বস্তু আজ মঞ্জুরি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তারপর তিনি সেই সকালের ঘটনা প্রসঙ্গে কথা তুললেন। ঠিক এ ভয়টাই আমি পেয়েছিলাম। যাহোক অধ্যাপক সারাভাই কিন্তু এটা উপসংহার করলেন না যে, তার লোকদের দক্ষতার অভাব এবং অপর্যাপ্ত জ্ঞানের কারণে পাইরো টাইমার সার্কিটে ব্যর্থতা ঘটেছে, কিংবা ডাইরেকশন স্টেজে তাদের ত্রুটিপূর্ণ বোঝাপড়ার জন্য এটা ঘটেছে। এসব কথার পরিবর্তে তিনি আমাকে বললেন, এই কাজটাতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ ছিল না বলে কি আমরা তেমন একটা কৌতূহলী ছিলাম না? তিনি আমাকে এও ভেবে দেখতে বললেন যে, যে সম্পর্কে সচেতন নই এমন কোনও সমস্যার দ্বারা কি আমার কাজ প্রভাবান্বিত হচ্ছে? তিনি শেষ পর্যন্ত মূল বিষয়ে আঙুল নির্দেশ করলেন। আমাদের সকল রকেট স্টেজ আর রকেট সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশন পরিচালনার একটা একক আচ্ছাদনের অভাব আছে আমাদের। ইলেকট্রিক্যাল আর মেকানিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের কাজ চলছে একটা বিশাল পার্থক্যের মধ্যে— সময় আর স্থান উভয় ক্ষেত্রেই। এ দুটোর পার্থক্য ঘুঁচিয়ে একত্রিত করার কোনও চেষ্টা নেই। অধ্যাপক সারাভাই পরবর্তী ঘন্টা খরচ

www.pathagar.com

করলেন আমাদের কাজ পুনর্নির্ধারণ করে এবং একেবারে ভোরের দিকে একটা রকেট ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

ভুল-ভ্রান্তি ব্যক্তি মানুষের বা সংগঠনের অর্জনগুলোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, বা অর্জন বিলম্ব করতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক সারাভাইয়ের মত দ্রষ্টা সেই ভুল-ভ্রান্তিকেই নতুন আইডিয়া বাস্তবায়নের সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। তিনি টাইমার সার্কিটের ভুল সম্পর্কে বিশেষ করে উদ্বিগ্ন ছিলেন না, এ জন্যে ন্যূনতম দোষারোপও করেননি। এ ব্যাপারে তার মতামত ছিল যে, ভুল-ভ্রান্তি অপরিহার্য, তবে তা সংশোধন করে নেওয়া যায়। আমি পরবর্তী কালে অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলাম যে, ভুল প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা হল সেগুলো আগেই উপলব্ধি করা। কিন্তু এ যাত্রা, ভাগ্যের এক অদ্ভুত ঘূর্ণনে, টাইমার সার্কিটের ভুল থেকে জন্ম নিল একটা রকেট ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি।

মিসাইল প্যানেলের প্রতিটা বৈঠকের পর অধ্যাপক সারাভাইকে ব্রিফ করা আমার একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুরূপ এক বৈঠকে উপস্থিতির পর আমি ত্রিবান্দ্রামে ফিরছিলাম। ঠিক ওই দিনই এসএলভি ডিজাইন পর্যালোচনা করার জন্য অধ্যাপক সারাভাই সফর করছিলেন থুম্বা। এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ থেকে টেলিফোনে আমি তার সাথে কথা বললাম প্যানেল মিটিঙে উত্থাপিত মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন দিল্লী ফ্লাইট থেকে অবতরণের পর আমি যেন ত্রিবান্দ্রাম বিমান বন্দরে অপেক্ষা করি, এবং ওই রাতেই তার বোম্বাই চলে যাওয়ার আগে সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি যখন ত্রিবান্দ্রামে পৌঁছলাম তখন সেখানে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছিল। বিমানের ল্যাডার অপারেটর কুট্টি ভাঙা গলায় আমাকে জানাল, অধ্যাপক সারাভাই আর নেই। কয়েক ঘন্টা আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ; এটা ঘটেছিল আমাদের আলাপের পর ঘন্টাখানেকের মধ্যে। এটা ছিল আমার জন্য প্রচন্ড এক আঘাত আর ভারতীয় বিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিশাল ক্ষতি। সেই রাতটা কেটে গিয়েছিল শেষকৃত্যের জন্য অধ্যাপক সারাভাইয়ের মরদেহ বিমানযোগে আহমেদাবাদে নিয়ে যাওয়ার জোগাড়যন্ত্র করতে।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ২২ জন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপক সারাভাই শুধু একজন মহান বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বড় একজন নেতাও। আমার এখনও মনে পড়ে ১৯৭০ সালের জুনে তিনি এসএলভি-৩ ডিজাইন প্রকল্পের পাক্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন। ১নং ও ৪ নং স্টেজের বিষয়গুলো উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম তিনটি উপস্থাপনা মসৃণভাবে সম্পন্ন হল। আমার পালা সব শেষে। আমি আমার দলের পাঁচ সদস্যকে পরিচয় করিয়ে দিলাম, যারা বিভিন্ন দিক থেকে ডিজাইনে তাদের অবদান রেখেছিলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে দৃঢ়তা ও আস্থার সঙ্গে তারা নিজ নিজ কাজের অংশ

www.pathagar.com

উপস্থাপন করলেন। এই উপস্থাপনাগুলোর ওপর বিস্তারিত আলোচনা হল এবং উপসংহার করা হল যে, সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

হঠাৎ করে একজন সিনিয়র বিজ্ঞানী, যিনি অধ্যাপক সারাভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন, আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনার প্রকল্পের বিষয়গুলো উপস্থাপন করলেন আপনার দলের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ কাজের ভিত্তিতে। কিন্তু প্রকল্পের জন্য আপনি কি করেছেন?' সেই প্রথম আমি অধ্যাপক সারাভাইকে বাস্তবিকই বিরক্ত হতে দেখলাম। তিনি তার সহকর্মীকে বললেন, 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনাটা কি নিয়ে সেটা আপনার জানা উচিৎ। আমরা একটা অসাধারণ উদাহরণ প্রত্যক্ষ করেছি। টিম ওয়ার্কের এটা এক অভূতপূর্ব প্রদর্শনী। আমি প্রকল্প নেতাকে সব সময় লোকজনের ইন্টিগ্রেটর হিসেবে বিবেচনা করি আর কালাম হচ্ছে ঠিক সেটাই।' আমি অধ্যাপক সারাভাইকে ভারতীয় বিজ্ঞানের মহাত্মা গান্ধী বলে মনে করি—তার দলে সঞ্চালন করছেন নেতৃত্বের গুণাবলী আর আইডিয়া ও উদাহরণ দিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করছেন।

অধ্যাপক এমজিকে মেননকে চালিকা শক্তির প্রধান হিসেবে রেখে একটা মধ্যবর্তী ব্যবস্থার পর, সতীশ ধাওয়ানকে আইএসআরও প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। থুম্বায় পুরো কমপ্লেক্স, যার মধ্যে ছিল টিইআরএলএস, স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার (এসএসটিসি), আরপিপি, রকেট ফেব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি (আরএফএফ) এবং প্রপেল্যান্ট ফুয়েল কমপ্লেক্স, ইত্যাদি সবগুলোর একত্রীকরণ ঘটেছিল একটা অখন্ড স্পেস সেন্টার গড়ে তুলতে এবং এর নামকরণ করা হয়েছিল বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি), সেই মানুষটার স্মরণে যার কল্যাণে সম্ভব হয়েছিল এটা। প্রখ্যাত ধাতুবিদ ড. ব্রহ্ম প্রকাশ ভিএসএসসির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উত্তর প্রদেশের বেরেলি এয়ার ফোর্স স্টেশনে ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর আরএটিও সিস্টেম পরীক্ষা করা হয়েছিল সফল ভাবে, এতে একটা সুখোই-১৬ জেট বিমান ১২০০ মিটার রান করার পর শূন্যে ভেসে ওঠে, সাধারণভাবে যেটার শূন্যে উঠতে ২ কিলোমিটার রান করতে হয়। পরীক্ষার সময় আমরা ৬৬তম আরএটিও মোটর ব্যবহার করেছিলাম। এই প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এয়ার মার্শাল শিবদেব সিং এবং ড. বিডি নাগ চৌধুরী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর তৎকালীন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। এই চেষ্টা থেকে প্রায় ৪ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো গিয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সায়েন্টিস্টের স্বপ্নদর্শন শেষ পর্যন্ত ফল দিল।

ভারতে মহাকাশ গবেষণা সংগঠিত করার দায়িত্ব নেওয়ার আগে এবং ইনকসপারের চেয়ারম্যান হওয়ার আগে অধ্যাপক সারাভাই সাফল্যের সঙ্গে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, শিল্প থেকে দূরে অবস্থান নিয়ে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণা টিকে থাকতে পারবে না। অধ্যাপক সারাভাই যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেগুলো হচ্ছে সারাভাই কেমিক্যালস, সারাভাই গ্লাস, সারাভাই গেইগি লিমিটেড, সারাভাই মার্ক লিমিটেড এবং দ্য সারাভাই ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ। তেল বীজ থেকে তেল বের

www.pathagar.com

করার কাজে এবং কসমেটিকস ও সিনথেটিক ডিটারজেন্ট তৈরিতে তার স্বস্তিক অয়েল মিলস অগ্রপথিকের কাজ করেছিল। বড় আকারে পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে তিনি চালু করেছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, সেই সময়ে প্রচুর অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে পেনিসিলিন আমদানি করা হত। এখন আরএটিওর স্বদেশীকরণের ফলে তার মিশনে যোগ হয়েছিল নতুন এক যাত্রা— সামরিক সরঞ্জাম তৈরিতে স্বনির্ভরতা এবং কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা করা। এই সব আমার মনে পড়ে গিয়েছিল আরএটিও সিস্টেমের সফল ট্রায়ালের দিনে। ট্রায়ালের খরচ-খরচাসহ পুরো প্রকল্পে আমাদের ব্যয় হয়েছিল ২৫ লাখ রুপিরও কম। ভারতীয় আরএটিও প্রতিটা উৎপাদন করা যেত ১৭০০০ রুপি খরচ করে, অন্যদিকে আমদানি করা প্রতিটা আরএটিওর জন্য খরচ হত ৩৩০০০ রুপি। বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে এসএলভির কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলল। সমগ্র সাবসিস্টেম ডিজাইন করা হয়েছিল, প্রযুক্তি চিহ্নিত করা হয়েছিল, প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, কর্মকেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছিল, জনশক্তি চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং শিডিউল নির্ধারণ করা হয়েছিল। একমাত্র সমস্যা ছিল এই মেগা প্রজেক্ট কার্যকর ভাবে চালানোর জন্য একটা ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর অভাব এবং কর্মতৎপরতা সমন্বয়ের অভাব।

অধ্যাপক ধাওয়ান ড. ব্রহ্ম প্রকাশের সঙ্গে পরামর্শ করে এই কাজের জন্য আমাকে ঠিক করলেন। আমাকে প্রকল্প ব্যবস্থাপক- এসএলভি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হল, আমাকে সরাসরি রিপোর্ট করতে হত ভিএসএসসির পরিচালকের কাছে। আমার প্রথম কাজ ছিল একটা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। আমি অবাক হয়েছিলাম গোয়ারিকর, মুথুনায়াগাম এবং কুরুপের মত প্রতিভাবানরা থাকতে আমাকে কেন এই কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। ঈশ্বরদাস, আরাভামুডান এবং এসসি গুপ্তের মত সংগঠক থাকতে আমি ভালো করতে পারতাম কিভাবে? ডক্টর ব্রহ্ম প্রকাশের কাছে আমার এই সন্দেহের কথা প্রকাশ করলাম। তিনি আমাকে বললেন অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা না করে তাদের সামর্থ্য সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিতে।

ডক্টর ব্রহ্ম প্রকাশ আমাকে উপদেশ দিলেন অধস্তনদের কর্মকুশলতার যত্ন নিতে এবং অংশগ্রহণরত কর্মকেন্দ্রগুলোর কাছ থেকে অতিমাত্রায় দক্ষতা সন্ধানের ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দিলেন। 'প্রত্যেকেই কাজ করবে এসএলভির তাদের অংশ তৈরি করার জন্য ; আপনার সমস্যাটা হতে যাচ্ছে অন্যদের ওপর আপনার নির্ভরতা। আপনাকে প্রচুর ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখাতে হবে', তিনি বললেন। এতে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমার বাবা যা পড়ে শোনাতেন পবিত্র কুরআন থেকে : 'আমরা আপনার আগে কোনও নবীকে পাঠাইনি যিনি খাবার গ্রহণ করতেন না বা বাজারচত্বরে হেঁটে বেড়াতেন না। আমরা আপনাকে পরীক্ষা করি একটার পর অন্য উপায়ে। আপনি কি ধৈর্যশীল হবেন না?'

এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রায়ই যা ঘটে সেই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। যারা দলকে পরিচালনা করে প্রায়শ তারা দুটো বিষয়ের একটি অনুসরণ

www.pathagar.com

করে : কারো কারো কাছে কাজ হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি প্রেষণা ; অন্যদের কাছে তাদের কর্মীরাই সকল আগ্রহের বিষয়। আবার আরও অনেকে আছে যারা হয় এই দুই বিষয়ের মধ্যে পড়েছে, নয়তো এর বাইরে। যারা কাজ কিংবা কর্মী কারো প্রতিই আগ্রহী ছিল না তাদের এড়িয়ে চলা ছিল আমার কাজ। যে কোনও একটা চরমপন্থা গ্রহণ করা থেকে লোকদের ঠেকাতে আমি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলাম। আর কাজ ও কর্মী যাতে চলতে পারে একত্রে সে অবস্থা চালু করতেও আমার দৃঢ়তা ছিল।

এসএলভি প্রকল্পের প্রাথমিক বিষয় ছিল ডিজাইন, উন্নয়ন ও একটা স্ট্যান্ডার্ড এসএলভি সিস্টেম পরিচালনা, এসএলভি-৩, পৃথিবীর চারদিকে ৪০০ কিলোমিটার সার্কুলার অরবিটে ৪০ কেজি ওজনের একটা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের স্বতন্ত্র অভিযান সম্পন্ন করার সামর্থ্য।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, প্রাথমিক প্রকল্প বিষয়গুলোকে আমি কয়েকটি প্রধান কাজে বিভক্ত করি। ওই ধরনের একটা কাজ ছিল, ভেহিকলের চতুর্থ স্টেজের জন্য একটা রকেট মোটর সিস্টেম তৈরি করা। এ কাজ সম্পূর্ণ করার পথে জটিল সমস্যা ছিল : ৪.৬ টনের একটা প্রপেল্যান্ট আর একটা হাই ম্যাস রেসিও অ্যাপোজি রকেট মোটর সিস্টেম তৈরি করা। আরেকটা কাজ ছিল ভেহিকল কন্ট্রোল এবং গাইডেন্স। তিন ধরনের কন্ট্রোল সিস্টেম সংশ্লিষ্ট ছিল এই কাজে— অ্যারোডাইনামিক সারফেস কন্ট্রোল, থ্রাস্ট ভেক্টর কন্ট্রোল এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্টেজের জন্য রিঅ্যাকশন কন্ট্রোল। আর চতুর্থ স্টেজের জন্য স্পিন-আপ মেকানিজম। অপ্রতিরোধী পরিমাপের মাধ্যমে কন্ট্রোল সিস্টেম ও গাইডেন্সের জন্য অপ্রতিরোধী রেফারেন্সও ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়াও আরেকটা প্রধান কাজ ছিল এসএইচএআরে উৎক্ষেপণ সুবিধাদি বাড়ানো। ৬৪ মাসের মধ্যে একটা 'অল লাইন' উড্ডয়ন পরীক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল ১৯৭৩ সালের মার্চে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত, অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ও প্রকল্প রিপোর্টের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ভিএসএসসির পরিচালক কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও বাজেটে প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্বাহী দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি মধ্যে। ড. ব্রহ্ম প্রকাশ বিশেষ ক্ষেত্রগুলো যেমন রকেট মোটর, ম্যাটারিয়াল ও ফেব্রিকেশন, কন্ট্রোল ও গাইডেন্স, ইলেকট্রনিক্স, এবং মিশন ও লঞ্চিং-এ আমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য চারটি প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছিলেন। আমি প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের গাইডেন্সের ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিলাম, যেমন ডিএস রানে, মুথুনায়াগাম, টিএস প্রহ্লাদ, এআর আচার্য, এসসি গুপ্ত এবং সিএল আম্বা রাও তাদের কয়েকজন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'আমরা আপনার কাছে বাণী প্রেরণ করেছি আপনাকে তাদের বিষয়ে জানানোর জন্য যারা আপনার আগে গত হয়েছে এবং সাবধান ন্যায়পরায়ণ মানুষেরা।' এই সব চরম জ্ঞানী মানুষদের জ্ঞান ভাগ করে নিতে চাইতাম আমি। 'জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ তার জ্যোতিতে পথ দেখান যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। সকল বস্তুর জ্ঞান আছে তার।'

www.pathagar.com

প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা তিনটে গ্রুপ তৈরি করলাম—একটা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ, একটা ইন্টিগ্রেশন ও উড্ডয়ন পরীক্ষা গ্রুপ এবং একটা সাবসিস্টেম্‌স ডেভলপমেন্ট গ্রুপ। প্রথম গ্রুপের দায়িত্ব হল এসএলভি-৩ এর সামগ্রিক নির্বাহী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সেই সঙ্গে প্রশাসন, পরিকল্পনা ও ক্রমোন্নয়ন, সাবসিস্টেম স্পেসিফিকেশন, ম্যাটারিয়াল, ফেব্রিকেশন, কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স এবং কন্ট্রোল। ইন্টিগ্রেশন ও উড্ডয়ন পরীক্ষা গ্রুপের দায়িত্ব হল এসএলভি-৩ এর ফ্লাইট টেস্টিং ও ইন্টিগ্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সরবরাহ। তাদের আরও কাজ হল মেকানিক্যাল ও অ্যারোডাইনামিক ইন্টারফেস সমস্যাসহ ভেহিকল বিশ্লেষণ। সাবসিস্টেম্‌স ডেভলপমেন্ট গ্রুপকে দেওয়া হয়েছিল ভিএসএসসির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া এবং এই সব বিভাগের প্রতিভাবানদের মধ্যে একটা যৌথক্রিয়া সৃষ্টির দ্বারা বিভিন্ন সাবসিস্টেম উন্নয়নে যাবতীয় প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান করা।

আমি এসএলভি-৩ এর জন্য ২৭৫ জন প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী চেয়েছিলাম, কিন্তু পেলাম মাত্র ৫০ জনকে। যৌথ প্রচেষ্টা না চালানো হলে সমস্ত প্রকল্পটা অচল হয়েই পড়ে থাকত। কয়েকজন তরুণ প্রকৌশলী যেমন এমএসআর দেব, জি মাধবন নায়ার, এস শ্রীনিবাসন, ইউএস সিং, সুন্দররাজন, আবদুল মজিদ, বেদ প্রকাশ স্যান্ডলাস, নাম্বুদিরি, শশী কুমার ও শিবাথানু পিল্লাই নিজেদের নিয়ম তৈরি করে নিয়েছিল প্রকল্পের দল হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য। এতে করে তারা স্বতন্ত্র ফলাফল সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তারা এক সাথে তাদের সাফল্য সেলিব্রেট করত—কঠিন কাজের পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতে এ ব্যাপারটা তাদের সাহায্য করত।

এসএলভি-৩ প্রকল্প দলের প্রতিটা সদস্য ছিল নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। অতঃপর এটা স্বাভাবিক যে তারা প্রত্যেকেই নিজের স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিত। ওই ধরনের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কাজ বের করে নিতে দল নেতাকে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় মনোভঙ্গির মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রাখতে হয়েছিল। সক্রিয় মনোভাব সদস্যদের কাজে অত্যন্ত নিয়মিত ভিত্তিতে কার্যকর আগ্রহ দেখায়। নিষ্ক্রিয় মনোভাব দলের সদস্যদের প্রতি আস্থা দেখায় আর তাদের ভূমিকা নিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেয়। নেতা যখন সক্রিয় মনোভাবকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, তখন তাকে দেখা হয় উদ্বিগ্ন ও হস্তক্ষেপকারি হিসেবে। যদি সে নিষ্ক্রিয় মনোভাবের দিকে যায়, তাহলে তাকে দায়িত্বহীনতার দোষারোপ করা হয়। কিংবা বলা হয় অনাগ্রহী। আজ, এসএলভি-৩ দলের সদস্যরা পরিণত হয়ে উঠেছেন দেশের সবচেয়ে মর্যাদাশীল কয়েকটি কর্মসূচির নেতৃত্ব দিতে। এমএস আর দেব অগমেন্টেড স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (এএসএলভি) প্রকল্পের প্রধান, পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি) প্রকল্পের প্রধান মাধবন নায়ার এবং ডিআরডিও সদর দপ্তরে প্রধান নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করছেন স্যান্ডলাস ও শিবাথানু পিল্লাই। পাথরের মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর ধারাবাহিক কঠোর কাজের ভিতর দিয়ে তারা উঠে এসেছেন আজকের অবস্থানে। এ দলটা বাস্তবিকই ছিল একটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভাবানদের দল।

www.pathagar.com

৭

এসএলভি-৩ প্রকল্প পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করে আমি নিজের সময়ের জরুরি ও দ্বন্দ্বময় চাহিদার মুখোমুখি হলাম— কমিটির কাজের জন্য, উপাদান সংগ্রহ, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, পর্যালোচনা, সারাংশ বিবৃতি, আর বিস্তৃত বিষয়ে জ্ঞাত থাকার প্রয়োজনীয়তার জন্য।

যেখানে আমি থাকতাম তার চারপাশে ২ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটাহাঁটির ভিতর দিয়ে আমার দিন শুরু হত। মর্নিং ওয়াকের সময় সাধারণ একটা শিডিউল আমি প্রস্তুত করে নিতাম, আর ওই দিনেই শেষ করতে চাই এমন দুটো বা তিনটে বিষয়ের উপর জোর দিতাম, অন্তত একটা বিষয় যা দীর্ঘ-মেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।

অফিসে পৌঁছানোর পর আমার প্রথম কাজ হয় টেবিল পরিষ্কার করা। পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র বাছাই করে দ্রুত সেগুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলি ঃ অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার গুলো এক দিকে, একটু কম জরুরিগুলো আরেকদিকে, পেন্ডিং রাখার গুলো অন্য দিকে, আর সব আমাকে পড়তে হত। এরপর সবচেয়ে জরুরি কাগজপত্রগুলো আমার সামনে রেখে বাকি আর সবগুলো চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলি।

এখন এসএলভি-৩ প্রকল্পের কথায় ফিরে আসি, এর নকশা করার সময় ২৫০টি স্রাব-অ্যাসেম্বলি আর ৪৪টি বড় সাবসিস্টেম সম্পন্ন করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

জিনিসপত্রের তালিকায় গঠনকর উপাদানের পরিমাণ ১০ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সাত থেকে দশ বছর সময়কালের এই জটিল কর্মসূচির স্থিতিশীলভাবে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনের জন্য একটা প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল অত্যাব্যশক হয়ে পড়েছিল। তার দিক থেকে অধ্যাপক ধাওয়ান একটা পরিষ্কার অবস্থান নিয়েছিলেন যে, ভিএসএসসি ও এসএইচএআর-এর সকল জনশক্তি ও তহবিল পরিচালিত হতে হবে আমাদের প্রতি। আর আমাদের দিক থেকে আমরা ব্যবস্থাপনার একটা মৌল ধরনের বিবর্ধন ঘটিয়েছিলাম যাতে করে তিন শয়েরও বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রডাক্টিভ ইন্টারফেসিং অর্জন করা যায়। লক্ষ্য ছিল যে, তাদের সঙ্গে আমাদের মিথস্ক্রিয়া অবশ্যই পৌঁছাতে হবে তাদের প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়নে। তিনটে বিষয় আমি তুলে ধরেছিলাম আমার সহকর্মীদের কাছে—ডিজাইন ক্যাপাবিলিটির গুরুত্ব, লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং বাধাবিপত্তি প্রতিরোধ করার শক্তি। এখন, এসএলভি-৩ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার চিত্রটি তুলে ধরার আগে আমি এসএলভি-৩ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

একটা লঞ্চ ভেহিকল সম্পর্কে নরত্বারোপমূলকভাবে কিছু বর্ণনা করা বাস্তবিক চিত্তাকর্ষক। প্রধান যান্ত্রিক কাঠামোটাকে মানবদেহ হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে, সহযোগী ইলেকট্রনিকসহ কন্ট্রোল ও গাইডেন্স সিস্টেম ধরা যেতে পারে মস্তিষ্ক। পেশীতন্ত্র গঠিত হয় প্রপেল্যান্ট থেকে। কিভাবে এগুলো তৈরি করা হয়? উপাদান আর কলাকৌশল কিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

একটা লঞ্চ ভেহিকল তৈরি করতে বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের উপাদান প্রয়োজন হয়—ধাতব ও অ-ধাতব উভয় প্রকার, এর সাথে যোগ হয় কম্পোজিট ও সিরামিক। ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, টিটানিয়াম, কপার, বেরিলিয়াম, টাংস্টেন, ও মলিবডেনামের সঙ্কর ব্যবহৃত হয়। কমবাইনকৃত উপাদান হতে পারে ধাতব, জৈব অথবা অজৈব। আমরা বিপুল পরিমাণে গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক-এর যৌগ ব্যবহার করে থাকি এবং Kevlar-এ প্রবেশের চত্বর উন্মুক্ত করে দিই, এ জিনিসটা হচ্ছে পলিমাইড ও কার্বন-কার্বন যৌগ। সিরামিক হচ্ছে বিশেষ ধরনের আগুনে পোড়া মাটি যা ব্যবহার করা হয় মাইক্রোওয়েভ ট্রান্সপারেন্ট এনক্লোজারে। আমরা সিরামিক ব্যবহারের কথা বিবেচনা করেছিলাম, কিন্তু সে সময় প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে ও চিন্তা বাদ দিতে হয়েছিল।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভিতর দিয়ে এসব উপাদান রূপান্তরিত হয় হার্ডওয়ারে। বস্তুত পক্ষে সকল প্রকৌশল বিদ্যার মধ্যে, যেগুলো সরাসরি রকেট বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে সবচেয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। একটা জটিল পদ্ধতির লিকুইড ইঞ্জিন হোক বা সামান্য একটা কবজা হোক, এর যে কোনওটি তৈরির জন্য দরকার হবে একজন সুদক্ষ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং নিখুঁত সব যন্ত্রপাতি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি যেমন অল্প মাত্রার সঙ্করযুক্ত মরিচারোধক ইস্পাতের জন্য ওয়েল্ডিং টেকনিক, ইলেকট্রফর্মিং টেকনিক, এবং অতি নিখুঁত প্রসেস টুলিং নিজেরাই তৈরি করব। আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি যেমন ২৫৪ লিটার ভার্টিক্যাল মিক্সার এবং খাঁজ কাটা যন্ত্র তৈরি করব যা দরকার হবে আমার তৃতীয় ও চতুর্থ স্টেজে। আমাদের অনেক সাবসিস্টেম ছিল অত্যন্ত বিশাল ও জটিল। তাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের ব্যাপার ছিল। কোনও দ্বিধা না করে প্রাইভেট সেক্টরের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমরা জোগাড়যন্ত্র করে নিয়েছিলাম এবং তাতে করে তৈরি হয়েছিল এমন একটা কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান পরে যা সরকার পরিচালিত অসংখ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবসা সংগঠনের পক্ষে নীলনকশা হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

এসএলভির জীবন্ত হয়ে ওঠার কথা বলতে গেলে এর সেই অংশগুলোর কথা বলতে হবে যার সাহায্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এতে ছিল জটিল বৈদ্যুতিক সার্কট্রি, এর ফলে যান্ত্রিক কাঠামো সচল হয়ে ওঠে। এই বিপুল তৎপরতা, সাদামাটা বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ থেকে শুরু করে গাইডেন্স ও কন্ট্রোল সিস্টেমের পাশাপাশি জটিল ইন্সট্রুমেন্টেশন পর্যন্ত সবকিছু, অ্যারোস্পেস গবেষণায় সম্মিলিত ভাবে 'Avionics' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এভিওনিক সিস্টেমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ভিএসএসসিতে আগেই প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক, মাইক্রোওয়েভ রাডার ও ট্রান্সপোন্ডার এবং ইনার্শিয়াল উপাদান ও পদ্ধতিতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উড্ডয়নরত অবস্থায় এসএলভির কি অবস্থা দাঁড়ায় তা জানা। এসএলভির কারণে নতুন এক কর্মকুশলতা সৃষ্টি হয়েছিল ফিজিক্যাল প্যারামিটারের পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সডিউসার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন চাপ, ধাক্কা, কম্পন, ত্বরণ ইত্যাদি। ভেহিকলের ফিজিক্যাল প্যারামিটারকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিবর্তিত করে ট্রান্সডিউসার। একটা অন-বোর্ড টেলিমেট্রি সিস্টেম এসব সংকেত প্রক্রিয়া করে এবং রেডিও সংকেতের আকারে তা প্রেরণ করে ভূ-কেন্দ্রে। এই পদ্ধতি যদি ডিজাইন অনুযায়ী ঠিক মত কাজ করে তাহলে উদ্বিগ্ন হওয়ার বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু কিছু যদি ভুল হয়ে যায়, তাহলে অপ্রত্যাশিত কোনও চলন থেকে থামাতে ভেহিকলকে অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রকেট ধ্বংস করে ফেলার জন্য একটা স্পেশাল কমান্ড সিস্টেম তৈরি করতে হয়েছিল, আর এসএলভির দূরত্ব ও অবস্থান ঠিক রাখতে তৈরি করতে হয়েছিল একটা ইন্টারফোরোমিটার সিস্টেম, রাডার সিস্টেমের একটা যুক্ত উপায় হিসেবে। এসএলভি প্রকল্পের জন্য দেশীয় পর্যায়ে সেকুয়েন্সার উৎপাদন করা হয়েছিল, এর সাহায্যে সময় বেধে দেওয়া হত বিভিন্ন ঘটনাক্রমের যেমন ইগনিশন, স্টেজ সেপারেশন, ভেহিকল অ্যাটিটিউড প্রগ্রামার যা রকেট পরিচালনার তথ্য জমা করে রাখে এবং পূর্ব-নির্ধারিত পথে রকেটকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অটো-পাইলট ইলেকট্রনিকস।

www.pathagar.com

পুরো সিস্টেমকে চালানোর শক্তি ছাড়া লঞ্চ ডেহিকল ভূ-পৃষ্ঠেই থেকে যায়। সাধারণভাবে একটা প্রপেল্যান্ট হচ্ছে একটা দহনযোগ্য বস্তু যা থেকে তাপ উৎপন্ন হয় এবং রকেট ইঞ্জিনে সরবরাহ করে অতিক্ষুদ্র নিক্ষেপণ কণিকা। একই সাথে এটা হল শক্তির উৎস আর বর্ধনশীল শক্তির ক্রিয়াশীল বস্তু। যেহেতু রকেট ইঞ্জিনে পার্থক্য অনেক বেশি নিষ্পত্তিমূলক, তাই প্রপেল্যান্ট পরিভাষাটি প্রাথমিক ভাবে ব্যবহৃত হয় কেমিক্যালের বর্ণনা দিতে, রকেট যে কেমিক্যাল বহন করে সামনে চালনামূলক কাজে।

প্রপেল্যান্টকে সলিড বা লিকুইড হিসেবে শ্রেণীভাগ করাটাই রীতি। আমরা সলিড প্রপেল্যান্টের উপর মনোযোগ ঘনীভূত করেছিলাম। একটা সলিড প্রপেল্যান্ট গঠন করতে তিনটি উপাদান অত্যাবশ্যক ঃ অক্সিডাইজার, জ্বালানি এবং অ্যাডিটিভ। সলিড প্রপেল্যান্ট পরে আরও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় ঃ কম্পোজিট এবং ডাব্‌ল বেজ। আগেরটা গঠিতহয় অজৈব বস্তু (যেমন অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট) অথবা অক্সিডাইজারের জৈব জ্বালানির (যেমন সিনথেটিক রাবার) একটা পন্থায়। ডাবল বেজ প্রপেল্যান্ট সেইসব দিনে ছিল দূরের স্বপ্ন, কিন্তু তবুও এ নিয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস করেছিলাম আমরা।

এই পর্যাপ্ততা আর দেশীয় উৎপাদন ঘটেছিল ক্রমাগত ভাবে, আর সব সময় যে যন্ত্রণা ছাড়া তা নয়। আমরা ছিলাম একদল প্রায়-প্রশিক্ষিত প্রকৌশলী। আমাদের টিউটর বিহীন অধ্যবসায়, প্রতিভা, চরিত্র, আর আত্মনিবেদন এসএলভি তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল। সমস্যা দেখা দিত নিয়মিতই আর প্রায় একটার পর একটা। আমার দলের সদস্যরা কখনও আমার ধৈর্য নিঃশেষিত হতে দেননি। আমার মনে পড়ে একবার নাইট শিফটের কাজ শেষ করার পর লিখেছিলাম :

Beautiful hands are those that do
Work that is earnest and brave and true
Moment by moment
The long day through.

আমাদের এসএলভির কাজের প্রায় সমান্তরালে, ডিআরডিও নিজেকে প্রস্তুত করছিল একটা দেশীয় সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল নির্মাণের জন্য। আরএটিও প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়েছিল, কারণ যে বিমানটার জন্য এর ডিজাইন করা হয়েছিল তা সেকেলে হয়ে পড়েছিল। নতুন এয়ারক্র্যাফটের জন্য আরএটিও দরকার ছিল

www.pathagar.com

না। প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, নারায়ণনের ওপর ডিআরডিও যুক্তিসঙ্গত ভাবে মিসাইল নির্মাতা দলের নেতৃত্বভার অর্পণ করতে চাইল। আইএসআরওতে আমরা যেমন করতাম তেমন না করে তারা প্রযুক্তি উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির চেয়ে বরং ওয়ান-টু-ওয়ান প্রতিস্থাপনার দর্শন পছন্দ করেছিল। একটা পরীক্ষিত মিসাইলের সমস্ত ডিজাইন প্যারামিটারের যাবতীয় জ্ঞান আহরণের জন্য এবং সংস্থার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় অবকাঠাম স্থাপনের জন্য পছন্দ করা হয়েছিল রাশিয়া-উদ্ভাবিত সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল এসএ-২। ভাবা হয়েছিল যে একবার ওয়ান-টু-ওয়ান স্বদেশীকরণ প্রতিষ্ঠিত হলে, গাইডেড মিসাইলের আধুনিকতম ক্ষেত্রটির পরবর্তী অগ্রগতিতে ঘটবে প্রাকৃতিক ফল-আউট। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল, এর সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় *ডেভিল* এবং প্রথম তিন বছরের জন্য প্রায় ৫ কোটি রূপির তহবিল ধার্য করা হয়।

নারায়ণন ততদিনে পদোন্নতি পেয়ে এয়ার কমোডর হয়েছেন। তাকে ডিআরডি এলের পরিচালক নিযুক্ত করা হল। এই বিশাল কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য হায়দারাবাদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের শহরতলীতে অবস্থিত আনকোরা এই গবেষণাগারটি সচল করলেন তিনি। সমাধি আর প্রাচীন দালানকোঠার ছাপযুক্ত ভূদৃশ্যে শুরু হল নতুন জীবনের প্রতিধ্বনি। নারায়ণন ছিলেন বিপুল শক্তি সম্পন্ন এক মানুষ— সর্বদা উদ্দীপিত। তিনি নিজের চারপাশে জড়ো করলেন উদ্যমী মানুষদের শক্তিশালী একটা দলকে, এই বেসামরিক গবেষণাগারে তুলে আনলেন অনেক সার্ভিস অফিসারকে। এসএলভির কাজে পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে পড়ায় মিসাইল প্যানেলের বৈঠকগুলোয় আমার অংশগ্রহণ ক্রমে হ্রাস পেয়েছিল, পরে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, নারায়ণন ও তার *ডেভিল*-এর গল্প আসতে শুরু করেছিল ত্রিবান্দ্রামে। একটা নজিরবিহীন স্কেলের রূপান্তর ঘটছিল সেখানে।

আরএটিও প্রকল্পে নারায়ণনের সঙ্গে আমার কাজের সময় আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, তিনি একজন কঠিন কর্মবীর—এমন একজন যিনি নিয়ন্ত্রণ, প্রভুত্ব আর কর্তৃত্ব পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছিলেন। আমি সবিস্ময়ে ভাবতাম, তার মত ব্যবস্থাপকরা যারা মূল্যকে পাত্তা না দিয়ে ফলাফল পাওয়ার দিকেই লক্ষ্য স্থির করে, তারা দীর্ঘ যাত্রায় অসহযোগিতা আর নীরব বিদ্রোহের মুখোমুখি হয় কি না।

১৯৭৫ সালের নববর্ষের দিনে নারায়ণনের নেতৃত্বে কাজ করার সুযোগ এলো। অধ্যাপক এমজিকে মেনন, সেই সময় তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন আর ডিআরডিওর প্রধান ছিলেন, ড. ব্রহ্ম প্রকাশের সভাপতিত্বে একটা রিভিউ কমিটি গঠন করলেন *ডেভিল* প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ন করার জন্য। আমাকে ওই দলে রাখা হয়েছিল রকেট স্পেশালিস্ট হিসেবে অ্যারোডাইনামিক্সের ক্ষেত্রগুলোয়, গঠনে ও মিসাইলের প্রপালসনে

www.pathagar.com

সাধিত অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য। আমাকে সহযোগিতা করার জন্য ছিলেন বিআর সোমাশেখর এবং উইং কমান্ডার পি কামারাজু। কমিটির সদস্যদের মধ্যে আরও ছিলেন ড. আরপি শেনয় এবং অধ্যাপক আইজি শর্মা, ইলেকট্রনিক সিস্টেমে যে কাজ করা হয়েছিল তার পর্যালোচনার দায়িত্ব ছিল তাদের।

১৯৭৫ সালের ১ ও ২ জানুয়ারিতে আমরা মিলিত হলাম ডিআরডিএলে। প্রায় ছয় সপ্তাহ পর দ্বিতীয় সেশনটি অনুষ্ঠিত হল। আমরা পরিদর্শন করলাম বিভিন্ন ডেভলপমেন্ট ওয়ার্ক সেন্টার আর সেখানকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমি ভীষণ ভাবে আলোড়িত হলাম এভি রঙ্গ রাওয়ের ভবিষ্যৎ -দর্শনে, উইং কমান্ডার আর গোপালস্বামীর গতিশীলতায়, ড. আই অচ্যুত রাওয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খতায়, জি গণেশনের কর্মপ্রচেষ্টায়, এস কৃষ্ণনের চিন্তার স্বচ্ছতায় আর বালকৃষ্ণনের সমগ্রতার প্রতি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে। ভীষণ জটিলতার মুখেও জেসি ভট্টাচারিয়া ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্বামীনাথনের শান্ত থাকার বিষয়টি ছিল চমকপ্রদ। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ভিজে সুন্দরমের গভীর উদ্দীপনা ও আবেদন ছিল দৃষ্টি-আকর্ষক। তারা ছিলেন এক দল অতিশয় বুদ্ধিমান ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষ—সার্ভিস অফিসার ও বেসামরিক বিজ্ঞানীদের একটা মিশ্রণ—তারা নিজেদের প্রশিক্ষিত করেছিলেন একটা ভারতীয় মিসাইল উৎক্ষেপণের নিজস্ব আগ্রহ থেকে।

১৯৭৫-এর মার্চে ত্রিবান্দ্রামে আমাদের উপসংহারমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। আমরা অনুভব করলাম যে প্রকল্প সম্পাদনের অগ্রগতি হার্ডঅয়ার ফেব্রিকেশনের বিচারে যথেষ্ট, মিসাইল সাবসিস্টেমের ওয়ান-টু-ওয়ান প্রতিস্থাপনার দর্শন রূপায়িত করতে, কেবল লিকুইড রকেট ক্ষেত্র বাদ দিয়ে, ওখানে সাফল্য অর্জনের জন্য আরও কিছু সময় প্রয়োজন ছিল। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মতামত দিল যে, হার্ডঅয়ার ফেব্রিকেশন ও গ্রাউন্ড ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স ডিজাইন ও নির্মাণে সিস্টেম অ্যানালিসিসের দুটো লক্ষ্যই ডিআরডিএল পূরণ করেছে।

আমরা লক্ষ্য করলাম যে, ওয়ান-টু-ওয়ান প্রতিস্থাপনা দর্শন ডিজাইন ডাটা সঞ্চালনের ওপর অধিকতর মর্যাদা দখল করে আছে। অনেক ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজনীয় অ্যানালিসিসের উপর পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে পারেনি, যে অনুশীলনটা আমরা অনুসরণ করতাম ভিএসএসসিতে। তখনও পর্যন্ত চালানো সিস্টেম অ্যানালিসিস অনুশীলন ছিল কেবলমাত্র প্রাথমিক প্রকৃতির। মোট কথা, ফলাফল দাঁড়িয়েছিল অভূতপূর্ব, কিন্তু আমাদের তখনও আরও অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে। আমার মনে পড়েছিল স্কুলের একটা কবিতা ঃ

Don't worry and fret, fainthearted,
The chances have just begun,
For the best jobs haven't been started,
The best work hasn't been done.

www.pathagar.com

*ডেভিল*কে আরও এগিয়ে নেবার জন্য সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করল কমিটি। আমাদের সেই সুপারিশ গ্রহণ করা হল আর প্রকল্প এগিয়ে চলল।

এদিকে ভিএসএসসিতে আকার নিচ্ছিল এসএলভি। ডিআরডিএলের বিপরীতে আমরা এগোচ্ছিলাম খুবই ধীর গতিতে। নেতাকে অনুসরণ করার বদলে আমার দল কয়েকটি ব্যক্তিগত পথে এগিয়ে যাচ্ছিল সাফল্যের দিকে। আমাদের কর্ম-পদ্ধতির প্লান ছিল যোগাযোগ, বিশেষ নির্দিষ্ট ভাবে পার্শ্বিক লক্ষ্যে, দলগুলোর মধ্যে আর দলের মধ্যে। এক দিক থেকে, এই দানবীয় প্রকল্প ম্যানেজ করার জন্য আমার মন্ত্র ছিল যোগাযোগ। আমার দলের সদস্যদের কাছ থেকে সর্বোত্তম কাজ বের করে নিতে আমি প্রায়ই তাদের সাথে কথা বলতাম সংস্থার বিষয় ও লক্ষ্য সম্পর্কে, এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিটি সদস্যের নির্দিষ্ট অবদানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরতাম। একই সঙ্গে আমার অধীনস্থদের গঠনমূলক আইডিয়াগুলোও গ্রহণের চেষ্টা করতাম আমি। সেই সময়ে আমার ডাইরির কোনও খানে লিখেছিলাম ঃ

If you want to leave your footprints
On the sands of time
Do not drag your feet.

অধিকাংশ সময় যোগাযোগ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত আলাপচারিতায়। আসলে দুটো বিষয়ই আলাদা। আমি ছিলাম (এখনও আছি) ভীষণ আলাপচারী মানুষ, কিন্তু নিজেকে মনে করি একজন ভাল যোগযোগকারী। হাস্যকৌতুকে ভরা আলাপচারিতা বেশির ভাগ সময় এড়িয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অন্যদিকে যোগাযোগের অর্থ হল কেবলমাত্র তথ্য বিনিময়। এটা বোঝা খুব জরুরি যে, যোগযোগ হচ্ছে দুই পক্ষের ঘটনা যার লক্ষ্য নির্দিষ্ট তথ্য আদান-প্রদান।

এসএলভিতে কাজ করার সময়, আমি যোগাযোগের বিষয়টিকে ব্যবহার করতাম সমঝোতা চালু করার জন্য এবং সমস্যা নিরসনে সহকর্মীদের সঙ্গে ঐকমত্যে আসার জন্য। স্পেস সায়েন্স কাউন্সিল (এসএসসি)-এর একটা রিভিউ মিটিঙে, প্রকিউরমেন্টের বিলম্বে হতাশ হয়ে, আমি একেবারে অভিযোগের তোড়ে ফেটে পড়লাম উদাসীনতা ও ভিএসএসসির কন্ট্রোলার অব অ্যাকাউন্ট ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে। আমি বললাম যে অ্যাকাউন্টের কর্মীদের কাজের ধারা বদলাতে হবে, এবং প্রকল্প দলে তাদের প্রতিনিধি দাবি করলাম। ড. ব্রহ্ম প্রকাশ আমার আচরণে একেবারে হতচকিত হয়ে পড়লেন। তিনি সিগারেট রেখে মিটিং থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সারা রাত অনুতাপে আমি কাতর হলাম, আমার কর্কশ কথায় যন্ত্রণা পেয়েছেন ড. ব্রহ্ম প্রকাশ। যাহোক আমি পরাস্ত হবার আগেই পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে ঢুকে পড়া কুঁড়েমির বিরুদ্ধে লড়াই করতে স্থিরচিত্ত ছিলাম। একটা বাস্তব প্রশ্ন করলাম আমি নিজেকে : কেউ কি এইসব নির্বোধ আমলাদের সঙ্গে বসবাস করতে

www.pathagar.com

পারে? উত্তর হচ্ছে একটা বড় না। তারপর নিজেকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলাম : ড. ব্রহ্ম প্রকাশকে বেশি আঘাত করবে কি আমার এখনকার কর্কশ কথাগুলো, না কি পরবর্তী পর্যায়ে এসএলভির কবর? আমার হৃদয় ও মন সম্মত বুঝতে পেরে আমি সাহায্যের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করলাম। আমার জন্য সৌভাগ্য, ড. ব্রহ্ম প্রকাশ পরবর্তী সকালে প্রকল্পের অর্থনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করলেন।

যে ব্যক্তি একটা দলের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব নিয়েছে সে নিজের কাজে সফল হতে পারে আপন অধিকারে যদি সে হয় যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীন, ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জোরদার করতে একজন মানুষ কি করতে পারে? এ ক্ষেত্রে আমি যে দুটো কৌশল ব্যবহার করি তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আমার অসুবিধে নেই। প্রথম কৌশল হচ্ছে, আপনার শিক্ষা ও দক্ষতা তৈরি করা। জ্ঞান হচ্ছে এক অধিগম্য সম্পদ, যা প্রায় সব সময়ই আমার কাজের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যত বেশি হাল-নাগাদ জ্ঞান আপনি সঞ্চয় করতে পারবেন তত বেশি আপনি স্বাধীন হবেন। জ্ঞান কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না। একজন নেতা তার দলকে পরিচালনার জন্য কেবল তখনই স্বাধীন হতে পারে যখন সে তার চারপাশে ঘটা সব কিছুর প্রতি নজর রাখে__ সঠিক সময়ে। নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে, এক দিক থেকে, অবিরাম শিক্ষার মধ্যে জড়িত থাকা। অনেক দেশে পেশাদার লোকদের জন্য প্রতি সপ্তাহে কয়েক রাত কলেজে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। সফল দলনেতা হতে হলে, কর্মদিবসের কানে তালা লাগান হৈ হট্টগোলের পর নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে নতুন একটা দিনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

দ্বিতীয় কৌশল হচ্ছে, ব্যক্তিগত দায়িত্বের আকাঙ্খা জাগানো নিজের মধ্যে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সার্বভৌম উপায় হচ্ছে সেই শক্তিগুলোকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তোলা যেগুলো আপনাকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে। সক্রিয় হোন! দায়িত্বশীল হোন! আপনার বিশ্বাসের জন্য কাজ করুন। যদি না করেন, তাহলে তার অর্থ হবে আপনার ভাগ্যকে আপনি অন্যদের কাছে সমর্পণ করছেন। প্রাচীন গ্রীস সম্পর্কে ঐতিহাসিক এডিথ হ্যামিলটন লিখেছেন ঃ 'তাদের সবচেয়ে আকাঙ্খিত স্বাধীনতা যখন দায়িত্বশীলতা থেকে মুক্তি অর্জন, তখন এথেন্স স্বাধীন হবার জন্য অবরুদ্ধ এবং কদাপি স্বাধীন হবে না আর।' সত্যটা হল এই যে অনেক কাজ আছে যা আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই করতে পারি আমাদের স্বাধীনতার পরিধি বাড়ানোর জন্য। আমাদের পীড়ন করার হুমকি দেয় যে শক্তিগুলো, তার বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারি। যোগ্যতা আর অবস্থা যা ব্যক্তি স্বাধীনতা চালনা করে তার সাহায্যে নিজেদের আমরা শক্তিশালী করতে পারি। সে রকম করলে তার অর্থ দাঁড়ায়, আমরা একটা অধিক দৃঢ় সংগঠন সৃষ্টিতে সাহায্য করছি, যা অপরিমেয় লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ।

www.pathagar.com

এসএলভি উন্নয়নের সময় অধ্যাপক ধাওয়ান প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দলের মধ্যে অগ্রগতি পর্যালোচনার পদ্ধতি চালু করেছিলেন। অধ্যাপক ধাওয়ান ছিলেন মিশন প্রাপ্ত একজন মানুষ। কাজ যাতে কোনও বাধা-বিঘ্নের মধ্যে না পড়ে মসৃণভাবে এগিয়ে চলে তার জন্য কোথাও তিনি ফাঁক রাখেননি। ভিএসএসসিতে অধ্যাপক ধাওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রিভিউ মিটিংগুলো বড় ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হত। তিনি ছিলেন আইএসআরও জাহাজের এক সত্যিকারের কাপ্তান__ একজন কমান্ডার, নাবিক, হাউজকিপার, একের মধ্যে সবকিছু। তথাপি, যা করতেন তার চেয়ে বেশি জানার ভান করতেন না তিনি। তার বদলে যখন কোনও কিছু সন্দেহজনক মনে হত তখন তিনি তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতেন। আমি তাকে স্মরণ করি এমন এক নেতা হিসেবে যার কাছে নেতৃত্ব ছিল একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা। কোনও ইস্যুতে একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে তিনি সহজে আর মত বদলাতেন না। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অনেক চিন্তাভাবনা করতেন।

অধ্যাপক ধাওয়ানের সঙ্গে প্রচুর সময় কাটানোর সুবিধা পেয়েছিলাম আমি। তিনি শ্রোতাকে বিমোহিত করে রাখতে পারতেন তার যুক্তিপূর্ণ ধীশক্তির কারণে, যার সাহায্যে তিনি যে কোনও বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারতেন। শিক্ষার দিক থেকে তার প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রির বহরটি ছিল একেবারে অগতানুগতিক__গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে বি. এসসি., ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ., মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি. ই., অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম. এস. এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক) থেকে অ্যারোনটিক্স ও গণিতে পিএইচ. ডি.।

তার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক ছিল অতিশয় উদ্দীপক আর তা আমাকে ও আমার দলের সদস্যদেরকে মানসিকভাবে বলিয়ান করে তুলত। তার মধ্যে আমি পূর্ণ আশাবাদ খুঁজে পেয়েছিলাম। যদিও নিজেকে সব সময় তিনি বিচার করতেন নির্দয়ভাবে, কখনও ক্ষমা করতেন না, কিন্তু অন্যদের কিছু ভুল হলে তাদের উপর কঠোর হতেন না। অধ্যাপক ধাওয়ান স্পষ্ট করে তার বিচার ঘোষণা করতেন, তারপর অপরাধী পক্ষকে ক্ষমা করে দিতেন।

১৯৭৫ সালে, আইএসআরও পরিণত হল সরকারি সংস্থায়। একটা আইএসআরও কাউন্সিল গঠিত হল বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের পরিচালক ও ডিপার্টমেন্ট অব স্পেস (ডিওএস)-এর সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে।

এই পরিবর্তনের ফলে টিএন সেশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটল, তিনি ছিলেন ডিওএসের যুগ্মসচিব। তখনও পর্যন্ত আমলাদের ব্যাপারে আমার ছিল এক রকম রক্ষণবাদিতার মনোভাব। সুতরাং টিএন সেশনকে প্রথম যখন এসএলভি-৩ এর ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের মিটিঙে অংশ নিতে দেখলাম তখন আমি খুব একটা

www.pathagar.com

স্বস্তি বোধ করিনি। কিন্তু শীগগিরই তার ব্যাপারে আমার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও প্রচন্ড বিশ্লেষণী সামর্থ্য দিয়ে তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন বিজ্ঞানীদের মনে।

এসএলভি প্রকল্পের প্রথম তিনটে বছর ছিল বিজ্ঞানের অসংখ্য অজানা রহস্যের উন্মোচনের কাল। যেহেতু মানুষ, সুতরাং অজ্ঞতা সব সময়ই লেগে আছে আমাদের সঙ্গে, এবং থাকবেও সর্বদা। এ ব্যাপারে আমার সচেতনতায় নতুন যা যোগ হয়েছিল তাহল, এর অতল মাত্রায় আমার জেগে ওঠা। আমার ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, বিজ্ঞানের কাজ হল সব কিছু ব্যাখ্যা করা, আর অব্যাখ্যাত প্রপঞ্চ ছিল আমার বাবা ও লক্ষ্মণা শাস্ত্রীর মত মানুষদের এলাকা। এ বিষয় নিয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা থেকে আমি সব সময় বিরত থাকতাম, আমার ভয় ছিল যে এতে করে তাদের সংগঠিত দৃষ্টিভঙ্গির নেতৃত্ব হুমকিতে পড়তে পারে।

ক্রমশ আমি সচেতন হয়ে উঠলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সম্পর্কে। বিজ্ঞান হচ্ছে ওপেন-এন্ডেড আর আবিষ্কারমূলক। উন্নয়ন হচ্ছে একটা আঁটো ফাঁস। উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে অনুজ্ঞামূলক আর নিত্যকার ব্যাপার। কিন্তু প্রতিটা ভুল থেকে ক্রমোন্নতি সাধন করা যায়। স্রষ্টা সম্ভবত প্রকৌশলীদের সৃষ্টি করেছেন বিজ্ঞানীরা যাতে আরও বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারে সেই কারণে। প্রতিবারই বিজ্ঞানীরা সব ক্ষেত্রে আগাগোড়া গবেষণা সম্পন্ন করে পূর্ণ সমাধান বের করে, প্রকৌশলীরা তাদের দেখায় আরও জ্যোতিষ্ক, আরও সম্ভাবনা। আমি আমার দলকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যেন তারা বিজ্ঞানীতে পরিণত না হয়। বিজ্ঞান হচ্ছে এক প্যাসন— প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনার জগতে এক অনন্ত যাত্রা। আমাদের সময় ও তহবিল সীমিত। আমাদের এসএলভি নির্মাণ নির্ভর করছে আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতার ওপর। আমার পছন্দ কর্মযোগ্য বিদ্যমান সমাধান যা হতে পারে সর্বোত্তম সুযোগ। নির্দিষ্ট সময়-নির্ধারিত প্রকল্পে নতুন কোনও কিছু করতে গেলে তাতে সমস্যা সৃষ্টি হবেই। আমার মতে, একজন প্রকল্প নেতাকে যতদূর সম্ভব বেশিরভাগ পদ্ধতিতে প্রমাণিত প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে এবং নিরীক্ষা চালাতে হবে কেবলমাত্র বহুবিধ উৎস থেকে।

www.pathagar.com

৮

এসএলভি-৩ প্রকল্প এমনভাবে গঠন করা হয়েছিল যে প্রধান টেকনোলজি সেন্টারগুলো, ভিএসএসসি এবং এসএইচএআর, উভয় স্থানেই পরিচালনা করতে পারে প্রপেল্যান্ট প্রডাকশন, রকেট মোটর টেস্টিং ও যে কোনও বড় ডায়ামিটার সম্পন্ন রকেট উৎক্ষেপণ। এসএলভি-৩ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমরা নিজেদের জন্য তিনটে মাইলস্টোন নির্ধারণ করেছিলাম : ১৯৭৫ সালের মধ্যে সাউন্ডিং রকেটের মাধ্যমে সকল সাবসিস্টেমের ডেভলপমেন্ট ও ফ্লাইট কোয়ালিফিকেশন ; ১৯৭৬ সালের মধ্যে সাব-অর্বিটাল ফ্লাইট ; এবং ১৯৭৮ সালের মধ্যে চূড়ান্ত অর্বিটাল ফ্লাইট। ইতিমধ্যে কাজের গতি ও ছন্দ বেড়ে গিয়েছিল আর উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল পরিবেশ। যেখানেই আমি গেছি সেখানেই আমাদের দল চিত্তাকর্ষক কিছু না কিছু আমাকে দেখিয়েছে। দেশে প্রথম বারের মত বিপুল পরিমাণ কাজ করা হচ্ছে এবং গ্রাউন্ড-লেভেল টেকনিশিয়ানদের হাতে এ ধরনের কাজের নমুনা আগে কখনও ছিল না। আমি লক্ষ্য করলাম, কর্মকুশলতার নতুন মাত্রা সৃষ্টি হচ্ছে আমার দলের সদস্যদের মধ্যে।

কর্মকুশলতার মাত্রা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নিয়ে যায় সৃষ্টির দিকে। ব্যক্তির জ্ঞান আর দক্ষতার মত উপযুক্ততাও ছাড়িয়ে যায় তা। কোনও ব্যক্তি যা অবশ্যই জানবে আর নিজের কাজ সুচারুভাবে করতে সমর্থ হবে তার চেয়েও কর্মকুশলতার মাত্রা ব্যাপক ও গভীর। এতে থাকে মনোভাব, মূল্যবোধ ও চারিত্র্য

www.pathagar.com

প্রলক্ষণ। এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে মানব ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে। আচরণগত স্তরে আমরা দক্ষতা পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান পরিমাপ করতে পারি। মধ্যবর্তী স্তরে দেখা যায় সামাজিক ভূমিকা এবং ভাবমূর্তির মাত্রা। উদ্দেশ্য ও প্রলক্ষণ নিহিত থাকে একেবারে ভিতরের স্তরে। আমরা যদি ওইসব কর্মকুশলতার মাত্রা শনাক্ত করতে পারি, তাহলে সেগুলো একটা নীল-নকশার মত একত্র সন্নিবিষ্ট করে আমাদের চিন্তা ও কাজে ব্যবহার করতে পারি।

এসএলভি-৩ তখনও ছিল ভবিষ্যতের মধ্যে। কিন্তু এর সাবসিস্টেম ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে আমরা কয়েকটি সূক্ষ্ম সিস্টেম পরীক্ষার জন্য সাউন্ডিং রকেট কেন্টর উৎক্ষেপণ করি। এই রকেটটির সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছিল এসএলভির একটা তাপ নিরোধক আবরণ, রেট জাইরো ইউনিট, আর ভেহিকল অ্যাটিচিউড প্রগ্রামার। ব্যাপক পাল্লার বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটে পদ্ধতি— কম্পোজিট ম্যাটারিয়াল, কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সফটঅয়ার, আমাদের দেশে এগুলোর কোনওটাই এর আগে এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে দেখা হয়নি। পরীক্ষা সফল হল পুরোপুরি। এর আগে পর্যন্ত ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচি সাউন্ডিং রকেটের বাইরে যেতে পারেনি আর জ্ঞাত ব্যক্তিরাও আবহাওয়া বিষয়ক যন্ত্রপাতির চেয়ে সিরিয়াস কিছু পাঠানোর কথা ভাবতে পারেনি। প্রথম বারের মত আমরা জাতির প্রত্যয়কে অনুপ্রাণিত করলাম। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই তারিখে পার্লামেন্টকে বললেন, 'প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি, সাবসিস্টেম ও হার্ডঅয়ার [ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল নির্মাণের জন্য] উন্নয়ন ও নির্মাণের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। কিছু সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিযুক্ত আছে বিভিন্ন অংশ নির্মাণে। ভারতের প্রথম অর্বিটাল ফ্লাইট শুরু হবে ১৯৭৮ সালে।'

সৃষ্টির যে কোনও ক্রিয়ার মত, এসএলভি-৩ সৃষ্টিতেও ছিল বেদনা। একদিন, যখন আমি ও আমার দল পুরোপুরি ব্যস্ত ছিলাম ফার্স্ট স্টেজ মোটর পরীক্ষার প্রস্তুতিতে, তখন পরিবারের একটা মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছাল আমার কাছে। আমার ভগ্নিপতি ও বিজ্ঞ পরামর্শদাতা জেনাব আহমেদ জালালুদ্দিন আর নেই। কয়েক মিনিট আমি পাথরের মত দমে গেলাম, আমি ভাবতে পারছিলাম না, কিছুই অনুভব করতে পারছিলাম না। যখন আরও একবার আমার চারপাশে তাকালাম আর কাজে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করলাম, তখন আবিষ্কার করলাম আমি অসংলগ্ন কথা বলছি— এবং তখনই আমি উপলব্ধি করলাম যে, জালালুদ্দিনের সঙ্গে আমার নিজেরও একটা অংশ মারা গেছে। আমার শৈশব স্মৃতির একটা দৃশ্য পুনরায় ভেসে উঠল চোখের সামনে—রামেশ্বরম মন্দিরের চারপাশে সন্ধ্যা বেলায় হাঁটাহাঁটি, চন্দ্রালোকে চিকচিকে বালি আর ঢেউয়ের নাচ, অমাবস্যার আকাশ থেকে তারার দৃষ্টিপাত, জালালুদ্দিন আমাকে দেখাচ্ছে দূর সমুদ্রে ডুবে গেছে দিকচক্রবাল, আমার বই কেনার জন্য সে টাকা জোগাড় করছে, আর আমাকে

www.pathagar.com

বিদায় জানাচ্ছে সান্তা ক্রুজ বিমানবন্দরে। আমি অনুভব করলাম, স্থান ও কালের এক ঘূর্ণীচক্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে আমাকে। আমার পিতার বয়স ততদিনে একশ' বছর পেরিয়েছে, তার বয়সের অর্ধেক বয়সি জামাইয়ের খাটিয়া তাকে বহন করতে হল ; আমার বোন জোহরা, তার চার বছরের পুত্রের পিতাকে হারানোর ক্ষত এখনও দগদগে—এ সব চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে এসেছিল মুহূর্তে, সহ্য করা ভয়ানক ছিল আমার জন্য। আমি ঠেশ দিয়েছিলাম অ্যাসেম্বলি জিগের ওপর, নিজেকে সামলে নিয়ে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলাম ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর ড. এস শ্রীনিবাসনকে, আমার অনুপস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

সারারাত বিভিন্ন জেলা বাসে ভ্রমণ করে পরদিন আমি রামেশ্বরম পৌঁছালাম। এই সময়ের মধ্যে জালালুদ্দিনের সঙ্গে শেষ হয়ে যাওয়া স্মৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমি অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি বাড়িতে পৌঁছালাম, দুঃখ আবার আমাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। জোহরা বা আমার ভাগ্নে মেহবুবকে বলার মত কোনও কথা আমার ছিল না, দুজনেই তারা কাঁদছিল। আমার চোখে জল ছিল না ফেলার মত। আমরা বেদনাহত ভাবে জালালুদ্দিনকে কবর দিয়েছিলাম।

আমার পিতা দীর্ঘ সময় আমার হাত ধরে রেখেছিলেন। তার চোখেও জল ছিল না। 'তুমি কি দেখতে পাও না, আবুল, প্রভু কেমন দীর্ঘ করেছেন ছায়া? যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তা তিনি স্থির করে দিতে পারতেন। কিন্তু সূর্যকে তিনি ছায়ার পথপ্রদর্শক করেছেন, ধীরে ধীরে ছায়া হ্রাস করেন তিনি। তিনিই তোমার জন্য রাতকে আবরণ করেছেন, নিদ্রাকে বিশ্রাম। জালালুদ্দিন এক দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে—স্বপ্নহীন নিদ্রা, অচেতনতার মধ্যে তার সমস্ত সত্তার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেন তা ব্যতিত আর কিছুই আমাদের ঘটবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আল্লাহর প্রতি তোমার আস্থা রাখো।' তিনি ধীরে ধীরে চোখের পাতা বন্ধ করলেন এবং ধ্যানমগ্নের মত হয়ে পড়লেন।

মৃত্যু কখনও আমাকে শংকিত করেনি। যাই হোক না কেন, এক দিন সবাইকেই যেতে হবে। কিন্তু জালালুদ্দিন হয়তো একটু আগেই চলে গেছে, বেশ একটু আগেই। আমি বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারলাম না। আমি অনুভব করলাম আমার ভিতরের সত্তা এক ধরনের উদ্বিগ্নতায় ডুবে যাচ্ছে, অনুভব করলাম আমার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। অনেকদিন ধরে, থুম্বায়, এক রকম তুচ্ছতা আমি অনুভব করছিলাম যার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না— যা করছিলাম তার সব কিছু সম্পর্কেই।

অধ্যাপক ধাওয়ানের সাথে এ নিয়ে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমার এসএলভি-৩ প্রকল্পের অগ্রগতিই আমার জন্যে সান্ত্বনা বয়ে আনবে। বিভ্রান্তি প্রথমে ঢিলে হয়ে যাবে, তারপর কেটে যাবে একেবারেই। তিনি আমার মনোযোগ টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রযুক্তির বিস্ময় ও এর অর্জনগুলোর দিকে।

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে ড্রয়িং বোর্ড থেকে উত্থিত হতে থাকল হার্ডঅয়ার। শশী কুমার ফেব্রিকেশন ওয়ার্ক সেন্টারের একটা খুব কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। একটা গঠনকর ড্রয়িং পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই যা পাওয়া যেত তাই দিয়ে তিনি ফেব্রিকেশন শুরু করে দিতেন। চারটে রকেট মোটর তৈরির পিছনে নাম্বুদিরি ও পিল্লাই তাদের দিন-রাতের পুরো সময়টা খরচ করছিলেন প্রপালসন গবেষণাগারে। এমএসআর দেব ও স্যান্ডলাস পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন ভেহিকলের যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ইন্টিগ্রেশনের। মাধবন নায়ার ও মূর্তি পরীক্ষা করতেন ভিএসএসসি ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরিতে সৃষ্ট পদ্ধতি এবং সেগুলো যেখানে সম্ভব সেখানে ফ্লাইট সাবসিস্টেমে প্রয়োগ করতেন। ইউএস সিং নিয়ে এসেছিলেন প্রথম লঞ্চ গ্রাউন্ড সিস্টেম, তার সঙ্গে টেলিমেট্রি, টেলি-কমান্ড ও রাডার। ফ্লাইট ট্রায়ালের জন্য এসএইচএআরের একটা বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনাও তিনি তৈরি করেছিলেন। ড. সুন্দররাজন নিবিড়ভাবে মনিটর করতেন। মিশনের বিষয়গুলো এবং সিস্টেম আপডেট করে রাখতেন। ড. শ্রীনিবাসন, একজন লঞ্চ ভেহিকল ডিজাইনার, এসএলভির ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে তিনি আমার সকল সৌজন্যমূলক ও সম্পূরক ক্রিয়াকলাপ খারিজ করে দিয়েছিলেন। আমি যা এড়িয়ে যেতাম তিনি তা লক্ষ্য করতেন, আমি যে সব পয়েন্ট শুনতে ব্যর্থ হতাম তিনি সেগুলো শুনতে পেতেন। আর যে সম্ভাবনা আমার নজর এড়িয়ে যেত সে সম্ভাবনা তিনি তুলে ধরতেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও কর্মকেন্দ্রের মধ্যে নিয়মিত ও দক্ষ ইন্টারফেসিং প্রতিষ্ঠা করা। এই কঠিন বিষয়টা আমরা শিখেছিলাম। যথাযথ সমন্বয়ের অনুপস্থিতিতে কঠিন কাজ অবজ্ঞা করা যেতে পারে।

সেই সময়টাতে আইএসআরওর ওয়াইএস রাজনকে আমার বন্ধু হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছিল। রাজন ছিলেন (এবং আছেন) এক সর্বজনীন বন্ধু। টার্নার, ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাইভার থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, কন্ট্রাক্টর, আমলা প্রমুখ সবার বন্ধু ছিলেন তিনি। আজ যখন সংবাদ মাধ্যম আমাকে 'জনতার ঢালাইকর' হিসেবে আখ্যায়িত করে, তখন আমি এই স্বীকৃতি উৎসর্গ করি রাজনকে। বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে তার নিবিড় মিথস্ক্রিয়া এসএলভিতে এমন এক ঐকতান সৃষ্টি করেছিল যে ব্যক্তি প্রচেষ্টার সুতোয় বোনা হয়েছিল বিশাল শক্তির এক বিপুল বস্ত্র।

১৯৭৬ সালে আমার পিতা ইন্তেকাল করলেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার আরও একটা কারণ ছিল জালালুদ্দিনের মৃত্যু। তিনি বেঁচে থাকার আকাঙ্খা হারিয়ে ফেলেছিলেন, যেন জালালুদ্দিনকে তার দিব্যজগতে ফিরে যেতে দেখে তিনিও সেখানে ফিরে যাবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলেন।

www.pathagar.com

আমি যখনই বাবার শরীর খারাপের কথা জানতে পারতাম তখনই শহর থেকে একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে যেতাম রামেশ্বরমে। বাবা আমার অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগের কারণে ভর্ৎসনা করতেন আর ডাক্তারের পিছনে অর্থব্যয় সম্পর্কে বক্তৃতা শোনাতেন। 'তোমার আসাটাই আমার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট, ডাক্তার এনে তার ফি বাবদ অত টাকা খরচ করার দরকার কি?' তিনি বলতেন। এবার তার অবস্থা চলে গিয়েছিল যে কোনও ডাক্তারের সামর্থ্যের বাইরে। আমার বাবা জয়নুলাবদিন, রামেশ্বরম দ্বীপে যিনি জীবন কাটিয়েছেন ১০২ বছর, তিনি পরলোক গমন করেন আর পিছনে রেখে যান পনেরজন নাতি-নাতনি, একজন প্র-নাতি। তিনি একটা দৃষ্টান্তমূলক জীবন যাপন করেছিলেন। তাকে কবর দেবার পর রাতের বেলা একা বসে আমি একটি কবিতার কথা স্মরণ করলাম, অডেন তার বন্ধু ইয়েটস্-এর মৃত্যুতে সে কবিতা লিখেছিলেন, আর অনুভব করলাম যেন সে কবিতা লেখা হয়েছে আমার বাবার জন্যই :

Earth, receive an honoured guest ;
William Yeats is laid to rest :
.....
In the prison of his days
Teach the free man how to praise.

প্রকৃতির নিয়মে এটা ছিল মাত্র আরেকজন বৃদ্ধ মানুষের মৃত্যু। সর্বসাধারণের কোনও শোকসভা আয়োজন করা হয়নি, কোনও পতাকা অর্ধ-নমিত রাখা হয়নি, কোনও সংবাদপত্র তার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করেনি। তিনি কোনও রাজনীতিক, পন্ডিত বা ব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাদাসিধে ও স্বচ্ছ মানুষ। আমার বাবা অবলম্বন করেছিলেন সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, সততা। তার জীবন তাদের বেড়ে ওঠায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল যারা ছিল সদাশয়, দেবোপম, বিজ্ঞ ও মহৎ।

আমার বাবা সব সময় আমাকে মনে করিয়ে দিতেন কিংবদন্তির আবু বেন আদহামের কথা। আবু বেন আদহাম একরাতে শান্তির এক গভীর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখতে পেল একজন ফেরেশতা সোনার একটা গ্রন্থে সেই ব্যক্তিদের নাম লিখছে যারা স্রষ্টাকে ভালবাসে। আবু জানতে চাইল তালিকায় তার নাম আছে কি না। ফেরেশতা নেতীবাচক উত্তর দিল। হতাশ হলেও তখনও উৎফুল্ল আবু বলল, 'সহগামী লোকদের ভালবাসি এই হিসেবে আমার নাম লেখ।' ফেরেশতা লিখল তার নাম, এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। পরের রাতে আবারও সব কিছু আলোকিত করে ফেরেশতা এল। তারপর সেই সব লোকের নামের তালিকা দেখাল যাদের প্রতি স্রষ্টার ভালবাসা বর্ষিত হয়েছে। তালিকার প্রথমেই ছিল আবুর নাম।

আমি দীর্ঘ সময় মায়ের সঙ্গে বসে থাকলাম, কিন্তু কোনও কথা বলতে পারলাম না। ভাঙা গলায় তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন যখন আমি থুম্বায়

www.pathagar.com

ফিরে যাবার জন্য তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তিনি জানতেন যে, তার স্বামীর বাড়ি তিনি ছেড়ে যাবেন না, যে বাড়ির জামিনদার ছিলেন তিনি, আর আমিও তার সঙ্গে এখানে বসবাস করব না। আমাদের দুজনকেই যার যার নিয়তি অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে জীবন যাপন করতে হবে। এসএলভি কি আমার ওপর অতিমাত্রায় চেপে বসেছিল? মায়ের কথা শোনার জন্য কিছু সময়ের জন্য কি আমার নিজের ব্যাপার ভুলে যেতে পারতাম না? অল্প কিছুদিন পর তিনি যখন পরলোকগমন করলেন, কেবল তখনই এটা আমি উপলব্ধি করেছিলাম।

এসএলভি-৩ অ্যাপোজি রকেট উন্নত করা হয়েছিল ডায়মন্টের একটা কমন আপার স্টেজ হিসেবে। ফ্রান্সে এই রকেটটির পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের শিডিউল ছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটি জট-পাকান সমস্যার কারণে তাতে বিঘ্ন ঘটল। সমস্যাগুলো বের করতে আমাকে দ্রুত ছুটতে হল ফ্রান্সে। আমি দেশ ছাড়ার আগে, শেষ বিকেলে, আমাকে জানান হল যে আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। নাগার কয়েলের প্রথম যে বাসটা পেলাম সেটাই ধরলাম। সেখান থেকে ট্রেনে পুরো একটা রাত খরচ করলাম রামেশ্বরমে পৌঁছানোর জন্য, আর সেখানে পরদিন সকালে পৌঁছে দাফনের শেষ অংশে যোগ দিতে সক্ষম হলাম। যে দুজন মানুষ আমাকে গঠন করেছিলেন তারা দু'জনেই আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন তাদের দিব্যজগতে। পরলোকগতরা তাদের যাত্রার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বাকি আমাদের সবার যাত্রা চলতে থাকবে উৎকণ্ঠিত পথে আর জীবনও চলতে থাকবে। যে মসজিদে বাবা আমাকে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ে যেতেন সেখানে আমি প্রার্থনা করলাম। আমি স্রষ্টাকে বললাম যে, আমার মা পৃথিবীতে বেশিদিন জীবন যাপন করতে পারতেন না তার স্বামীর যত্ন ও ভালবাসা ছাড়া, অতঃপর আকাঙ্খা করেছিলেন তার সাথে মিলিত হওয়ার। আমি স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। 'আমি যে কাজের ডিজাইন করেছিলাম সে কাজ তারা সম্পূর্ণ করেছে বিপুল যত্ন, আত্মোৎসর্গ এবং সততা সহকারে এবং তারা আমার কাছেই ফিরে এসেছে। তাদের সম্পূর্ণতার দিনে তুমি কেন সন্তাপ করছ? তোমার প্রতি অর্পিত দায়িত্বের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত কর, আর তোমার কাজের ভিতর দিয়ে আমার গৌরব ছড়িয়ে দাও!' এই কথাগুলো কেউ বলেনি, কিন্তু আমি তা পরিষ্কার শুনতে পেলাম। মৃত্যুর পর দেহ ছেড়ে যাওয়া আত্মা সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত প্রেরণাদায়ক বাণীতে আমার মন পূর্ণ হয়ে উঠল : 'তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান শুধুমাত্র পরীক্ষা, পক্ষান্তরে আল্লাহ! তিনিই অনন্ত পুরস্কার।' আমি মসজিদ থেকে মনের শান্তি নিয়ে বেরিয়ে এলাম এবং এগিয়ে চললাম রেলওয়ে স্টেশনের দিকে। আমার সব সময় মনে পড়ে, যখনই আজান হত তখনই আমাদের বাড়িটা একটা ছোট মসজিদে রূপান্তরিত হত। আমার বাবা ও আমার মা নেতৃত্ব দিতেন, আর তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিরা তাদের অনুসরণ করত।

পরদিন সকালে আমি ফিরে এসেছিলাম থুম্বায়, শারীরিক ভাবে ক্লান্ত, আবেগের দিক থেকে ভগ্ন, কিন্তু বিদেশের মাটিতে একটা ভারতীয় রকেট মোটর ওড়ানোর আমাদের উচ্চাকাঙ্খা পরিপূর্ণ করতে দৃঢ়প্রত্যয়ী।

www.pathagar.com

এসএলভি-৩ অ্যাপোজি মোটরের সফল পরীক্ষার পর ফ্রান্স থেকে আমি ফিরে এলে ড. ব্রহ্ম প্রকাশ আমাকে একদিন ভের্নার ফন ব্রাউনের আগমন সম্পর্কে জানালেন। রকেট বিজ্ঞানে কর্মরত প্রত্যেকেই ফন ব্রাউন সম্পর্কে জানতেন। তিনি মারাত্মক V-2 ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লন্ডনকে বিধ্বস্ত করেছিল। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মিত্রবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন ফন ব্রাউন। তার প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখিয়ে ফন ব্রাউনকে নাসার রকেটবিজ্ঞান কর্মসূচিতে শীর্ষ পদে বসান হয়। মার্কিন সেনাবাহিনীর পক্ষে কর্মরত ফন ব্রাউন যুগান্তকারী জুপিটার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেন, যেটা ছিল ৩০০০ কিলোমিটার পাল্লার প্রথম আইআরবিএম। ড. ব্রহ্ম প্রকাশ যখন মাদ্রাজে ফন ব্রাউনকে গ্রহণ করে থুম্বায় এস্কর্ট করে নিয়ে যাবার জন্য বললেন আমাকে, আমি তখন স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

V-2 মিসাইল (জার্মান শব্দ Vergeltungswaffe-এর সংক্ষেপ) ছিল রকেট ও মিসাইলের ইতিহাসে বিশালতম একক অর্জন। ১৯২০-এর দশকে ভিএফআর (সোসাইটি ফর স্পেস ফ্লাইট)-এ ফন ব্রাউন ও তার দলের প্রচেষ্টায় এই অর্জন সম্ভব হয়েছিল। বেসামরিক প্রচেষ্টা হিসেবে যা আরম্ভ হয়েছিল, শীগগিরই তা পরিণত হল সামরিক বাহিনীর কর্মকান্ডে, এবং ফন ব্রাউন পরিণত হলেন কুমের্সডর্ফে অবস্থিত জার্মান মিসাইল ল্যাবরেটরির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। প্রথম V-2 মিসাইল পরীক্ষা করা হয় ১৯৪২ সালের জুন মাসে। ওই পরীক্ষা ছিল অসফল। মিসাইলটা এক পাশে কাত হয়ে পড়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২ সালের ১৬ অগাস্ট এটা পরিণত হয় শব্দের গতি ছাড়িয়ে যাওয়া প্রথম মিসাইলে। ফন ব্রাউনের তত্ত্বাবধানে, জার্মানির নর্ডহাউসেনের কাছে বিশাল ভূগর্ভস্থ উৎপাদন ইউনিটে, ১৯৪৪ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে ১০ হাজারেরও বেশি V-2 মিসাইল নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই মানুষটার সাথে আমি ভ্রমণ করব — একজন বিজ্ঞানী, একজন ডিজাইনার, একজন প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ার, একজন প্রশাসক, একজন টেকনোলজি ম্যানেজার সব কিছু—আমি বেশি আর কি চাইতে পারতাম?

আমরা একটা অ্যাভ্র বিমানে চড়ে প্রায় ৯০ মিনিট আকাশভ্রমণ শেষে মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রামে পৌঁছলাম। ফন ব্রাউন আমাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমার বর্ণনা শুনলেন যেন তিনি রকেট বিজ্ঞানের একজন ছাত্র। আমি কখনই আশা করিনি যে, আধুনিক রকেট বিজ্ঞানের জনক অতটা বিনয়ী হবেন, অতটা গ্রহণশীল আর প্রেরণাদায়ক হবেন। পুরো বিমান ভ্রমণের সময়টায় তার আচরণে আমি স্বস্তি অনুভব করলাম। এটা কল্পনা করা কঠিন ছিল যে মিসাইল সিস্টেমের এক মহাপন্ডিতের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম।

তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন যে এসএলভি-৩-এর ডায়ামিটার L/D অনুপাতের দৈর্ঘ্য. যা ডিজাইন করা হয়েছিল ২২ পর্যন্ত, তা ছিল উচ্চতর পাশে এবং তিনি

www.pathagar.com

আমাকে সাবধান করে দিলেন অ্যারো–ইলাস্টিক সমস্যা সম্পর্কে, উড্ডয়ন কালে যা অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে।

তার কর্মজীবনের প্রধান অংশটা জার্মানিতে খরচ করার পর, আমেরিকায় তিনি কেমন বোধ করছিলেন? এই প্রশ্ন আমি করেছিলাম ফন ব্রাউনকে, এপোলো মিশনে স্যাটার্ন রকেট তৈরির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যিনি পরিণত হয়েছিলেন কাল্ট ফিগারে। এপোলো মিশন মানুষকে চাঁদে নিয়ে গিয়েছিল। 'আমেরিকা একটা বিশাল সম্ভাবনার দেশ, কিন্তু অ-আমেরিকান সবকিছুর প্রতি তারা সন্দেহ নিয়ে তাকায়। তারা সবসময় একটা NIH—Not Invented Here— কমপ্লেক্সে ভোগে এবং বিদেশি প্রযুক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে। রকেট বিজ্ঞান নিয়ে যদি তুমি কিছু করতে চাও তাহলে তা নিজেই কর', ফন ব্রাউন আমাকে পরামর্শ দিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, 'এসএলভি-৩ একেবারে বিশুদ্ধ ভারতীয় ডিজাইন এবং তুমি হয়ত তোমার নিজের সমস্যায় জড়াচ্ছ। কিন্তু তুমি সবসময় মনে রাখবে যে আমরা শুধু সাফল্যের উপরেই গড়ি না, আমরা ব্যর্থতার উপরেও গড়ি।'

রকেট নির্মাণে অপরিহার্য কঠোর কাজ ও অঙ্গীকারের বিষয়ে তিনি হাসলেন আর চোখে দুষ্টুমির ভাব নিয়ে বললেন, 'কঠোর কাজই শুধু যথেষ্ট নয় রকেট বিজ্ঞানে। এটা কোনও খেলা নয় যেখানে কঠোর কাজ তোমাকে সম্মান এনে দেবে। এখানে, তোমার শুধু লক্ষ্য থাকলেই চলবে না, যত দ্রুত সম্ভব লক্ষ্য অর্জনের কৌশলও থাকতে হবে।'

'পূর্ণ অঙ্গীকার ঠিক কঠোর কাজ নয় ; এটা হচ্ছে পূর্ণ সংশ্লিষ্টতা। পাথরের দেয়াল নির্মাণ হচ্ছে একটা হাড়-ভাঙা কাজ। কিছু লোক আছে যারা সারা জীবন পাথরের দেয়াল বানায়। আর তারা যখন মারা যায়, তখন দেখা যায় মাইলের পর মাইল দেয়াল, ওই লোকেরা কি কঠোর কাজ করেছিল তার নীরব সাক্ষী।'

তিনি বলতেই থাকলেন, 'কিন্তু অন্য মানুষও আছে, একটা পাথর আরেকটার ওপর স্থাপন করার সময় যাদের মনে থাকে একটা দৃশ্য, একটা লক্ষ্য। এটা হতে পারে একটা চত্বর, যেখানে পাথরের দেয়ালের ওপর উঠেছে গোলাপ এবং গ্রীষ্মের অলস দিনের জন্য বাইরে পাতা হয়েছে চেয়ার। কিংবা পাথরের দেয়াল হয়তো পরিবেষ্টন করতে পারে একটা আপেল বাগান অথবা একটা বাউন্ডারির চিহ্ন। যখন তারা কাজ শেষ করে, তখন একটা দেয়ালের চেয়েও বেশি কিছু পায় তারা। এটা সেই লক্ষ্য যা পার্থক্য তৈরি করে। রকেট বিজ্ঞানকে তোমার পেশা কর না, কিংবা জীবিকা —এটাকে বানাও তোমার ধর্ম, তোমার মিশন।' ফন ব্রাউনের মধ্যে আমি কি অধ্যাপক বিক্রম সারাভাইয়ের কিছু দেখতে পেয়েছিলাম? ওই রকম ভাবতেই আমার আনন্দ হয়েছিল।

পরিবারে তিনটি মৃত্যুর পর নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা দরকার হল আমার মনের কাছে। আমার সম্পূর্ণ সত্তাটাকে এসএলভি সৃষ্টিতে

www.pathagar.com

নিমগ্ন রাখতে চেয়েছিলাম আমি। যে পথ আমাকে অনুসরণ করতে হবে সেই পথ যেন আবিষ্কার করেছি বলে আমার মনে হল। আর সে পথ হল আমার জন্য আল্লাহর মিশন এবং তার পৃথিবীতে আমার উদ্দেশ্য। এই সময়কালে আমি যেন যন্ত্রচালিত হয়ে গিয়েছিলাম— সন্ধ্যাবেলায় ব্যাডমিন্টন খেলতাম, ছুটির দিনগুলো উদযাপন করতাম না, পরিবারের সঙ্গে বা আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না, এমন কি এসএলভি পরিমন্ডলের বাইরে কারো সঙ্গে বন্ধুত্বও ছিল না।

তোমার মিশন সফল করতে হলে, তোমাকে সব চিন্তা বাদ দিয়ে অবশ্যই একাগ্রচিত্ততার সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে তোমার লক্ষ্যের দিকে। আমার মত ব্যক্তিদের প্রায়শই 'কর্মাসক্ত' বলে অভিহিত করা হয়। এই টার্ম নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। কারণ এটা থেকে প্যাথলজিক্যাল অবস্থা বা অসুস্থতা বোঝান হয়। দুনিয়ায় অন্য আর কোনও কিছুর চেয়ে যা আমার অধিক কাঙ্খিত এবং যা আমাকে আনন্দিত করে তা যদি আমি করি, তাহলে সে কাজ কখনই বিপথগামিতা হতে পারে না। আমি যখন কাজ করি তখন বাইবেলের ছাব্বিশতম চরণ আমার মনে আসে : 'আমাকে পরীক্ষা কর, হে প্রভু, আর প্রমাণিত কর।'

যারা নিজের পেশার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে চায় তাদের ক্ষেত্রে টোটাল কমিটমেন্ট একটা বড় রকমের কোয়ালিটি। সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটিতে কাজ করার আকাঙ্খায় অন্য আর কোনও কিছুর জায়গা থাকে না। আমার সঙ্গে এমন অনেকে ছিলেন যারা ৪০-ঘণ্টায় এক সপ্তাহ হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু অন্য অনেককে চিনতাম যারা কাজ করতেন সপ্তাহে ৬০, ৮০ এমন কি ২০০ ঘণ্টা পর্যন্ত। কারণ তারা কাজের মধ্যে প্রাণের উত্তেজনা ও পুরস্কার খুঁজে পেয়েছিলেন। সমস্ত সফল নারী-পুরুষের মধ্যে একটা সাধারণ বিষয় এই টোটাল কমিটমেন্ট। একজন উদ্যমী ও একজন বিভ্রান্ত মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, তাদের অভিজ্ঞতাকে তাদের মন যেভাবে ব্যবহার করে তার মধ্যে পার্থক্য। মানুষের প্রতিবন্ধকতা দরকার, কারণ সাফল্য উপভোগের জন্য এর প্রয়োজন। আমাদের সবার মধ্যেই এক ধরনের সুপার-ইন্টেলিজেন্স আছে। একে সঞ্চারিত করা উচিৎ যাতে আমরা পরীক্ষা করতে সমর্থ হই আমাদের গভীর ভাবনা, আকাঙ্খা ও বিশ্বাস।

তোমার এ জন্য আরও প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য আর সীমাহীন শক্তি। শীর্ষে উঠতে হলে শক্তি লাগবে, সে এভারেস্ট পর্বতের শীর্ষই হোক আর তোমার ক্যারিয়ারের শীর্ষই হোক। লোকেরা বিভিন্ন প্রকার শক্তির মজুত নিয়ে জন্মায় এবং যারা ক্লান্ত হয় প্রথমে আর সহজেই নিঃশেষিত হয় তারা প্রথম দিকেই নিজ নিজ জীবন ভালভাবে পুনর্গঠিত করতে পারে।

১৯৭৯ সালে ছয় সদস্যের একটি দল স্ট্যাটিক টেস্ট ও মূল্যায়নের জন্য একটা জটিল সেকেন্ড স্টেজ কন্ট্রোল সিস্টেমের ফ্লাইট ভার্সন প্রস্তুত করছিল। টি-১৫ মিনিটে (পরীক্ষার আগের ১৫ মিনিট) দল মনোযোগী ছিল কাউন্টডাউন মোডে। বারোটা ভালভের একটা চেকআউটের সময় সাড়া দিল না। দলের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ করে রেড ফিউমিং নাইট্রিক এসিড (আরএফএনএ) পূর্ণ অক্সিডাইজারের ট্যাংক বিস্ফোরিত হল, তাতে এসিড দগ্ধ হল

www.pathagar.com

দলের সদস্যরা। তাদের ভোগান্তি দেখাটা ছিল এক নির্মম অভিজ্ঞতা। কুরুপ ও আমি দ্রুত ছুটে গেলাম ত্রিবান্দ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আর আমাদের ছয় সহকর্মীকে ভর্তি করে নেবার আকুতি জানালাম ; ওই সময়ে হাসপাতালে কোনও বেড খালি ছিল না।

এসিড দগ্ধদের একজন ছিলেন শিবরামকৃষ্ণন নায়ার। তার শরীরের অনেকগুলো স্থান পুড়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে আমরা একটা বেডের ব্যবস্থা করছিলাম যখন, তিনি প্রচন্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। আমি তার বেডের পাশে রাত জেগে বসে থাকলাম। রাত প্রায় ৩টার দিকে জ্ঞান ফিরে পেলেন শিবরামকৃষ্ণন। তার প্রথম কথাই ছিল দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন দুর্ঘটনার কারণে যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা তিনি ঠিক করে দেবেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই। ভয়ংকর যন্ত্রণার মধ্যেও তার সততা ও আশাবাদ আমাকে গভীর আলোড়িত করল।

শিবরামকৃষ্ণনের মত লোকেরা জন্ম থেকেই আলাদা। এই ঘটনা আমার দলের প্রতি আমার আস্থা ভীষণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল, যে দল সাফল্যে ও ব্যর্থতায় দাঁড়িয়ে থাকবে পাথরের মত।

আমি অনেক জায়গায় 'প্রবাহ' শব্দটা ব্যবহার করেছি এর আসল অর্থটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করে। এই প্রবাহ জিনিসটা কি? আর এই আনন্দ? আমি এসবকে বলতে পারতাম জাদুর মুহূর্ত। প্রবাহ হচ্ছে একটা সেনসেশন, যখন আমরা সামগ্রিক সত্তা দিয়ে কোনও কিছু করি তখন এর স্পর্শ পাই। প্রবাহের সময়, অভ্যন্তরীণ একটা যুক্তি অনুযায়ী ক্রিয়া অনুসরণ করে ক্রিয়াকে, কর্মীর কোনও অংশে সচেতন হস্তক্ষেপের যার প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়। কোনও তাড়া নেই ; কারোর মনোযোগের ওপর কোনও চাহিদা নেই। অতীত ও ভবিষ্যৎ উধাও হয়ে যায়। ব্যক্তি ও সক্রিয়তার মধ্যে পার্থক্যও তাই করে। আমরা সবাই এসএলভি প্রবাহের মধ্যে জড়ো হয়েছিলাম। যদিও আমরা কঠোর পরিশ্রম করছিলাম, তবুও আমরা অত্যন্ত রিলাক্স, উদ্যমী ও তাজা ছিলাম। কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল? কে সৃষ্টি করেছিল এই প্রবাহ?

হয়তো এটা ছিল আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যের অর্থপূর্ণ সংগঠন। আমরা বিস্তৃত লক্ষ্য চিহ্নিত করতাম, তারপর কাজ করতাম বিভিন্ন বিকল্প থেকে লক্ষ্য পূরণের। সমস্যা সমাধানে একটা সৃজনশীল পরিবর্তন আসত, তা আমাদের স্থাপন করত 'প্রবাহের' মধ্যে।

এসএলভি-৩ হার্ডঅয়ারের উত্থান যখন শুরু হয়েছিল, তখন আমাদের একাগ্রচিত্ততার সামর্থ্য বেড়ে গিয়েছিল লক্ষ্যনীয় ভাবে। আমি বিপুল আত্মবিশ্বাস অনুভব করতাম ; নিজের ও এসএলভি-৩ প্রকল্পের প্রতি। প্রবাহ হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত সক্রিয়তার একটা বাই-প্রডাক্ট। প্রথম চাহিদা হল, যতটা পার কঠোর কাজ কর যা তোমার কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। আরেকটি বিষয় হল বাধাবিঘ্নহীন সময়।

www.pathagar.com

আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, আধা ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে প্রবাহে ঢুকে পড়া কঠিন। আর বাধা-বিঘ্ন থাকলে তো প্রায় অসম্ভব।

ফলপ্রসূভাবে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেমন একটা অবস্থা আমরা সৃষ্টি করি, তেমন ভাবে কি এক ধরনের কন্ডিশনিং ডিভাইস ব্যবহার করে আমরা প্রবাহের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি? উত্তর হল হ্যাঁ, আর এর গুপ্তকথা হল তুমি আগে যে প্রবাহের মধ্যে ছিলে সেই প্রবাহ বিশ্লেষণ করা। তুমি নিজেই শনাক্ত করতে পার সাধারণ বিভাজকগুলো। এই বিভাজকগুলো যদি বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পার, তাহলে তুমি প্রবাহের জন্য মঞ্চ তৈরি করতে পারবে।

এই অবস্থার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার বহুবার। এসএলভি মিশনে প্রায় প্রতিদিন। গবেষণাগারে দিনের পর দিন গেছে যখন আমি চোখ তুলে দেখেছি গবেষণাগার ফাঁকা, তখন বুঝতে পেরেছি কাজের সময় শেষ হয়েছে অনেক আগেই আর সবাই চলে গেছে। আবার অন্যান্য দিনে দেখেছি, আমার দলের সদস্যরা ও আমি কাজে এমনই আটকা পড়ে গেছি যে আমাদের মধ্যাহ্নভোজের সময় পেরিয়ে গেলেও কেউ বুঝতেই পারিনি আমরা ক্ষুধার্ত।

প্রকল্প যতই শেষের দিকে যাচ্ছিল ততই আমাদের এই অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। আমি এও উপলব্ধি করেছিলাম যে, অফিস যেদিন আপাত শান্ত থাকে সেদিনও এই ঝোঁক থাকে প্রবলভাবে। এই রকম প্রভাব ফ্রিকোয়েন্সিতে বর্ধিত হয়েছিল দারুণভাবে, এবং এসএলভি-৩ এর স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সত্য হল ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝিতে।

আমরা এসএলভি-৩ এর প্রথম পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের তারিখ নির্ধারণ করেছিলাম ১০ অগাস্ট ১৯৭৯। মিশনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল একটা পুরোপুরি ইন্টিগ্রেটেড লঞ্চ ভেহিকল প্রস্তুত করা ; স্টেজ মোটর, গাইডেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ও ইলেকট্রনিক সাবসিস্টেমের মত অন-বোর্ড সিস্টেমগুলোর মূল্যায়ন করা ; আর গ্রাউন্ড সিস্টেম মূল্যায়ন করা, যেমন চেকআউট, ট্র্যাকিং, টেলিমেট্রি ও শ্রীহরিকোটা লঞ্চ কমপ্লেক্সে তৈরি লঞ্চ অপারেশনের রিয়াল-টাইম ডাটা ফ্যাসিলিটিজ। ২৩ মিটার লম্বা, ১৭ টন ওজনের ফোর-স্টেজ এসএলভি রকেট শেষ পর্যন্ত ০৭৫৮ ঘন্টায় চমৎকারভাবে উড্ডয়ন করল এবং অনতিবিলম্বে পূর্ব নির্ধারিত ট্র্যাজেক্টরিতে চলতে শুরু করল।

স্টেজ ১ কাজ করল নিখুঁত ভাবে। এই স্টেজ থেকে দ্বিতীয় স্টেজে অতিক্রমণ ঘটল মসৃণভাবে। এসএলভি-৩ -এর আকার নিয়ে আমাদের স্বপ্ন আকাশে উড়ছে দেখে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লাম। অকস্মাৎ জাদুমন্ত্র ভেঙে গেল। দ্বিতীয় স্টেজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এই ফ্লাইটের অবসান ঘটল ৩১৭ সেকেন্ড পর এবং ভেহিকলের অবশিষ্ট অংশ, পেলোডযুক্ত আমার প্রিয় চতুর্থ স্টেজসহ, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হল, শ্রীহরিকোটা থেকে ৫৬০ কিলোমিটার দূরে।

এ ঘটনায় আমরা দারুণভাবে হতাশ হয়েছিলাম। ক্রোধ আর হতাশার অদ্ভুত এক মিশ্র অনুভব করলাম আমি। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, আমার পা এমন

www.pathagar.com

শক্ত হয়ে গেছে যে যন্ত্রণা করছে। সমস্যাটা আমার দেহে ছিল না ; আমার মনে ঘটছিল কিছু একটা।

আমার হোভারক্র্যাফট *নন্দীর* অকালমৃত্যু, আরএটিও পরিত্যাগ, এসএলভি-ডায়মন্ট ফোর্থ স্টেজের ব্যর্থতা— সব কিছু যেন জীবন্ত হয়ে উঠল চোখের সামনে, যেন অনেকদিন আগে কবর দেওয়া কোনও ফিনিক্স পাখি উঠে এল ভস্ম থেকে। বিগত বছরগুলোয় আমি কোনও রকমে এসব ব্যর্থ প্রচেষ্টা আত্মভূত করতে শিখেছিলাম, ওগুলো ভুলে নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নে মগ্ন হয়েছিলাম। কিন্তু এইবার আমার চরম নৈরাশ্যের মধ্যে সেইসব বাধা-বিপত্তিগুলোর প্রত্যেকটি আবার জীবন্ত হতে দেখলাম।

'এর কারণ কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?' ব্লক হাউজে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি একটা উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এ নিয়ে ভাবার বা উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করার মত অবস্থা আমার ছিল না, তাই ওটা বাদ দিলাম। উৎক্ষেপণ পরিচালিত হয়েছিল খুব সকালে, সারা রাত কাউন্ট-ডাউনের পর। অধিকন্তু, তার আগে এক সপ্তাহ ঘুমানোর সুযোগ পাইনি আমি। পুরোপুরি ক্লান্তিতে নিঃশেষিত হয়ে— যেমন মানসিক তেমনি শারীরিক— আমি সোজা আমার কামরায় ফিরে গিয়ে বিছানায় পড়ে গেলাম ধপাস করে।

আমার কাঁধে কোমল একটা স্পর্শে আমি জেগে উঠলাম। তখন অপরাহ্ন পেরিয়ে গেছে, প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। ড. ব্রহ্ম প্রকাশকে দেখতে পেলাম বসে আছেন আমার বিছানার পাশে। 'লাঞ্চ খেতে যাবেন না?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি গভীর আলোড়িত হলাম তার স্নেহপরায়ণতা ও উদ্বিগ্নতায়। পরে আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, ড. ব্রহ্ম প্রকাশ তার আগে আমার কামরায় আরও দুবার এসেছিলেন, কিন্তু আমাকে ঘুমন্ত দেখে চলে গিয়েছিলেন। কখন ঘুম থেকে জেগে তার সঙ্গে লাঞ্চ করব তারই অপেক্ষায় ছিলেন তিনি সেই পুরো সময়টা। আমি ব্যথিত ছিলাম, কিন্তু এককভাবে নয়। ড. ব্রহ্ম প্রকাশের সঙ্গ আমাকে নতুন এক আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করে তুলল। তিনি খাবার সময় হালকা কথাবার্তা বললেন, সতর্কতার সাথে এসএলভি-৩ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন, কিন্তু কোমলভাবে তার কথাবার্তা আমাকে প্রবোধ দিচ্ছিল।

www.pathagar.com

৯

ড. ব্রহ্ম প্রকাশ এই প্রতিবন্ধকতার সময়টা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগ করেছিলেন তিনি ঃ 'সাথীকে কেবল জীবন্ত অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছে দাও। সে সুস্থ হয়ে উঠবে।' তিনি এসএলভি টিমের সবাইকে এক সঙ্গে জড়ো করে আমাকে দেখালেন, ব্যর্থতার দুঃখে শুধু আমি একাই কাতর নই। 'আপনার সব কমরেড দাঁড়িয়ে আছে আপনার পাশেই', তিনি বললেন। এটা আবেগপূর্ণ সমর্থন ও উৎসাহ জাগাল আমার মনে, সেই সাথে পথ-নির্দেশনা।

উড্ডয়ন-পরবর্তী একটা পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হল ১১ অগাস্ট ১৯৭৯ তারিখে। এতে সত্তুরজনেরও বেশি বিজ্ঞানী উপস্থিত হলেন। ব্যর্থতার বিস্তারিত টেকনিক্যাল দিকগুলো নির্ধারণ করা হয়েছিল এতে। পরে এসকে আথিথান-এর নেতৃত্বে পোস্টফ্লাইট অ্যানালিসিস কমিটি ভেহিকলের কাজ না-করার কারণগুলো নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেছিল। সেকেন্ড স্টেজ কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্যর্থতার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে—এটা বোঝা গেল। দ্বিতীয় স্টেজ উড্ডয়নের সময় কোনও কন্ট্রোল ফোর্স না থাকায় ভেহিকল অ্যারোডাইনামিক ভাবে অস্থিত হয়ে পড়েছিল, এতে উচ্চতা ও গতি দুটোই হারাতে থাকে। এই কারণেই ভেহিকলটি সমুদ্রে পতিত হয় অন্য স্টেজগুলো প্রজ্বলিত হবার আগেই।

সেকেন্ড-স্টেজ ব্যর্থতার আরও ইন-ডেপ্থ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ওই পর্যায়ে জ্বালানি শক্তির জন্য অক্সিডাইজার হিসেবে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ রেড ফিউমিং

www.pathagar.com

নাইট্রিক এসিড (আরএফএনএ) নিঃসরণ। ফলে কন্ট্রোল ফোর্স যখন প্রয়োজন হল তখন কেবল জ্বালানি প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল, পরিণতিতে ফোর্স হল শূন্য। অন্যদিকে আরএফএনএ নিঃসরণের কারণ শনাক্ত করা গেল যে, 'অক্সিডাইজার ট্যাংকে একটা সলেনয়েড ভাল্‌ভ উন্মুক্ত ছিল, টি-৮ মিনিটে প্রথম কমান্ডের পর সংক্রমণের জন্য।'

আইএসআরওর শীর্ষ বিজ্ঞানীদের একটা মিটিঙে অধ্যাপক ধাওয়ানের কাছে এই তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল আর তা গৃহীত হয়েছিল। ব্যর্থতা সামাল দিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে মিটিঙের সবারই সাধারণভাবে সন্তোষজনক মনোভাব ছিল। আমি কিন্তু তখনও নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছিলাম না আর অস্থিরতা অনুভব করছিলাম।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক ধাওয়ানকে সম্ভাষণ করে বললাম, 'স্যার, যদিও আমার বন্ধুরা যান্ত্রিক দিক থেকে এ ব্যর্থতা বিচার করেছেন, তবু আরএফএনএ ছিদ্র কাউন্টডাউনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপেক্ষা করার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। মিশন ডিরেক্টর হিসেবে, আমার উচিৎ ছিল উৎক্ষেপণ স্থগিত রাখা আর সম্ভব হলে ফ্লাইটটা রক্ষা করা। বিদেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে মিশন ডিরেক্টরকে অপসারণ করা হত। সুতরাং এসএলভি-৩ ব্যর্থতার দায়ভার আমি নিচ্ছি।' বেশ কিছু সময় হলের মধ্যে পিন-পতন স্তব্ধতা বিরাজ করল। অধ্যাপক ধাওয়ান তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি কালামকে কক্ষপথে স্থাপন করতে যাচ্ছি!', তারপর মিটিং শেষ করার সংকেত দিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন।

বিজ্ঞানের অভীষ্ট বস্তু হচ্ছে পরমোল্লাস ও বিশাল হতাশার একটা সমন্বিত রূপ। এ রকম অনেক ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। জোহানেস কেপলার-এর তিন কক্ষ পথের সূত্র মহাকাশ গবেষণার ভিত্তি গড়েছিল। কিন্তু সূর্যের চারপাশে গ্রহসমূহের ঘূর্ণন সম্পর্কে তার প্রথম দুটো ধারণা সূত্রবদ্ধ করার পর তার তৃতীয় সূত্রটি ঘোষণা করতে সময় লেগেছিল ১৭ বছর। কতবার ব্যর্থতা আর হতাশার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল তাকে? রুশ গণিতবিদ কন্‌স্তান্তিন ৎসিওল্‌কভস্কি মানুষের চাঁদে পদার্পণের ধারণা সম্প্রসারিত করেছিলেন, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রায় চার দশক পর— এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা। অধ্যাপক চন্দ্রশেখরকে তার আবিষ্কৃত 'চন্দ্রশেখর লিমিট'-এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর, ১৯৩০-এর দশকে ক্যামব্রিজে স্নাতক ছাত্র থাকাকালে তিনি এটা আবিষ্কার করেছিলেন। তার কাজ যদি সেই সময় স্বীকৃত হত, তাহলে ব্ল্যাক হোল আবিষ্কারকে কয়েক দশক এগিয়ে নিতে পারত তা। কতবার ফন ব্রাউনকে ব্যর্থ হতে হয়েছিল তার স্যাটার্ন লঞ্চ ভেহিকল মানুষকে চাঁদে পৌঁছে দেবার আগে? এইসব চিন্তা আমাকে আবার পুরোদমে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল।

১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে অবসরে গেলেন ড. ব্রহ্ম প্রকাশ। ভিএসএসসিতে তিনি সব সময় ছিলেন আমার বিক্ষুব্ধ জলস্রোতে বিশ্বস্ত নোঙ্গর।

www.pathagar.com

দলীয় মনোবল বিষয়ে তার বিশ্বাস অনুপ্রাণিত করেছিল এসএলভি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্টদের, পরে এই ব্যবস্থাপনা প্যাটার্ন সারা দেশের বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলোয় একটা ব্লু-প্রিন্টে পরিণত হয়েছিল। ড. ব্রহ্ম প্রকাশ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী পরামর্শক, যিনি আমাকে দিয়েছিলেন মূল্যবান পথ-নির্দেশ।

অধ্যাপক সারাভাইয়ের কাছ থেকে আমি যে প্রলক্ষণ পেয়েছিলাম তাতে ড. ব্রহ্ম প্রকাশ নতুন শক্তি জুগিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, তাতে নতুন মাত্রা যোগ করতেও তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমাকে তাড়াহুড়ার বিরুদ্ধে সব সময় সাবধান করে দিতেন। 'বড় বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হচ্ছে পর্বতের মত, সেখানে উঠতে হবে যত কম চেষ্টায় সম্ভব এবং কোনও রকম তাড়াহুড়া না করে। তোমার নিজের প্রকৃতির বাস্তবতা নির্ধারণ করবে তোমার গতি। যদি তুমি অস্থির হও, গতি বাড়াও। যখন পীড়িত থাকবে, গতি কমাও। তোমাকে পর্বতে আরোহণ করতে হবে একটা সমভার অবস্থায়। তোমার প্রকল্পের প্রতিটা কাজ সমাপ্তির জন্য না হয়ে অনন্য ঘটনা হয়ে উঠবে, তখন তুমি তা চমৎকার ভাবে তা করতে পারবে।' তিনি আমাকে বলেছিলেন। ড. ব্রহ্ম প্রকাশের উপদেশ প্রতিধ্বনিত হয় ব্রহ্মাকে নিয়ে লেখা এমারসনের কবিতায় ঃ

If the red slayer think he slays,
Or, if the slain think he is slain,
They know not well, the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

শুধু অজানা কোনও ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকা উপরিগত ব্যাপার। এটা হল পার্শ্বস্থিত স্থান বাদ দিয়ে পাহাড় চূড়ায় ওঠা। পাহাড়ের পার্শ্বদেশই জীবনকে টিকিয়ে রাখে, চূড়া নয়। এখানেই সব কিছু জন্মায়, অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, টেকনোলজির দক্ষতা শেখা যায়। চূড়ার গুরুত্ব হল, সে পার্শ্বদেশকে স্থির রাখে। তাই আমি চূড়ার দিকে যাচ্ছিলাম, তবে পার্শ্বদেশের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। আমাকে যেতে হবে অনেক দূর, কিন্তু আমি তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলাম না। আমি যাচ্ছিলাম ছোট ছোট পা ফেলে— ঠিক এক পা এক পা করে— কিন্তু প্রতিটা পদক্ষেপেই চূড়ার দিকে।

প্রতিটা পর্যায়েই এসএলভি-৩ দল আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিল কিছু অনন্যসাধারণ সাহসী মানুষের দ্বারা। সুধাকর ও শিবরামকৃষ্ণনের পাশাপাশি আরও ছিলেন শিবকামিনাথন। এসএলভি-৩ এর ইন্টিগ্রেশনের জন্য ত্রিবান্দ্রাম থেকে এসএইচএআরে সি-ব্যান্ড ট্রান্সপোন্ডার হচ্ছে একটা ডিভাইস যা রকেট সিস্টেমে যুক্ত করা হয় রাডার সংকেত দেওয়ার জন্য, উৎক্ষেপণস্থল থেকে চূড়ান্ত ইম্প্যাক্ট পয়েন্ট পর্যন্ত ভেহিকল ট্র্যাক করার পক্ষে যা যথেষ্ট শক্তিশালী। এসএলভি-৩ উৎক্ষেপণ শিডিউল নির্ভরশীল ছিল এই যন্ত্রের আগমন ও ইন্টিগ্রেশনের ওপর। যে বিমানে চড়ে শিবকামি আসছিল সেটা মাদ্রাজ বিমান বন্দরে অবতরণ করতে

www.pathagar.com

গিয়ে বেকায়দায় পড়ে স্কিড করল আর রানওয়েতে আছড়ে পড়ল। বিপুল ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল বিমানটি। এমারজেন্সি এগজিট দিয়ে সবাই লাফিয়ে নেমে গেল, নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা বেপরোয়া চেষ্টা চালাচ্ছিল— কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম শিবকামি, তার মালপত্র থেকে ট্রান্সপোন্ডারটা সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত সে বিমান ত্যাগ করল না। সর্বশেষ যে ক'জন ব্যক্তি ধোঁয়ার ভিতর থেকে অবশেষে বেরিয়ে এল, অন্যরা সবাই ছিল বিমানের ক্রু, তাদের একজন ছিল সে এবং ট্রান্সপোন্ডারটা বুকে চেপে ধরে রেখেছিল।

সেইসব দিনের আরও একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেটা এসএলভি-৩ অ্যাসেম্বলি ভবনে অধ্যাপক ধাওয়ানের ভিজিটের সঙ্গে সম্পর্কিত। অধ্যাপক ধাওয়ান, মাধবন নায়ার ও আমি আলোচনা করছিলাম এসএলভি-৩ ইন্টিগ্রেশনের কিছু অপেক্ষাকৃত ভাল অবয়ব নিয়ে। ভেহিকলটা লঞ্চারের ওপর রাখা ছিল আনুভূমিক অবস্থায়। আমরা যখন চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আর পরীক্ষা করছিলাম ইন্টিগ্রেটেড হার্ডঅয়ারের দ্রুত সাধনযোগ্যতা, তখন আমি লক্ষ্য করলাম দুর্ঘটনা ঘটলে আগুন নেভানোর জন্য বড় ওয়াটার পোর্ট রাখা হয়েছে। কোনও কারণে, লঞ্চারে এসএলভি-৩ এর দিকে মুখ করে রাখা পোর্টগুলো দেখে আমি অস্বস্তি অনুভব করলাম। আমি মাধবনকে পরামর্শ দিয়ে বললাম, পোর্টের মুখ ১৮০ ঘুরিয়ে রাখতে পারি আমরা বিপরীত দিকে। এতে করে হঠাৎ পানি বেরিয়ে রকেটের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রোধ করা যাবে। মাধবন নায়ার পোর্টের মুখ রকেটের বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে রাখার কয়েক মিনিটের মধ্যে, আমাদের বিস্মিত করে দিয়ে, প্রচন্ড গতিতে পানির তোড় বেরিয়ে এল পোর্ট থেকে। ভেহিকল সেফটি অফিসার অগ্নিনির্বাপণ পদ্ধতির কাজ নিশ্চিত করেছিল, কিন্তু সে উপলব্ধি করতে পারেনি যে এতে রকেট ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এটা ছিল দূরদর্শিতার একটা শিক্ষা। না কি আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম ঐশ্বরিক মহিমায়?

১৯৮০ সালের ১৭ জুলাই দ্বিতীয় এসএলভি-৩ উৎক্ষেপণের ৩০ ঘন্টা আগে, সব ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রগুলো। একটি কাগজে লেখা হল, 'প্রকল্প পরিচালক নিখোঁজ, যোগাযোগের জন্য তাকে পাওয়া যায়নি।' অধিকাংশ সংবাদে বর্ণনা করা হয়েছিল প্রথম এসএলভি-৩ এর ইতিহাস, আর জ্বালানি সংকটের কারণে কিভাবে তৃতীয় স্টেজ প্রজ্বলিত হতে ব্যর্থ হয়েছিল আর সমুদ্রে নাক থুবড়ে পড়েছিল রকেট সেই কাহিনী। কোনও কোনও কাগজে এসএলভি-৩ এর সামরিক কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনা হাইলাইট করা হল। আমি জানতাম আগামীকালের উৎক্ষেপণে নির্ধারিত হতে যাচ্ছে ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির ভবিষ্যৎ। বস্তুত, সাদামাটা কথায়, সমগ্র জাতির দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল আমাদের ওপর।

পরবর্তী দিনের প্রথম ভাগে, ১৮ জুলাই ১৯৮০—০৮০৩ ঘন্টায় ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল এসএলভি-৩ উৎক্ষিপ্ত হল এসএইচআর থেকে। টেক-অফের আগে ৬০০ সেকেন্ডে আমি দেখলাম কম্পিউটার ডাটা দিচ্ছে,

www.pathagar.com

রোহিনী স্যাটেলাইটকে (পেলোড হিসেবে বাহিত) কক্ষপথে প্রবেশ করাতে প্রয়োজন মত বেগমাত্রা প্রয়োগ করছে স্টেজ ৪। পরবর্তী দুই মিনিটের মধ্যেই রোহিনী নিজ কক্ষ-পথে স্থাপিত হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণ শুরু করল। কর্কশ আওয়াজের মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো আমি উচ্চারণ করলাম, 'মিশন ডিরেক্টর মনোযোগ আকর্ষণ করছি সমস্ত স্টেশনের। একটা জরুরি ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। মিশনের চাহিদামত কাজ করেছে সমস্ত স্টেজ। চতুর্থ স্টেজ অ্যাপোজি মোটর প্রয়োজন মত বেগমাত্রা প্রয়োগ করেছে রোহিনী স্যাটেলাইটকে কক্ষপথে স্থাপন করতে।' আনন্দ ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল সবখানে। আমি যখন ব্লক হাউজ থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আমার তরুণ সহকর্মীরা আমাকে তাদের কাঁধে তুলে নিল আর এগিয়ে চলল মিছিল করে।

গোটা জাতি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। যে সব রাষ্ট্র স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সামর্থ্য রাখে তাদের সংখ্যা খুবই কম, আর সেই নগন্যসংখ্যক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এখন ভারতের নামও অন্তর্ভুক্ত হল। সংবাদপত্রগুলো এ ঘটনাকে শিরোনাম করে সংবাদ পরিবেশন করল। রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত হল বিশেষ অনুষ্ঠান। ডেস্ক চাপড়ে অভিনন্দন জানাল পার্লামেন্ট। এটা ছিল একই সাথে জাতীয় স্বপ্নের বাস্তবায়ন, আর আমাদের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সূচনা। অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান, আইএসআরওর চেয়ারম্যান, তার রীতিমাফিক কথাবার্তার সতর্কতা হাওয়ায় ছুড়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, মহাকাশে স্থান নেওয়ার বিষয়টি এখন আমাদের সাধ্যের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কেব্‌ল করে তার অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের— প্রত্যেকেই গর্বিত হয়েছিল এই একশ'ভাগ দেশীয় প্রচেষ্টায়।

আমার অভিজ্ঞতা হল মিশ্র অনুভূতির। সাফল্য অর্জনে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম, যা কৌশলে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল গত দুই দশক ধরে ; কিন্তু আমি ব্যথিত হয়েছিলাম, কারণ যারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তারা কেউ আর বেঁচে ছিলেন না আমার আনন্দ ভাগ করে নেবার জন্য— আমার বাবা, আমার ভগ্নিপতি জালালুদ্দিন, এবং অধ্যাপক সারাভাই।

এসএলভি-৩ এর সফল উৎক্ষেপণের কৃতিত্ব প্রথমে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির মহানায়কদের, সুনির্দিষ্টভাবে অধ্যাপক সারাভাইয়ের ; তারপর ভিএসএসসির কয়েকশ' কর্মিবৃন্দের, এবং অধ্যাপক ধাওয়ান ও ড. ব্রহ্ম প্রকাশের।

সেই সন্ধ্যায় আমাদের রাতের খাবার খেতে দেরি হল। ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে এল উৎসবের আনন্দধ্বনি। আমি প্রায় শক্তিহীন ভাবে বিছানায় গেলাম। খোলা জানলা দিয়ে আমি মেঘের ভিতর চাঁদ দেখতে পেলাম। শ্রীহরিকোটা দ্বীপে আজ সমুদ্রের বাতাস মনে হল প্রতিফলন ঘটাচ্ছে প্রাণবন্ততা।

এসএলভি-৩ এর সাফল্যের এক মাসের মধ্যে আমি এক দিনের জন্য গেলাম বোম্বাইয়ে অবস্থিত নেহরু বিজ্ঞান কেন্দ্রে। সেখানে এসএলভি-৩ এর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল আমাকে। সেখানেই আমাকে দিল্লী থেকে

www.pathagar.com

ফোন করলেন অধ্যাপক ধাওয়ান। পরদিন সকালে তার সঙ্গে যোগ দিতে বললেন। প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথা ছিল। নেহরু কেন্দ্রে আমার আমন্ত্রণকারীরা আমাকে দিল্লীর টিকেট জোগাড় করে দিলেন, কিন্তু আমার একটা ছোট সমস্যা ছিল। সেটা পোশাকের। আমি অভ্যাসমত একেবারে ক্যাজুয়াল পোশাক পরতাম আর স্লিপার— এটিকেটের বিচারে কোনও ভাবেই অমন পোশাকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় না! এ সমস্যার কথা যখন বললাম অধ্যাপক ধাওয়ানকে, তিনি আমাকে পোশাক নিয়ে উৎকণ্ঠিত হতে নিষেধ করলেন। 'সাফল্যের সুন্দরতম পোশাকে আপনি আবৃত', তিনি সরস জবাব দিলেন।

অধ্যাপক ধাওয়ান ও আমি পার্লামেন্ট ভবন অ্যানেক্সে উপস্থিত হলাম পরদিন সকালে। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পার্লামেন্টারি প্যানেলের একটা মিটিং নির্ধারিত ছিল। কামরায় লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রায় ৩০ জন সদস্য ছিলেন, আর সেখানে জ্বলছিল বিশাল এক ঝাড়বাতি। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এমজিকে মেনন ও ড. নাগ চৌধুরী। শ্রীমতি গান্ধী এসএলভি-৩ এর সাফল্য সম্পর্কে সদস্যদের বললেন আর আমাদের অর্জনকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। অধ্যাপক ধাওয়ান দেশের মহাশূন্য গবেষণায় উৎসাহদানের জন্য সমবেতদের ধন্যবাদ জানালেন আর আই এসআরওর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অকস্মাৎ আমি দেখতে পেলাম শ্রীমতি গান্ধী আমাকে লক্ষ্য করে হাসি মুখে বলছেন, 'কালাম! আমরা আপনার কথা শুনতে চাই।' অধ্যাপক ধাওয়ান সমবেতদের উদ্দেশ্যে আগেই যেহেতু বক্তৃতা দিয়েছেন, তাই আমি অবাক হলাম এই অনুরোধে।

ইতস্তত করে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এই সমাবেশে উপস্থিত হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমি একটা জিনিসই জানি যে আমাদের দেশে কিভাবে একটা রকেট নির্মাণ করতে হবে, যা দেশে তৈরি স্যাটেলাইট স্থাপন করতে পারবে, ঘন্টায় ২৫০০০ কিলোমিটার বেগমাত্রা প্রয়োগ করে।' বজ্রধ্বনির মত হাততালি পড়তে লাগল। এসএলভি-৩ এর মত একটা প্রকল্পে কাজ করার আর আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রমাণের সুযোগ দেওয়ার জন্য সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানালাম আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল সমস্ত কক্ষ।

সাফল্যের সঙ্গে এসএলভি-৩ প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর, ভিএসএসসির দরকার হয়ে পড়ল লক্ষ্য পুনর্নির্ধারণ ও সম্পদ পুনর্গঠনের। আমি প্রকল্পের কাজ থেকে অবসর চেয়েছিলাম। আমার দলের বেদ প্রকাশ স্যান্ডলাসকে এসএলভি-৩ কন্টিনুয়েশন প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক করা হল। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল একই শ্রেণীর অপারেশনাল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল তৈরি করা। নির্দিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাহায্যে এসএলভি-৩ এর আরও উন্নতির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু সময়ের জন্য কাজ করা হচ্ছিল অগমেন্টেড স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (এএসএলভি) নিয়ে। লক্ষ্য ছিল এসএলভি-৩ এর পেলোড বহনের ক্ষমতা ৪০ কেজি থেকে ১৫০ কেজিতে উন্নীত করা। আমার দলের এমএসআর দেবকে এএসএলভির প্রকল্প পরিচালক করা হল। সান-সিনক্রোনাস অর্বিট (৯০০ কিলোমিটার)-এ

www.pathagar.com

পৌঁছাতে একটা পিএসএলভি তৈরির প্রয়োজন হয়েছিল। জিও স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (জিএসএলভি) নিয়েও বিবেচনা করা হচ্ছিল, যদিও সেটা ছিল অনেক দূরের স্বপ্ন। আমাকে অ্যারোস্পেস ডাইনামিক্স অ্যান্ড ডিজাইন গ্রুপের পরিচালক নিযুক্ত করা হল, যাতে করে আমি লঞ্চ ভেহিকল গঠন করতে পারি আর প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে পারি।

ভিএসএসসির বিদ্যমান অবকাঠামো ভবিষ্যৎ লঞ্চ ভেহিকল সিস্টেমের আয়তন ও ওজনের পক্ষে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দরকার ছিল উচ্চতর বিশেষায়িত স্থাপনা। ভিএসএসসির সম্প্রসারিত কর্মকান্ডের জন্য নতুন স্থান ঠিক করা হল ভাট্টিয়ুরকাভু ও ভালিয়ামালায়। ড. শ্রীনিবাসন একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করলেন এই স্থাপনাগুলোর। ইতিমধ্যে, শিবাথানু পিল্লাইয়ের সঙ্গে মিলে আমি একটা অ্যানালিসিস করলাম এসএলভি-৩ ও এর থেকে জাত অন্যান্য নমুনার প্রয়োগ সম্পর্কে। মিসাইল ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান দুনিয়ার লঞ্চ ভেহিকলের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছিল সেটা। আমরা দেখালাম যে, এসএলভি-৩ সলিড রকেট সিস্টেম নিকট ও মধ্যম পাল্লার (৪০০০ কিলোমিটার) পেলোড ডেলিভারি ভেহিকলের জাতীয় চাহিদা পূরণ করবে। এসএলভি-৩ সাবসিস্টেমে ৩৬ টন প্রপেল্যান্টের সাথে ১.৮ মিটার ডায়ামিটারের একটা অতিরিক্ত সলিড বুস্টার জুড়ে দিতে পারলে আইসিবিএম-এর চাহিদাও (১০০০ কেজি পেলোডের জন্য ৫০০০ কিলোমিটার ঊর্ধ) পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রস্তাব কখনও বিবেচনা করা হয়নি। তাসত্ত্বেও এটা রি-এন্ট্রি এক্সপেরিমেন্ট (আরইএক্স) রূপদানের পথ করে দিয়েছিল, যার থেকে পরে সৃষ্টি হয় *অগ্নি*।

পরবর্তী এসএলভি-৩ ফ্লাইট, এসএলভি-৩—ডি১, উৎক্ষেপণ করা হয় ১৯৮১ সালের ৩১ মে। দর্শকদের গ্যালারি থেকে এই ফ্লাইট আমি অবলোকন করলাম। এই প্রথমবার আমি কন্ট্রোল সেন্ট্রালের বাইরে বসে উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করলাম। একটা তিক্ত সত্যের মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছিল যে, সংবাদ-মাধ্যমের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ায় আমার ব্যাপারে আমার কয়েকজন সিনিয়র সহকর্মীর মনে ঈর্ষা জেগেছিল, যারা সবাই সমানভাবে অবদান রেখেছিলেন এসএলভি-৩ এর সাফল্যে। নতুন পরিবেশের শীতলতায় আমি কি আহত হয়েছিলাম? হয়তো হ্যাঁ, কিন্তু যা পরিবর্তন করতে পারব না তা গ্রহণ করতে আমার আপত্তি ছিল না।

অন্যদের লাভে ভাগ বসিয়ে আমি জীবন ধারণ করি না। আমার প্রকৃতির মধ্যেই ও জিনিস নেই। নির্মম মুনাফাখোর আমি নই। এসএলভি-৩ জোর খাটিয়ে বা স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্তে তৈরি হয়নি, বরং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে। তাহলে কেন এই তিক্ততা? এটা কি ভিএসএসসির শীর্ষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল, না কি এক সর্বজনীন বাস্তবতা? একজন বিজ্ঞানী হিসেবে, বাস্তবতার কারণ খুঁজে বের করার শিক্ষাই আমি পেয়েছিলাম। বিজ্ঞানে বাস্তবতা হল তাই যার অস্তিত্ব আছে এবং যেহেতু এই তিক্ততা ছিল বাস্তব, সুতরাং এর কারণ আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু এই ধরনের কোনও কিছুর কি কারণ থাকে?

www.pathagar.com

আমার এসএলভি-পরবর্তী অভিজ্ঞতা কি আমাকে কোনও সংকটজনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল? হ্যাঁ আর না। হ্যাঁ, কারণ এসএলভি-৩ এর গৌরবের অধিকারী সবাই হয়নি। না, কারণ কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনও পরিস্থিতি কেবল তখনই সংকটজনক বলে বিবেচনা করা যাবে, যখন তার সত্তার প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে উঠবে। এবং নিশ্চয়ই সে রকম ছিল না ঘটনা। বস্তুত দ্বন্দ্বের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মূল আইডিয়ার ওপর। অতীতের দিকে তাকিয়ে, আমি শুধু বলতে পারি পুনরারম্ভ আর বাস্তবায়নের বিশাল এক প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আমি পূর্ণ সচেতন ছিলাম।

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে এসএলভি-৩ বিষয়ে একটা বক্তৃতা দেবার জন্য দেরাদুনে আমন্ত্রণ জানালেন হাই অ্যাল্টিচিউড ল্যাবরেটরির [এখন ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশন্স ল্যাবরেটরি (ডিইএল)] ড. ভগীরথ রাও। প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক রাজা রামান্না সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, তিনি ছিলেন তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। তিনি পরমাণু শক্তি সঞ্চালনে ভারতের চেষ্টা ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। যেহেতু এসএলভি-৩ এর সঙ্গে আমি ওতপ্রোত জড়িত ছিলাম, সুতরাং এ নিয়ে আমাকে বিস্তারিত বলতে হবে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। পরে, অধ্যাপক রাজা রামান্না একটা ব্যক্তিগত চা-চক্রে আমাকে আমন্ত্রণ জানান।

অধ্যাপক রামান্নার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রথম যে ব্যাপারটা আমাকে চমকিত করেছিল, তাহল আমার সাক্ষাৎ পাওয়ায় তার অনাবিল আনন্দ। তার কথাবার্তায় ছিল সহজ-স্বাভাবিকতা, বিলম্বহীন ও সহানুভূতিশীল বন্ধু ভাবাপন্নতা। এই সন্ধ্যায় আমার মনে ভেসে উঠেছিল অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি—মনে হয় এইতো যেন গতকালের ব্যাপার। অধ্যাপক সারাভাইয়ের জগৎ ভিতরে ছিল সাদামাটা আর বাইরে ছিল সহজ। তার সাথে আমরা যারা কাজ করেছি, সবাই পরিচালিত হয়েছি এক মন নিয়ে, সৃষ্টির একাগ্রচিত্ততায়। সারাভাইয়ের জগৎ ছিল আমাদের স্বপ্নের পরিমাপে গঠিত।

কিন্তু আমার জগতে সরলতা বলতে আর কিছু ছিল না। এটা পরিণত হয়েছিল ভিতরে জটিল আর বাইরে প্রতিবন্ধক। রকেট বিজ্ঞানে ও দেশীয় রকেট তৈরির লক্ষ্য পূরণে আমার প্রচেষ্টা বাইরের বাধাবিপত্তিতে ব্যাহত হয়েছিল আর অভ্যন্তরীণ দোদুল্যমানতায় জটিল হয়েছিল। সামনে এগিয়ে যাবার জন্য আমার ইচ্ছার বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন ছিল আর তাতে আমি সচেতন ছিলাম। আমার অতীতের সাথে বর্তমানের সমন্বয় ইতিমধ্যেই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আমার বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের সমন্বয় আমার মনে সর্বাগ্রে স্থান নিয়ে ছিল যখন আমি অধ্যাপক রামান্নার চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম।

তিনি আসল বিষয়ে আসতে বেশি সময় নিলেন না। ডিআরডিএলে নারায়ণন ও তার দলের বিপুল সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও *ডেভিল* ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি বন্ধ রাখা হয়েছিল। সামরিক রকেটের পুরো কর্মসূচি গুটিয়ে যাচ্ছিল অটল অনীহার নিচে। ডিআরডিওর প্রয়োজন তাদের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির কমান্ড নিতে পারবে এমন এক

www.pathagar.com

ব্যক্তি, এই কর্মসূচি কিছুদিন ধরে পড়ে ছিল ড্রয়িং বোর্ডের মধ্যেই। অধ্যাপক রামান্না আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ডিআরডিএলে যোগ দিতে এবং তাদের গাইডেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রগ্রাম (জিএমডিপি) রূপায়নের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিতে ইচ্ছুক কি না। অধ্যাপক রামান্নার প্রস্তাবে আমি আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়লাম।

আমাদের রকেটবিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগের এমন সুযোগ আমি আর কবে পেতাম?

অধ্যাপক রামান্না আমাকে যে রকম উচ্চমূল্য বলে গণ্য করেছিলেন তাতে আমি সম্মানিত বোধ করলাম। পোখারান পারমাণবিক পরীক্ষার পিছনে তিনি ছিলেন উজ্জীবনী শক্তি, এবং বহির্বিশ্বে প্রাযুক্তিক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে তার অবদানের কথা ভেবে আমি রোমাঞ্চিত হই। আমি যে তার কথা প্রত্যাখ্যান করতে পারব না, তা জানতাম। অধ্যাপক রামান্না আমাকে পরামর্শ দিলেন এ ব্যাপারে অধ্যাপক ধাওয়ানের সঙ্গে কথা বলতে, যাতে করে তিনি আইএসআরও থেকে ডিআরডিএলে আমাকে বদলির ব্যবস্থা নিতে পারেন।

অধ্যাপক ধাওয়ানের সঙ্গে আমি দেখা করলাম ১৪ জানুয়ারি ১৯৮১ তারিখে। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনলেন, তার সবকিছু সতর্কতার সঙ্গে মাপার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে, যাতে করে কোনও পয়েন্ট মিস না করেন। তার অভিব্যক্তিতে লক্ষ্যণীয় আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'আমার লোকের কাজের যে মুল্যায়ন তারা করেছে তাতে আমি খুশি।' তিনি তারপর হাসলেন। অধ্যাপক ধাওয়ানের মত হাসতে কাউকে দেখিনি কখনও— যেন এক কোমল শাদা মেঘদল— যেমন ইচ্ছা তেমন আকারে এর ছবি তুমি কল্পনা করতে পার।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম কি ভাবে এগোব। 'আমি কি ওই পদের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন জানাব, যাতে করে ডিআরডিএল নিয়োগপত্র পাঠাতে পারে?' অধ্যাপক ধাওয়ানের কাছে আমি জানতে চাইলাম। 'না। তাদের ওপর চাপ দেওয়ার দরকার নেই। নতুন দিল্লীতে আমার পরবর্তী সফরের সময় টপ-লেভেল ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে কথা বলব।' অধ্যাপক ধাওয়ান বললেন। 'আমি জানি আপনার একটা পা সব সময়ই ডিআরডিওতে দিয়ে রেখেছেন, এখন আপনার পুরো মধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র তাদের দিকে আপনাকে টেনে নিতে চাইছে।' অধ্যাপক ধাওয়ান যা বলছিলেন তার মধ্যে সত্যের উপাদান হয়তো ছিল, কিন্তু আমার হৃদয়খানা সব সময়ই ছিল আইএসআরওতে। তিনি কি তা সত্যিই বুঝতে পারেননি?

১৯৮১ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস আনন্দময় বিস্ময় নিয়ে এল। ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অধ্যাপক ইউআর রাও-এর সচিব মহাদেবন দিল্লী থেকে ফোন করে জানালেন, আমাকে পদ্মভূষণ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ফোনটি এল অধ্যাপক ধাওয়ানের কাছ থেকে, তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আমি যেন গুরুর কাছ থেকে অভিনন্দন পাওয়ার পরম সুখ অনুভব করলাম। অন্যদিকে অধ্যাপক ধাওয়ান পদ্ম বিভূষণ পুরস্কার পাওয়ায় দারুণ উল্লাস হল আমার, তাকে সর্বান্ত:করণে আমি

www.pathagar.com

অভিনন্দন জানালাম। তারপর ড. ব্রহ্ম প্রকাশকে ফোন করে ধন্যবাদ দিলাম। ড. ব্রহ্ম প্রকাশ আমার এই আনুষ্ঠানিক ভদ্রতায় আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'আমার অনুভূতি হচ্ছে যেন আমার সন্তান পুরস্কার পেয়েছে।' ড. ব্রহ্ম প্রকাশের স্নেহপরায়ণতা গভীর ভাবে আমাকে স্পর্শ করল, এতটা গভীর যে নিজের আবেগ আমি আর দমন করে রাখতে পারলাম না।

আমার ঘর আমি ভরে তুললাম বিসমিল্লাহ খাঁর সানাইয়ের সুরে। সে সুর আমাকে নিয়ে গেল আরেক সময়ে, আরেক জগতে। আমি চলে গেছি রামেশ্বরমে আর মাকে জড়িয়ে ধরেছি। আমার বাবা সযত্নে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছেন আমার চুলে। আমার প্রেরণাদাতা জালালুদ্দিন খবরটা ঘোষণা করছে মস্ক স্ট্রিটে জড়ো হওয়া লোকদের উদ্দেশ্যে। আমার বোন জোহরা আমার জন্য প্রস্তুত করছে বিশেষ মিষ্টান্ন। পক্ষী লক্ষ্মণা শাস্ত্রী আমার কপালে এঁকে দিচ্ছেন তিলক। ফাদার সলোমন পবিত্র ক্রুশ ধরে আমাকে আশীর্বাদ করছেন। আমি দেখতে পাই অধ্যাপক সারাভাই লক্ষ্য পূরণের তৃপ্তি নিয়ে হাসছেন—যার বীজ তিনি বপণ করেছিলেন কুড়ি বছর আগে, তা শেষ পর্যন্ত ডালপালা ছড়ান বৃক্ষে পরিণত হয়েছে আর সে বৃক্ষের ফল উপভোগ করছে ভারতের জনগণ।

আমার পদ্মভূষণ পুরস্কার প্রাপ্তি ভিএসএসসিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। অনেকে আমার আনন্দে শরিক হল, অনেকে ভাবল আমাকে অসঙ্গতভাবে প্রত্যভিজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আমার খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোগী ঈর্ষান্বিত হল। কিছু মানুষ কেন জীবনের মহান মূল্য দেখতে ব্যর্থ হয়? জীবনে সুখ, তৃপ্তি ও সাফল্য নির্ভর করে সঠিক পছন্দের ওপর, বিজয়ী পছন্দের ওপর। জীবনে অনেক শক্তি আছে যা তোমার পক্ষে ও বিরুদ্ধে কাজ করছে। ক্ষতিকর শক্তি থেকে কল্যাণকামী শক্তিকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে। আর এ দুয়ের মধ্যে সঠিকভাবে একটিকে বেছে নিতে হবে।

আমার ভিতরের একটা কণ্ঠস্বর বলল, অনেক দিন ধরে অনুভূত কিন্তু অবহেলিত পুনরারম্ভের সময় এসেছে। আমাকে স্লেট পরিষ্কার করে নতুন 'অংক' কষতে হবে। আগের অংকগুলো কি সঠিকভাবে কষা হয়েছিল? জীবনে নিজস্ব অগ্রগতির মূল্যায়ন নিজে করা খুব কঠিন কাজ। এখানে ছাত্রকে নিজেই প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হয়েছে, নিজেই সে সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হয়েছে আর নিজের তৃপ্তির জন্য তার মূল্যায়ন করতে হয়েছে। বিচার এক পাশে থাক, আইএসআরওতে আঠার বছর কাটিয়ে এখন সেখান থেকে চলে যাবার সময় মনে ব্যথা জাগবে না তা অসম্ভব। আর আমার ব্যথাতুর বন্ধুদের ক্ষেত্রে মনে হয়েছিল লিউইস ক্যারোলের কবিতার লাইনগুলোই সবচেয়ে উপযোগী ঃ

You may charge me with murder—
Or want of sense
(We are all of us weak at times) :
But the slightest approach to a false pretence
Was never among my crimes!

www.pathagar.com

৩

অর্ঘ্য

[১৯৮১—১৯৯১]

Let craft, ambition, spite,
Be quenched in Reason's night,
Till weakness turn to might,
Till what is dark be light,
Till what is wrong be right!

Lewis Carroll

www.pathagar.com

১০

এ সময় আমার চাকরি নিয়ে একটু কুশতাকুশতি শুরু হয়েছিল আইএসআরও এবং ডিআরডিওর মধ্যে। আইএসআরও আমাকে ছেড়ে দিতে খানিকটা ইতস্তত করছিল, অন্যদিকে ডিআরডিও আমাকে নিয়ে নিতে চাইছিল। অনেকগুলো মাস কেটে গেল, আর অনেক পত্র-বিনিময় হল আইএসআরও এবং ডিআরডিওর মধ্যে। অন্যদিকে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্য অনেকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল ডিফেন্স আরঅ্যান্ডডি এবং ডিপার্টমেন্ট অব স্পেসের সচিবালয়ের মধ্যে। ইতিমধ্যে অধ্যাপক রামান্না অবসর গ্রহণ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দপ্তর থেকে। অধ্যাপক রামান্নার জায়গায় এলেন ড. ভিএস অরুণাচলম, তখনও পর্যন্ত তিনি ছিলেন হায়দারাবাদে অবস্থিত ডিফেন্স মেটালার্জিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি (ডিএমআর এল)-এর পরিচালক। ড. অরুণাচলম তার আত্মবিশ্বাসের জন্য পরিচিত ছিলেন, আর তিনি জটিলতা ও বৈজ্ঞানিক আমলাতন্ত্রের অতিসূক্ষ্ম তারতম্য খুব সামান্যই পরোয়া করতেন। ইতিমধ্যে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে সময়কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমন আমার ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণাগারের দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে অধ্যাপক ধাওয়ানের সাথে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক ধাওয়ানকেও মনে হয়েছিল যেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের একটা নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ নেবার

www.pathagar.com

অপেক্ষায় আছেন। অবশেষে সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাকে ডিআরডিএলের পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল।

অধ্যাপক ধাওয়ান প্রায় সময়ই আইএসআরও সদরদপ্তরে আমার কামরায় আসতেন আর স্পেস লঞ্চ ভেহিকল প্রকল্প নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতেন। এমন এক মহান বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করা ছিল বিশাল এক সুবিধা। আমি আইএসআরও ছেড়ে যাবার আগে, অধ্যাপক ধাওয়ান আমাকে ২০০০ সাল নাগাদ ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির ওপর বক্তব্য দিতে বললেন। প্রায় গোটা ম্যানেজমেন্ট ও স্টাফ আমার বক্তব্য শোনার জন্য হাজির হয়েছিল, যেটা এক দিক থেকে ছিল ফেয়ারওয়েল মিটিং।

১৯৭৬ সালে আমার দেখা হয়েছিল ড. ভিএস অরুণাচলমের সাথে, এসএলভির ইনার্শিয়াল গাইডেন্স প্ল্যাটফর্মের জন্য অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন আমি ডিএমআরএলে গিয়েছিলাম সেই সময়। ড. অরুণাচলম ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং করেছিলেন, দেশে প্রথমবারের মত, অবিশ্বাস্য সংক্ষিপ্ত সময় দুই মাসে। তার যৌবনদীপ্ত শক্তি আর উদ্যম আমাকে চমৎকৃত করেছিল। এই তরুণ ধাতুবিদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মেটাল-মেকিং বিজ্ঞানকে মেটাল-ফর্মিং টেকনোলজিতে এবং সেখান থেকে আর্ট অব অ্যালয় ডেভলপমেন্ট-এ উন্নীত করেছিলেন। লম্বা ও সুঠাম দেহের অধিকারী ড. অরুণাচলম ছিলেন বৈদ্যুতিক চার্জ দেওয়া একটা ডায়নামোর মত। আমার কাছে তাকে মনে হত শক্তিশালী আচরণের একজন অগতানুগতিক ধাঁচের বন্ধু ভাবাপন্ন ব্যক্তি। সেই সাথে একজন অসাধারণ ওয়ার্কিং পার্টনার।

১৯৮২ সালের এপ্রিলে আমি ডিআরডিএলে গেলাম আমার কাজের জায়গার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। ডিআরডিএলের তৎকালীন পরিচালক এমএল বানসাল আমাকে সবখানে ঘুরিয়ে দেখালেন আর গবেষণাগারের সিনিয়র বিজ্ঞানীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডিআরডিএল কাজ করছিল পাঁচটা স্টাফ প্রজেক্ট ও ষোলটি কমপিটেন্স বিল্ড-আপ প্রজেক্ট নিয়ে। এছাড়াও তারা বেশ কিছু টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড কার্যক্রমের সাথেও জড়িত ছিল ; এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য ছিল, ভবিষ্যতে দেশীয় মিসাইল সিস্টেম উন্নয়নে অগ্রবর্তী সময় জিতে নেওয়া। আমি বিশেষ করে প্রভাবিত হলাম তাদের টুইন ৩০-টন লিকুইড প্রপেল্যান্ট রকেট ইঞ্জিন তৈরির চেষ্টা দেখে।

এরই মধ্যে মাদ্রাজের আন্না বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করল। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমি ডিগ্রি অর্জনের পর ইতিমধ্যে প্রায় কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। আন্না বিশ্ববিদ্যালয় রকেট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় আমি আনন্দিত হলাম, কিন্তু আমাকে সবচেয়ে যা বেশি আনন্দ দিয়েছিল তাহল একাডেমিক সার্কেলে আমাদের

www.pathagar.com

কর্মমূল্যের স্বীকৃতি। আমাকে উৎফুল্ল করে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হল অধ্যাপক রাজা রামান্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে।

১৯৮২ সালের ১ জুন তারিখে আমি যোগদান করলাম ডিআরডিএলে। শীগগিরই উপলব্ধি করলাম যে এই গবেষণাগার এখনও *ডেভিল* মিসাইল প্রজেক্টের উপসংহারেই তাড়িত হয়ে আছে। অনেক উৎকর্ষসম্পন্ন প্রফেশনাল তখনও হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিজ্ঞানীর কাজের নাড়ি হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে তার যেমন লাগে। ডিআরডিএলে সাধারণ মেজাজ আর কাজের ছন্দ আমার মনে পড়িয়ে দিয়েছিল স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ-এর কবিতা The Rime of the Ancient Mariner :

> Day after day, day after day.
> We stuck, nor breath, nor motion ;
> As idle as a painted ship.
> Upon a painted ocean.

আমি দেখলাম আমার সিনিয়র সহকর্মীরা প্রায় সবাই মুখ থুবড়ে পড়া আশার যন্ত্রণা নিয়ে জীবনযাপন করছে। একটা ব্যাপক ধারণা ছিল যে, এই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা প্রতারিত হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাদের দ্বারা। আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আশা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি জাগিয়ে তুলতে হলে *ডেভিল* কে অবশ্যই কবর দিতে হবে।

যখন প্রায় এক মাস পর তৎকালীন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল ওএস ডসন ডিআরডিএল সফরে এলেন, তখন সেটাকে আমি দলে যুক্তি প্রতিষ্ঠার একটা সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করলাম। ট্যাকটিক্যাল কোর ভেহিকল (টিসিভি) প্রকল্প বেশ কিছুদিন ধরে আগুনের ওপর ঝুলছিল। সাধারণ সাবসিস্টেমসহ এটা ছিল সিঙ্গল কোর ভেহিকল। সামরিক বাহিনীর চাহিদা ছিল একটা কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল, একটা অ্যান্টি-রেডিয়েশন এয়ার-টু-সারফেস মিসাইল যা নিক্ষেপ করা যাবে হেলিকপ্টার অথবা ফিক্সড উইং এয়ারক্র্যাফ্‌ট থেকে। অ্যাডমিরাল ডসনের কাছে আমি জোরালভাবে কোর ভেহিকলের ভূমিকা তুলে ধরলাম। আমি শুধু এর কারিগরি জটিলতাই ব্যাখ্যা করলাম তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে এর সামর্থ্যও ব্যাখ্যা করলাম ; এবং আমি হাইলাইট করলাম উৎপাদন পরিকল্পনা। আমার নতুন সহযোগীদের কাছে বার্তাটা ছিল স্পষ্ট ও পরিষ্কার— এমন কোনও কিছু তৈরি কর না যা তুমি বিক্রি করতে পারবে না পরে, এবং শুধু একটা জিনিস তৈরি করেই জীবন খরচ কর না। মিসাইল নির্মাণ একটা বহুমাত্রিক ব্যাপার— তুমি যদি একটা মাত্রাতেই থেকে যাও দীর্ঘকাল, তাহলে তুমি নিশ্চল হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ডিআরডিএলে আমার প্রথম কয়েক মাস ছিল ব্যাপকভাবে মিথস্ক্রিয়ামূলক। আমি সেন্ট জোসেফ'স-এ পড়েছিলাম যে, একটা ইলেকট্রন একটা ক্ষুদ্র কণা কিংবা ঢেউ হিসেবেও মনে হতে পারে, এটা নির্ভর করে ওই ইলেকট্রনের দিকে তুমি কিভাবে তাকাচ্ছ তার ওপর। তুমি যদি একটা ক্ষুদ্র প্রশ্ন কর, ওটা তোমাকে একটা ক্ষুদ্র উত্তর দেবে ; তুমি যদি ঢেউ প্রশ্ন কর, ওটা তোমাকে ঢেউ উত্তর দেবে। আমি শুধু আমাদের লক্ষ্যের কথাই বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিনি, ওগুলোকে আমাদের কাজ ও আমাদের সত্তার মধ্যে একটা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবেও দেখিয়েছি। এখনও আমার একটা মিটিঙে রোনাল্ড ফিশার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার কথা মনে আছে, 'এক টুকরো চিনিতে যে মিষ্টতার স্বাদ আমরা পাই, তা চিনির সম্পদ নয় আবার আমাদের সম্পদও নয়। চিনির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় আমরা মিষ্টতার অভিজ্ঞতা উৎপাদন করছি।'

একটা ভার্টিক্যাল রাইজ-টার্ন স্ট্রেইট লাইন ক্লাইম্ব-ব্যালিস্টিক পথে একটা সারফেস-টু-সারফেস মিসাইলের ওপর অতিশয় চমৎকার কাজ করা হয়েছিল সেই সময়। আমি ডিআরডিএলের জনশক্তির দৃঢ় প্রত্যয় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এরা তাদের পূর্ববর্তী প্রকল্পের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সামনে এগিয়ে যেতে দৃঢ় ছিল। আমি পর্যালোচনার আয়োজন করেছিলাম এর বিভিন্ন সাবসিস্টেমের জন্য যথাযথ বৈশিষ্ট্য আলাদা করতে। ডিআরডিওর অনেক পুরনো কর্মীর মনে আতংক সৃষ্টি করে আমি যেখানে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ পাওয়া যেতে পারে এমন সব স্থান থেকে লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করলাম, যেমন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট্স অব টেকনোলজি, কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, টাটা ইন্সটিটিউট এর ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমি অনুভব করেছিলাম, ডিআরডিএলের গুমোট কর্মকেন্দ্রগুলোয় তাজা বাতাসের প্রয়োজন। আমরা যদি জানলা পুরো খুলে দিই, তাহলে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আলো ভিতরে ঢুকতে শুরু করবে। আরও একবার কোলরিজের Ancient Mariner আমার মনে এল ঃ

Swiftly, swiftly flew the ship,
Riding gently the oncoming tide.

১৯৮৩ সাল শুরুর দিকে কোনও সময়ে অধ্যাপক ধাওয়ান ভিজিটে এলেন ডিআরডিএলে। প্রায় এক দশক আগে আমাকে দেওয়া তার উপদেশ আমি তাকেই স্মরণ করিয়ে দিলাম ঃ 'আপনার স্বপ্ন সত্যি হবার আগেই আপনাকে স্বপ্ন দেখতে হবে। কিছু লোক জীবনে যা চায় তার দিকে লাফিয়ে চলে ; অন্যরা তাদের অদল-বদল করে কিন্তু কখনও শুরু করতে পারে না কারণ তারা জানে

www.pathagar.com

না তারা কি চায় এবং এও জানে না কিভাবে পেতে হবে।' আইএসআরও ছিল ভাগ্যবান, কারণ অধ্যাপক সারাভাই ও অধ্যাপক ধাওয়ান তার হাল ধরেছিলেন— এমন নেতা যারা তাদের জীবনের চেয়ে মিশনকে বড় করে তুলেছিলেন, তারপর অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাদের গোটা জনশক্তিকে। ডিআরডিএল অতটা ভাগ্যবান ছিল না। এই অসামান্য গবেষণাগার একটা অগ্রভাগ কর্তিত ভূমিকা রেখেছিল যা এর অস্তিত্বের অথবা বিপুল সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটাত না, এমন কি সাউথ ব্লকে এর প্রত্যাশাও পূরণ করত না। আমার প্রচন্ড প্রফেশনাল কিন্তু খানিকটা হতবুদ্ধি দল সম্পর্কে আমি অধ্যাপক ধাওয়ানকে জানিয়ে ছিলাম। অধ্যাপক ধাওয়ান তার উত্তরে স্বভাবসুলভ হাসি হেসেছিলেন, যেমন ইচ্ছা তেমন তার অর্থ করা যেত।

ডিআরডিএলে আরঅ্যান্ডডি-এর গতি সঞ্চারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলোর ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আমার ক্যারিয়ার জুড়ে আমি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে খোলামেলা নীতি অনুসরণ করেছি। ম্যানেজমেন্ট রুদ্ধদ্বার আলোচনা ও গোপন বৈঠক করে যে সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে, আমি খুব কাছ থেকে তার ক্ষয় দেখতে পেয়েছি। আমি এ ধরনের চেষ্টার বিরোধীতা করেছি সব সময়। সুতরাং প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম তা হল সিনিয়র বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটা ফোরাম গঠন করা, যে ফোরামে যৌথ উদ্যোগ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হবে। এভাবে ডিআরডিএলের মধ্যেই একটা উঁচু পর্যায়ের বডি গঠন করা গেল, যাকে বলা হল মিসাইল টেকনোলজি কমিটি। এর ফলে ম্যানেজমেন্টের গবেষণাগারের কর্মতৎপরতার মধ্যে টেনে আনা গেল মধ্য স্তরের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের।

অনেক দিনের বিতর্ক ও অনেক সপ্তাহের চিন্তাভাবনা শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পরিণত হল দীর্ঘমেয়াদী 'গাইডেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রগ্রাম'। কোথাও আমি পড়েছিলাম, 'কোথায় যাচ্ছ তা জান। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কাজ এ নয় কোথায় আছি তা জানা, আসল ব্যাপার হল আমরা কোন দিকে যাচ্ছি।' দেশীয় মিসাইল উৎপাদনের জন্য একটা স্পষ্ট ও সুনির্ধারিত মিসাইল কর্মসূচি তৈরি করতে আমার সভাপতিত্বে একটা কমিটি গঠিত হল। এর সদস্য ছিলেন জেডপি মার্শাল, ভারত ডাইনামিক্স লিমিটেডের তৎকালীন প্রধান, এনআর আয়ার, একে কাপুর ও কেএস ভেঙ্কটরমন। ক্যাবিনেট কমিটি ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স (সিসিপিএ)-এর পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা একটা খশড়া তৈরি করলাম। এই খশড়া চূড়ান্ত করা হয়েছিল তিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর। আমরা খরচের হিসাব ধরেছিলাম প্রায় ৩৯০ কোটি রূপি, বারো বছর সময়কালের জন্য। ডেভলপমেন্ট প্রগ্রাম অধিকাংশ সময় আটকা পড়ে থাকে অর্থের অভাবে। আমরা অর্থ চেয়েছিলাম দুটো ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য— একটা লো-লেভেল কুইক রিঅ্যাকশন ট্যাকটিক্যাল কোর ভেহিকল এবং

www.pathagar.com

একটা মিডিয়াম রেঞ্জ সারফেস-টু-সারফেস উইপন সিস্টেম। আমরা একটা মাল্টি-টার্গেট হ্যান্ডলিং ক্ষমতাসম্পন্ন মাঝারি পাল্লার সারফেস-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেছিলাম দ্বিতীয় পর্যায়ে। ডিআরডিএল পরিচিত ছিল ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালনের জন্য। আমরা প্রস্তাব করলাম 'ফায়ার-অ্যান্ড-ফরগেট' ক্ষমতাসম্পন্ন একটা তৃতীয় প্রজন্মের ট্যাংক-বিধ্বংসী গাইডেড মিসাইল তৈরি করার। এই প্রস্তাবে খুশি ছিল আমার সমস্ত সহকর্মী। তারা দেখতে পেল, নতুন উদ্যমে কর্মতৎপরতা শুরু করার এটা একটা সুযোগ। তবে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমার আকাঙ্খা ছিল রি-এন্ট্রি এক্সপেরিমেন্ট লঞ্চ ভেহিকল (আরইএক্স)-এর স্বপ্ন পুনরুজ্জীবিত করা। আমার সহকর্মীদের পরামর্শ দিলাম তাপ-নিরোধক ডিজাইনে ব্যবহারের জন্য ডাটা তৈরির একটা টেকনোলজি ডেভলপমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ করতে। ভবিষ্যতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল এই তাপ-নিরোধক।

সাউথ ব্লকে আমি পরিকল্পনা উপস্থাপনার একটা আয়োজন করলাম। এতে সভাপতিত্ব করলেন সেই সময়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমন এবং উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধানরা ঃ জেনারেল কৃষ্ণ রাও, এয়ার চিফ মার্শাল দিলবাগ সিং এবং অ্যাডমিরাল ডসন। কেবিনেট সচিব কৃষ্ণ রাও সাহিব, প্রতিরক্ষা সচিব এসএম ঘোষ ও সচিব (ব্যয়) আর গণপতিও উপস্থিত ছিলেন। সবাইকেই মনে হচ্ছিল সব রকম সন্দেহে ভুগছেন— আমাদের সামর্থ্য সম্পর্কে, চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর প্রাপ্তিসাধ্যতা ও সাধনযোগ্যতা সম্পর্কে, টিকে থাকার সক্ষমতা, সময়সূচি ও ব্যয় সম্পর্কে। ড. অরুণাচলম পুরো প্রশ্নোত্তর পর্বে পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার পাশে। যদিও কয়েকজন আমাদের উচ্চাকাঙ্খী প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তবু প্রত্যেকেই, এমন কি সন্দেহবাদীরাও ভারতের মিসাইল সিস্টেমের কল্পনায় উদ্দীপনা অনুভব করেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভেঙ্কটরমন প্রায় তিন ঘন্টা পর সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমাদের দেখা করতে বললেন।

মধ্যবর্তী সময়টা আমরা গাণিতিক বিন্যাস ও সংখ্যার রাশি সৃষ্টির কাজ করে কাটালাম। তারা যদি মাত্র ১০০ কোটি রুপি মঞ্জুর করে, তাহলে ওই অর্থ আমরা বন্টন করব কিভাবে? ধরা যাক তারা আমাদের ২০০ কোটি রুপি দিল, তাহলে আমরা কি করব? প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে সন্ধ্যা বেলায় আমরা সাক্ষাৎ করলাম। আমার একটা অনুমান ছিল যে, যত অংকেরই হোক আমরা কিছু তহবিল পাব।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি যখন পরামর্শ দিলেন, মিসাইল তৈরি না করে আমরা একটা ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রগ্রাম চালু করব, তখন আমাদের কানকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পরামর্শে আমরা একেবারে বোবা-কালা হয়ে গিয়েছিলাম। দীর্ঘ বিরতির পর ড. অরুণাচলম উত্তর দিলেন, 'আমরা পুনরায় চিন্তা করে আপনার সঙ্গে দেখা করার আর্জি জানাচ্ছি, স্যার!' 'আপনারা আগামীকাল সকালে আসুন দয়া করে,' প্রতিরক্ষামন্ত্রী উত্তর দিলেন। অধ্যাপক সারাভাইয়ের প্রবল উৎসাহ ও স্বপ্নের কথা এতে মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই রাতে, ড. অরুণাচলম ও আমি এক সাথে মিলে আমাদের পরিকল্পনা আবার নতুন করে তৈরি করলাম।

আমাদের প্রস্তাবে কতকগুলো জরুরি বিষয় আমরা সম্প্রসারিত ও অন্তর্ভুক্ত করলাম। যোগ করলাম সব ধরনের পরিবর্তন, যেমন ডিজাইন, ফেব্রিকেশন, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, কোয়ালিফিকেশন, পরীক্ষামূলক ফ্লাইট, মূল্যনির্ধারণ, আপডেটিং, ইউজার ট্রায়াল, উৎপাদনশীলতা, মান, নির্ভরযোগ্যতা, আর আর্থিক সক্ষমতা। আমরা বিশদ করে দেখালাম ডিজাইন, ডেভলপমেন্ট ও উৎপাদন সহবর্তমানতার ধারণা, এবং ড্রয়িং-বোর্ড পর্যায় থেকেই ইন্সপেকশন এজেন্সি ও ইউজারের অংশগ্রহণের প্রস্তাব দিলাম। আমরা বহু বছরের উন্নয়মূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসার পর এখন *স্টেট-অব-দ্য-আর্ট* সিস্টেম অর্জনের জন্য একটা মেথোডোলজির পরামর্শও দিলাম। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আমরা সমকালীন ক্ষেপণাস্ত্রই দিতে চাই, বাতিল হয়ে যাওয়া কোনও অস্ত্র নয়। খুব উত্তেজনাকর একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের দিকে ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের এই পরিকল্পনার কাজটা শেষ করতে করতে সকাল হয়ে গেল। হঠাৎ নাশতার টেবিলে আমার মনে পড়ল, সন্ধ্যায় রামেশ্বরমে আমার ভাইঝি জামিলার বিয়ে আর আমার তাতে হাজির থাকার কথা। আমি ভাবলাম কোনও কিছু করার আর সময় নেই। দিনের আরও পরে যদি মাদ্রাজ ফ্লাইট ধরতেও পারি, সেখান থেকে রামেশ্বরমে পৌঁছাব কি ভাবে? মাদ্রাজ ও মাদুরাইয়ের মধ্যে কোনও বিমান যোগাযোগ ছিল না, মাদুরাই থেকে রামেশ্বরমে যেতে হত ট্রেনে। অপরাধের আর্দ্র ছায়া পড়ল আমার মনের ওপর। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, পরিবারের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি ও বাধ্যবাধকতা ভুলে যাওয়া কি সঙ্গত? জামিলা আমার কন্যারও অধিক। পেশাগত কারণে তার বিয়েতে থাকতে না পারার চিন্তাটা ছিল অত্যন্ত মর্মপীড়াদায়ক। নাশতা শেষ করে সাক্ষাতের জন্য আমি বেরিয়ে গেলাম।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভেঙ্কটরমনের সঙ্গে আমরা যখন সাক্ষাৎ করলাম আর আমাদের সংশোধিত প্রস্তাব দেখালাম, তখন দৃশ্যত তিনি আনন্দিত হলেন।

www.pathagar.com

মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের প্রস্তাব রাতারাতি পরিণত হয়েছিল একটা ইন্টিগ্রেটেড প্রগ্রামের ব্লু-প্রিন্টে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রতি আমার সম্মান রেখেই বলছি, আমি সত্যিই নিশ্চিত ছিলাম না যে তিনি আমাদের পুরো প্রস্তাব ক্লিয়ার করবেন কি না। কিন্তু তিনি করলেন। আমি অকল্পনীয় আনন্দিত হলাম!

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, সংকেত দিলেন মিটিং শেষ হয়ে গেছে। আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, ' যেহেতু আমি আপনাকে এখানে এনেছি, তাই আমি আশা করছিলাম এমন কোনও পরিকল্পনা নিয়ে আসবেন আপনি। আপনার কাজ দেখে আমি আনন্দিত।' ১৯৮২ সালে ডিআরডিএলের পরিচালক হিসেবে আমার নিয়োগ দানের রহস্য এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। তাহলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভেঙ্কটরমন আমাকে নিয়ে এসেছেন এখানে! তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে আমি দরোজার দিকে ঘুরলাম আর শুনতে পেলাম ড. অরুনাচলম এই সন্ধ্যায় রামেশ্বরমে অনুষ্ঠিতব্য জামিলার বিয়ের কথা বলছেন মন্ত্রীকে। বিষয়টা মন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করায় আমি বিস্মিত হলাম। সর্বময় ক্ষমতার সাউথ ব্লকে বসা তার মত একজন ব্যক্তি বহু দূরের এক দ্বীপে একটা ছোট্ট বাড়িতে একটা বিয়ের ব্যাপারে কেন উদ্বিগ্ন হবেন?

ড. অরুণাচলমের প্রতি সব সময়ই আমার উঁচু শ্রদ্ধা ছিল। আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাদ্রাজ ও মাদুরাইয়ের মধ্যে গমণকারী বিমানবাহিনীর একটা হেলিকপ্টারে আমার মাদুরাই যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের নিয়মিত ফ্লাইটে আমি মাদ্রাজ পৌঁছে বিমান থেকে নামা মাত্রই ওই হেলিকপ্টার আমাকে সেখান থেকে তুলে নেবে মাদুরাইয়ে পৌঁছে দেবার জন্য। দিল্লী থেকে বিমানটি ছেড়ে যাবে এক ঘন্টার মধ্যেই। ড. অরুণাচলম আমাকে বললেন, 'এটা আপনি অর্জন করেছেন গত ছয় মাসের কঠোর পরিশ্রমের জন্য।'

বিমানে মাদ্রাজের দিকে উড়ে যেতে যেতে আমার বোর্ডিং পাসের উল্টো দিকে আমি দ্রুত হাতে লিখলাম ঃ

Who never climbed the weary league—
Can such a foot explore
The purple territories
On Rameswaram's shore?

দিল্লী থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানটি মাদ্রাজ পৌঁছানোর সাথে সাথেই এর খুব কাছে ল্যান্ড করল বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার। পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি হেলিকপ্টারে চড়ে মাদুরাইয়ের পথে উড়ে চললাম। এয়ার ফোর্স

www.pathagar.com

কমান্ডান্ট আমাকে রেলস্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, সেখানে রামেশ্বরমগামী ট্রেনটা প্লাটফর্ম ছেড়ে যাবার উপক্রম করেছে তখন। জামিলার বিয়ের অনুষ্ঠানে ঠিক সময়েই আমি যোগ দিতে পেরেছিলাম সেদিন। পিতার ভালবাসা দিয়ে আমার ভাইয়ের মেয়েকে আমি আশীর্বাদ করেছিলাম।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমাদের প্রস্তাব ক্যাবিনেটে উপস্থাপন করলেন আর আগাগোড়া খতিয়ে দেখলেন। আমাদের প্রস্তাবের ওপর সুপারিশ গৃহীত হল এবং এই খাতে ৩৮৮ কোটি রুপি মঞ্জুর করা হল, যেটা ছিল নজিরবিহীন। এভাবেই জন্ম নিয়েছিল ভারতের মর্যাদাশীল ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রগ্রাম, পরবর্তীতে সংক্ষেপে বলা হত আইজিএমডিপি।

সরকারের মঞ্জুরি পত্র আমি যখন উপস্থাপন করলাম ডিআরডিএলের মিসাইল টেকনোলজি কমিটির সামনে, তখন সবাই যেন হর্ষে ফেটে পড়ল। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল ভারতের আত্মনির্ভরতার মর্ম অনুসারে। এভাবেই সারফেস-টু-সারফেস উইপন সিস্টেমের নাম দেওয়া হয় *পৃথ্বী*, ট্যাকটিক্যাল কোর ভেহিকলের নাম দেওয়া হয় *ত্রিশূল*। অন্যদিকে সারফেস-টু-এয়ার এরিয়া ডিফেন্স সিস্টেমের নাম হয় *আকাশ* এবং ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প *নাগ*। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন আরইএক্সের নাম দিয়েছিলাম *অগ্নি*। ড. অরুণাচলম এলেন ডিআরডিএলে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করলেন আইজিএমডিপি, ১৯৮৩ সালের ২৭ জুলাই। সেটা ছিল এক বিশাল ঘটনা। ডিআরডিএলের প্রতিটা কর্মি তাতে অংশ নিয়েছিল। ইন্ডিয়ান অ্যারোস্পেস রিসার্চের সাধারণ ব্যক্তিটাও আমন্ত্রিত হয়েছিল। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য গবেষণাগার ও প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক বিজ্ঞানী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকরা, সশস্ত্র বাহিনী, উৎপাদনকেন্দ্র ও ইন্সপেকশন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা, যারা এখন আমাদের কাজের অংশীদার হয়েছিলেন। সমস্ত আমন্ত্রিতদের জন্য একটা কক্ষের ব্যবস্থা করতে না পারায় আমরা তাদের মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত করেছিলাম ক্লোজ্ড-সার্কিট টিভি নেটওয়ার্ক বসিয়ে। আমার ক্যারিয়ারে এটা ছিল দ্বিতীয় সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। প্রথম দিনটি এসেছিল ১৯৮০ সালের ১৮ জুলাই, যেদিন এসএলভি-৩ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছিল রোহিনী রকেট।

www.pathagar.com

১১

আইজিএমডিপির উৎক্ষেপণ ছিল ভারতের বিজ্ঞান–আকাশে এক উজ্জ্বল ঝলক। ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিকে বিবেচনা করা হয়েছিল বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি রাষ্ট্রের জমিদারি হিসেবে। জনগণ কৌতূহলী ছিল যে আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা কিভাবে রক্ষা করি, সেই সময়ে ভারতের পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে। দেশে আইজিএমডিপির উজ্জ্বলতা ছিল বাস্তবিকই নজিরবিহীন। নির্ধারিত প্রকল্পগুলোও ছিল ভারতের আরঅ্যান্ডডি স্থাপনাগুলোর নমুনার বিচারে অসার কল্পনাপূর্ণ। আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম যে, কর্মসূচির জন্য মঞ্জুরি পাওয়া যাবে কেবল দশ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেও। চালিয়ে যেতে পারলে সেটা হবে একেবারেই আলাদা ব্যাপার। যত বেশি তোমার থাকবে, তবেশি তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এখন আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ আর স্বাধীনতা পেয়েছি সামনে এগিয়ে যাওয়ার। সুতরাং দলকে আমার সামনের দিকে চালাতে হবে এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

ডিজাইন থেকে মোতায়েন পর্যন্ত এই ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি বাস্তবায়নে কি প্রয়োজন হবে? বিপুল জনশক্তি ছিল সহজলভ্য ; অর্থ মঞ্জুর হয়েছে ; এবং কিছু অবকাঠামও বিদ্যমান। তাহলে অভাব কিসের? এই তিনটে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট ছাড়া একটা প্রকল্পের আর কি দরকার? আমার এসএলভি-৩ অভিজ্ঞতা থেকেই এর

www.pathagar.com

উত্তর আমার জানা ছিল। জটিল বিষয় হল মিসাইল টেকনোলজির ওপর প্রভুত্ব অর্জন করতে হবে। বিদেশ থেকে আমি কিছুই আশা করিনি। টেকনোলজি হচ্ছে গ্রুপ অ্যাকটিভিটি আর আমাদের সেই সব নেতা দরকার যারা তাদের হৃদয়-মন সঁপে দিতে পারবেন মিসাইল প্রগ্রামে, সেই সাথে আরও শত শত প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীকে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন নিজেদের সঙ্গে। আমি জানতাম, অসংখ্য পরস্পরবিরোধীতা আর হাস্যকর নিয়মনীতি মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের, অংশগ্রহণকারী গবেষণাগারগুলোয় যা প্রভাববিস্তার করে আছে। সরকারি খাতের ইউনিটগুলো মনে করে থাকে তাদের কর্মকুশলতা কখনও পরীক্ষিত হবে না, তাদের মধ্যে বিরাজমান এই মনোভাবের সঙ্গেও আমাদের মিথষ্ক্রিয়া করতে হবে। পুরো সিস্টেমকে— এর লোকবল, নিয়ম, অবকাঠামকে— বর্ধন করা জানতে হবে। আমরা এমন কিছু অর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা আমাদের যৌথ জাতীয় সামর্থ্যের বাইরে, এবং আমার এ ব্যাপারে কোনও অলীক ধারণা নেই যে, সঙ্গতি ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে আমার দল যতক্ষণ কাজ শুরু না করছে ততক্ষণ কিছুই অর্জিত হবে না।

ডিআরডিএলের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এখানে বিপুলসংখ্যক উঁচু প্রতিভাবান মানুষের সমাবেশ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের মধ্যে অনেকেরই অহংকার ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আত্মবিচারের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হবার মত যথেষ্ট পরিমাণ অভিজ্ঞতার অভাব ছিল তাদের। মোদ্দা কথা, তারা বেশ উৎসাহ সহকারে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অল্প কয়েকজনের নির্বাচিত কথার সঙ্গে একমত হত। তারা কোনও প্রশ্ন ছাড়াই বাইরের বিজ্ঞানীদের কথা বিশ্বাস করত।

ডিআরডিএলে একজন চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি ছিলেন এভি রঙ্গ রাও। তিনি ছিলেন অতিশয় স্পষ্ট আর তার ছিল প্রভাবদায়ক ব্যক্তিত্ব। তিনি সাধারণত চেক কোটের সঙ্গে লাল নেকটাই আর ঢোলা ট্রাউজার পরতেন। হায়দারাবাদের গরম আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি এগুলো পরতেন, যেখানে এমন কি ফুল হাতা শার্ট আর জুতোও পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হত। তার মুখে ছিল ঘন শাদা দাড়ি আর দাঁতের ফাঁকে তামাকের পাইপ। এই গিফটেড মানুষটার চারপাশে দেখা যেত দেহজ্যোতির আভা।

আমি মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে রঙ্গ রাওয়ের সাথে আলোচনা করলাম। রঙ্গ রাওয়ের অনেকগুলো মিটিং ছিল সেইসব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যারা দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি উন্নয়নে আমাদের দর্শনের অংশীদার ছিল। তিনি তাদের কাছে

www.pathagar.com

আইজিএমডিপির বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, গবেষণাগারকে একটা টেকনোলজি-ওরিয়েন্টেড স্ট্রাকচার হিসেবে পুনর্গঠিত করা হবে। প্রকল্পের জন্য দরকারি বিভিন্ন তৎপরতা পরিচালনার জন্য একটা মৌল কাঠাম তৈরি করা প্রয়োজন। চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে চারশ' বিজ্ঞানী মিসাইল কর্মসূচির কাজ শুরু করে দিলেন।

এই সময়ে আমার সামনে সবচেয়ে জরুরি কাজ ছিল স্বতন্ত্র মিসাইল প্রজেক্ট পরিচালনার জন্য প্রকল্প পরিচালক নির্বাচন করা। আমাদের বিপুলসংখ্যক প্রতিভাবান লোক ছিল বস্তুত, সম্পদের বাজার। প্রশ্ন হল কাকে বেছে নেব— একজন পরিকল্পনাকারী, একজন নিয়মের বশবর্তীহীন মানুষ, একজন একনায়ক না কি একজন দলীয় মানুষ? আমাকে খুঁজে নিতে হবে সঠিক নেতাকে যে পরিষ্কারভাবে লক্ষ্যের ছবি কল্পনা করতে পারবে, এবং তার দলের সদস্যদের শক্তি প্রবাহিত করতে পারবে স্বপ্ন-বাস্তবায়নে যারা কাজ করবে বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে তাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্যে।

খুব কঠিন এক খেলা, কিছু নিয়ম আমি শিখেছিলাম দুই দশক আইএসআরওর হাই প্রায়োরিটি প্রকল্পসমূহে কাজ করার সময়। ভুল নির্বাচন কর্মসূচির গোটা ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর সঙ্গে আমি চেয়েছিলাম এই পাঁচজন প্রকল্প পরিচালক প্রশিক্ষণ দেবেন অন্য পঁচিশজন প্রকল্প পরিচালককে ও আগামী দিনের দলনেতাদের।

আমার সিনিয়র সহকর্মীদের অনেকেই—তাদের নাম উল্লেখ করাটা ঠিক হবে না, কারণ তা হবে শুধুই আমার কল্পনা— এই সময়টায় আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের চেষ্টা করেন। আমি একজন নিঃসঙ্গ মানুষের জন্য তাদের উৎকণ্ঠার বিষয়টি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু কোনও রকম নিবিড় যোগাযোগ এড়িয়ে যাই। বন্ধুর প্রতি আনুগত্যের কারণে কোনও ব্যক্তি এমন কিছু করতে পারে যাতে প্রতিষ্ঠানের কোনও ভাল স্বার্থ থাকবে না।

হয়তো আমার বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ ছিল সম্পর্কের দাবি থেকে পালিয়ে থাকার বাসনা। রকেট তৈরির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনও কিছু বিশাল প্রতিবন্ধক বলে আমি মনে করি। আমি শুধু কামনা করতাম আমার জীবনধারায় সৎ থাকতে, আমার দেশে রকেট বিজ্ঞানকে ঊর্ধে তুলে ধরতে, আর স্বচ্ছ চেতনা নিয়ে অবসর গ্রহণ করতে। আমি কিছুটা সময় নিলাম এবং পাঁচটা প্রকল্প কারা পরিচালনা করতে পারবে তার সিদ্ধান্ত স্থির করতে প্রচুর ভাবলাম। সিদ্ধান্ত নেবার আগে অনেক বিজ্ঞানীর কর্মপন্থা পরীক্ষা করলাম। আমার মনে হয়, আমার কিছু পর্যবেক্ষণ তোমার চিত্তাকর্ষক মনে হবে। কোনও ব্যক্তির কর্মপন্থার মূল পরিচয় হল কিভাবে সে পরিকল্পনা করে আর কাজ সংগঠন করে। কেউ সতর্ক পরিকল্পনাকারী, প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলার আগে সতর্কতার সাথে বিচার করে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সম্ভাব্য ভুলের দিকে, সে চেষ্টা করে অনিশ্চিত

www.pathagar.com

সম্ভাবনাগুলো কভার করতে। অন্য দিকে আছে হুড়োহুড়ি করার লোক, কোনও পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনও আইডিয়ায় অনুপ্রাণিত হলেই সে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে যায় কাজের জন্য। কোনও ব্যক্তির কর্মপন্থার আরেক পরিচয় হল নিয়ন্ত্রণ— শক্তি ও মনোযোগ উৎসর্গ করা থাকে এটা নিশ্চিত করতে যে সব কিছু নির্দিষ্ট পথে চলছে। এর আবার একদিকে আছে টাইট কন্ট্রোলার, কঠোর প্রশাসক। নিয়ম-নীতি সেখানে পালন করা হয় ধর্মের মত। এর বিপরীতে আছে স্বাধীনভাবে চলাচলকারীরা। আমলাতন্ত্রের ব্যাপারে তাদের ধৈর্য সামান্যই। তারা সহজ প্রতিনিধিত্ব করে আর চলাফেরার ব্যাপক স্বাধীনতা দেয় তাদের অধস্তনদের। আমি চেয়েছিলাম মধ্য পথের নেতাদের, সেই সব নেতাদের যারা শ্বাসরুদ্ধকর ভিন্নমত বা কঠোর অনমনীয়তা ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

আমি তাদের চেয়েছিলাম যাদের সম্ভাবনা জাগানোর সামর্থ্য ছিল, ধৈর্যের সাথে সকল সম্ভব বিকল্প বের করতে পারার সামর্থ্য ছিল, নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো নীতি প্রয়োগের জ্ঞান ছিল ; সামনে এগিয়ে যাবার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ দরকার ছিল আমার। আমি চেয়েছিলাম তারা নিজ নিজ ক্ষমতা ও কাজ অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারবেন, ভাল কাজের প্রতিনিধিত্ব করবেন, জ্ঞানীদের শ্রদ্ধা করবেন। তারা বিভিন্ন বিষয়কে পরস্পর থেকে পৃথক করতে পারবেন, আর দায়িত্ব নেবেন সামনে চলার। সর্বোপরি, সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সমানভাবে নিতে পারবেন।

পৃথ্বী প্রকল্পের জন্য আমি খুঁজে পেলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইএমই কোরের কর্নেল ভিজে সুন্দরমকে। তার ছিল অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আর মেকানিক্যাল ভাইব্রেশনে তিনি বিশেষজ্ঞের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ডিআরডিএলে সুন্দরম ছিলেন স্ট্রাকচার গ্রুপের প্রধান। আমি তার মধ্যে খুঁজে পেলাম অনিশ্চিত ধারণা সমাধানে নতুন ধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রস্তুত একজন মানুষকে। টিম ওয়ার্কে তিনি ছিলেন একজন নিরীক্ষক ও উদ্ভাবক। কাজ পরিচালনার বিকল্প পন্থার মূল্যায়ন করার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। যদিও কোনও প্রকল্প নেতার কাছে লক্ষ্য পরিষ্কার হতে পারে এবং লক্ষ্য পূরণে তিনি যথার্থ নির্দেশ দিতেও পারেন, তা সত্ত্বেও তার অধস্তনরা সে উদ্যোগ প্রতিরোধ করতে পারে যদি লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের কোনও বোধোদয় না ঘটে। তাই কার্যকর কর্ম নির্দেশনা দেবার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আমি ভাবলাম *পৃথ্বীর* প্রকল্প পরিচালককে উৎপাদন সংস্থা ও সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আর এক্ষেত্রে সুন্দরমই হবে উপযুক্ত পছন্দ।

www.pathagar.com

ত্রিশূল-এর জন্য আমি এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজছিলাম যার শুধু ইলেকট্রনিক্স ও মিসাইল ওয়ারফেয়ারে বিপুল জ্ঞান আছে তাই নয়, যে তার দলের সঙ্গে বোঝাপড়া ও দলের সমর্থন আদায়ের জন্য জটিল বিষয়গুলো দলের কাছে পেশ করতে পারবে। এই কাজের উপযুক্ত লোক হিসেবে খুঁজে পেলাম কমোডর এসআর মোহনকে, ভারতীয় নৌ-বাহিনী থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল প্রতিরক্ষা আরঅ্যান্ডডিতে। যুক্তির দ্বারা মানুষের মনে প্রত্যয় উৎপাদনের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তার।

অগ্নি আমার স্বপ্নের প্রকল্প। এ জন্য এমন একজনকে দরকার ছিল যে কি না প্রকল্প চালানোয় মাঝে মধ্যে আমার অযাচিত হস্তক্ষেপ সহ্য করে নেবে। আরএন আগরওয়াল ছিলেন সঠিক মানুষ। উজ্জ্বল অ্যাকাডেমিক রেকর্ডসহ তিনি ছিলেন এমআইটির একজন প্রাক্তন ছাত্র। তীক্ষ্ণ পেশাদার বিচারবুদ্ধি দিয়ে ডিআরডিএলের অ্যারোনটিক্যাল টেস্ট ফ্যাসিলিটিজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি।

প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে *আকাশ* ও *নাগ* সে সময় ভবিষ্যতের মিসাইল বলে বিবেচিত হয়েছিল ; এগুলো তৈরির কর্মতৎপরতা আরও আধ-দশক পরে জোরাল হবে বলে আশা করা হত তখন। তরুণ বয়সী প্রহ্লাদ ও এনআর আয়ারকে আমি নির্বাচন করলাম *আকাশ* ও *নাগের* জন্য। সুন্দরম ও মোহনের ডেপুটি হিসেবে নির্বাচন করলাম অপর দুই তরুণ ভিকে সরস্বৎ এবং একে কাপুরকে।

সেইসব দিনে ডিআরডিএলে কোনও ফোরাম ছিল না যেখানে সাধারণ জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা যেত কিংবা সিদ্ধান্তের ওপর বিতর্ক করা যেত। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞানীরা মূলত আবেগপ্রবণ মানুষ। একবার যদি তারা হোঁচট খায়, তাহলে তাদের টেনে নেওয়া খুবই কঠিন। বাধা-বিপত্তি আর হতাশা সব সময়ই আছে এবং যে কোনও পেশায় পুর্বানুক্রমিক অংশ হিসেবে তা থাকবেই, এমন কি বিজ্ঞানজগতেও। যা হোক আমি চাইনি আমার বিজ্ঞানীদের কাউকে একা একা নিরাশার মুখোমুখি পড়তে হোক। আমি এও নিশ্চিত করতে চেয়েছি যে, তাদের মন্দ অবস্থায় কোনও লক্ষ্য যেন তাদের নির্ধারণ করতে না হয়। এ ধরনের বিষয়গুলো এড়ানোর জন্য একটা সায়েন্স কাউন্সিল গঠন করা হল—এক রকম *পঞ্চায়েত* যেখানে সবাই একত্রে বসে সাধারণ সিদ্ধান্তগুলো নেবে। সমস্ত বিজ্ঞানী প্রতি তিন মাসে একবার এক সঙ্গে বসবে।

কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক ছিল ঘটনাবহুল। একজন সিনিয়র বিজ্ঞানী এমএন রাও সরাসরি একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন ঃ 'কিসের ভিত্তিতে আপনি নির্বাচিত করেছেন এই পঞ্চপান্ডবকে?' পঞ্চপান্ডব বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন প্রকল্প পরিচালকদের কথা। বস্তুত আমি এমন একটি প্রশ্নই আশা করছিলাম। আমি

www.pathagar.com

তাকে বলতে চেয়েছিলাম যে, আমি আবিষ্কার করেছি এই পঞ্চপান্ডব বিয়ে করেছে ইতিবাচক চিন্তার দ্রৌপদীকে। কিন্তু তার বদলে রাওকে আমি অপেক্ষা করে দেখতে বললাম। আমি তাদের নির্বাচন করেছিলাম দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির দায়িত্ব গ্রহণ করতে, যেখানে নতুন নতুন ঝড় উঠবে প্রতিদিন।

প্রতিটা আগামীকাল, আমি রাওকে বললাম, সুযোগ বয়ে আনবে এইসব উদ্যমী মানুষদের কাছে— আগরওয়ালদের কাছে, প্রহ্লাদদের কাছে, আয়ারদের কাছে, সরস্বৎদের কাছে— তাদের লক্ষ্যের স্পষ্ট চিত্রটা তারা দেখতে পাবে তাতে করে, আর অঙ্গীকারে তারা অটল হবে।

কিসে তৈরি হয় একজন উৎপাদশীল নেতা? আমার মতে, একজন উৎপাদনশীল নেতাকে অবশ্যই কর্তৃত্ব পরিচালনায় হতে হবে উপযুক্ত। তাকে অবশ্যই প্রতিনিয়ত তার প্রতিষ্ঠানে নতুন রক্ত সঞ্চালন করতে হবে। তাকে অবশ্যই সমস্যা আর নতুন ধারণার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। তাকে অবশ্যই হতে হবে দলকে উদ্যমী করে তোলায় পারঙ্গম। যেখানে দরকার সেখানে প্রশংসা করতে হবে ; প্রশংসা করতে হবে প্রকাশ্যে, কিন্তু সমালোচনা ব্যক্তিগতভাবে।

সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নগুলোর একটা এল একজন তরুণ বিজ্ঞানীর কাছ থেকে : 'এই প্রকল্পের ভাগ্য যদি *ডেভিল* প্রকল্পের দিকে যায়, তাহলে তা আপনি ঠেকাবেন কিভাবে?' আইজিএমডিপির পিছনে যে দর্শন আছে আমি আর কাছে সেটা ব্যাখ্যা করলাম— এটা শুরু হবে ডিজাইনে আর শেষ হবে মোতায়েনে। একেবারে ডিজাইন স্তর থেকে ইউজার এজেন্সি ও প্রডাকশন সেন্টারগুলোর অংশগ্রহণ এতে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সফলভাবে মিসাইল সিস্টেম স্থাপন না করা পর্যন্ত পিছনে ফিরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

যে সময়ে দলগঠন প্রক্রিয়া ও কর্ম সংগঠন চলছিল, সেই সময়ে আমি লক্ষ্য করলাম, আইজিএমডিপির চাহিদা পূরণের মত পর্যাপ্ত স্থান ডিআরডিএলে নেই। নিকটবর্তী স্থানে কিছু স্থাপনা গড়তে হবে। *ডেভিল* প্রকল্পের মিসাইল স্থাপনার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল মাত্র ১২০ বর্গমিটার শেড। পাঁচটা মিসাইল যা খুব শীগগিরই এখানে পৌঁছাবে তা ইন্টিগ্রেট করার জায়গা কোথায়? এনভায়রনমেন্টাল টেস্ট ফ্যাসিলিটি এবং অ্যাভিওনিক্স ল্যাবরেটরি ছিল সমান ভাবেই গাদাগাদি করে ঠাশা আর দুর্বল যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত।

আমি নিকটবর্তী ইমারত কাঞ্চা এলাকা ঘুরে দেখলাম। কয়েক দশক আগে ডিআরডিএল এ জায়গায় ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছিল। ভূখন্ডটা

www.pathagar.com

একেবারে বন্ধ্যা হয়ে পড়ে ছিল— কোনও গাছপালা নেই— আর দাক্ষিণাত্যের ভূপ্রকৃতির বড় বড় বোল্ডার দেখা যায় মাঝে মাঝে। আমার মনে হয় যেন বিপুল পরিমাণ শক্তি আটকা পড়ে আছে এইসব পাথরের মধ্যে। মিসাইল প্রজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টিগ্রেশন ও চেক-আউট স্থাপনার জন্য এ জায়গাটিকেই আমি নির্বাচন করলাম। পরবর্তী তিন বছরের জন্য এটাই হয়ে উঠল আমার মিশন।

সকল অগ্রবর্তী সুযোগ-সুবিধাসহ একটা উচ্চতর প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আমরা ছক করেছিলাম। একটা ইনার্শিয়াল ইন্সট্রুমেন্টেশন ল্যাবরেটরি, পূর্ণমাত্রার এনভায়রনমেন্টাল ও ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (ইএমআই/ইএমসি) টেস্ট স্থাপন, একটা কম্পোজিট উৎপাদন কেন্দ্র, এবং একটা স্টেট-অব-দ্য-আর্ট মিসাইল ইন্টিগ্রেশন ও চেকআউট সেন্টার ইত্যাদি থাকবে তাতে। যে কোনও দিক থেকে এটা ছিল বিশালতর কাজ। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দরকার ছিল আলাদা ধরনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান আর আত্মপ্রত্যয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই স্থির করা হয়েছিল। এখন সেগুলোয় টেনে আনা দরকার ছিল বিভিন্ন সংস্থার লোকজনকে, যোগাযোগ ও সমস্যা-সমাধানের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। এ কাজ করার সবচেয়ে যোগ্য লোক ছিল কে? এমভি সূর্যকান্ত রাওয়ের মধ্যে এর সমস্ত গুণ আমি দেখেছিলাম। তারপর যেহেতু বিপুলসংখ্যক সংস্থা আরসিআই তৈরিতে কাজ করবে, তাই পৌরহিত্য বিষয়ক স্পর্শকাতরতা রক্ষার জন্য একজনকে প্রয়োজন হয়েছিল। এর দায়িত্ব দিলাম কৃষ্ণ মোহনকে। কাজ-কর্মে হুকুম তামিল করার চেয়ে স্বত:স্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণের উদ্দীপনা জাগাতে পারবে সে লোকজনের মধ্যে। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুযায়ী, আমরা আরসিআই নির্মাণ কাজের জন্য মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (এমইএস) কে ডাকলাম। তারা বলল এ কাজ সম্পূর্ণ করতে পাঁচ বছর সময় লাগবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা হল এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হল বাইরের নির্মাণ কোম্পানিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। আমরা সার্ভে অব ইন্ডিয়া ও ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং এজেন্সির মধ্যে লিয়াজোঁ রক্ষা করলাম কন্টুর ম্যাপ তদন্ত এবং ইমারত কাঞ্চার আকাশ থেকে তোলা আলোকচিত্রের জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল স্থাপনার লোকেশন ও রাস্তার লেআউট প্রস্তুত করা। সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড পানি উত্তোলনের জন্য পাথরগুলোর মধ্যে কুড়িটা লোকেশন শনাক্ত করল। ৪০ এমভিএ পাওয়ার চালু ও প্রতিদিন ৫০ লাখ লিটার পানি উত্তোলনের অবকাঠাম নির্মাণের পরিকল্পনা স্থির করা হল।

এই সময়েই কর্ণেল এসকে সালওয়ান আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, অসীম শক্তির অধিকারী একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। নির্মাণ কাজের শেষ পর্যায়ে, বোল্ডারের মধ্যে প্রাচীন এক উপাসনাস্থল আবিষ্কার করলেন সালওয়ান। আমার মনে হয়েছিল এই স্থানটি ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট। এখন আমরা মিসাইল সিস্টেম

www.pathagar.com

ডিজাইনের কাজ শুরু করেছিলাম এবং অগ্রগতি হচ্ছিল দ্রুত। পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল মিসাইল ফ্লাইট পরীক্ষার জন্য একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করা। অন্যদিকে এসএইচএআর অন্ধ্র প্রদেশে স্থান অনুসন্ধানের কাজ করছিল। এ কাজ ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল রেখা বরাবর। শেষ পর্যন্ত এর সমাপ্তি ঘটল উড়িষ্যার বালাসোরে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল বরাবর একটা স্থান শনাক্ত করা হল ন্যাশনাল টেস্ট রেঞ্জের জন্য। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, ওই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের স্থানান্তরকে ঘিরে সৃষ্টি হওয়া রাজনৈতিক বিতর্কের কর্কশ আবহাওয়ার ভিতর গিয়ে পড়ল গোটা প্রকল্প। অতঃপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, উড়িষ্যার বালাসোর জেলার চন্ডিপুরে অবস্থিত প্রুফ এক্সপেরিমেন্টাল এস্টাবলিশমেন্ট (পিএক্সই) সংলগ্ন স্থানে একটা মধ্যবর্তী অবকাঠাম নির্মাণ করা হবে। এই রেঞ্জ গঠনের জন্য ৩০ কোটি রুপি তহবিল গঠন করা হল। এর নাম দেওয়া হল ইন্টারিম টেস্ট রেঞ্জ (আইটিআর)। ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল ট্র্যাকিং ইন্সট্রুমেন্ট, একটা ট্র্যাকিং টেলিস্কোপ সিস্টেম এবং একটা ইন্সট্রুমেন্টেশন ট্র্যাকিং রাডার ইত্যাদির জন্য ড. এইচএস রামা রাও ও তার দল অভূতপূর্ব কাজ করেছিলেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরএস দেশওয়াল এবং মেজর জেনারেল কেএন সিং রেঞ্জ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও লঞ্চ প্যাড তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। চন্ডিপুর ছিল পাখিদের অপূর্ব এক অভয়ারণ্য। তাদের বিরক্ত না করে টেস্ট রেঞ্জ ডিজাইন করতে বললাম আমি প্রকৌশলীদের।

আরসিআই সৃষ্টি ছিল খুব সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা। অভূতপূর্ব মিসাইল প্রযুক্তির এই কেন্দ্র নির্মাণ ছিল কাদা থেকে মৃৎশিল্পীর তৈরি মৃৎপাত্রের মতই একটা ব্যাপার।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমন ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে ডিআরডিএল পরিদর্শনে এলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আইজিএমডিপির তৎপরতায় তার নিজের মূল্যাবধারণ করা। তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন, আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর তালিকা করতে, কোনও কিছুই যেন বাদ না পড়ে, এবং তাতে যেন আমাদের নিজেদের ইতিবাচক ভাবনা ও বিশ্বাস থাকে। 'আপনি তাই কল্পনা করবেন যা আপনি বাস্তব করবেন, আপনি তাই বিশ্বাস করবেন যা আপনি অর্জন করবেন', তিনি বললেন। ড. অরুণাচলম ও আমি দেখতে পেলাম, আইজিএমডিপির সামনে সম্ভাবনার এক অনন্ত দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। দেশের সেরা প্রফেশনালরা আইজিএমডিপির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে আমরা উদ্দীপিত ও উৎসাহিত হয়েছিলাম। বিজয়ীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে কে না চায়? বিশ্ব বুঝতে পেরেছিল আইজিএমডিপি জন্ম-বিজয়ী।

www.pathagar.com

১২

১৯৮৪ সালের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমরা একটা মিটিং করছিলাম, এ সময় আমাদের কাছে খবর এল বোম্বাইতে ৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মারা গেছেন ড. ব্রহ্ম প্রকাশ। মানসিকভাবে এটা ছিল আমার জন্য বিশাল ক্ষতি, কারণ আমার জীবনের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময়টাতেই আমি তার অধীনে কাজ করার সুবিধা পেয়েছিলাম। তার সমবেদনা ও নম্রতা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। এসএলভি-ই ১ ফ্লাইটের ব্যর্থতার দিন তার সস্নেহ স্পর্শের কথা আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল আর তাতে আমার বেদনা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল।

অধ্যাপক সারাভাই যদি ভিএসএসসির স্রষ্টা হয়ে থাকেন, তাহলে ড. ব্রহ্ম প্রকাশ ছিলেন তার সম্পাদনকারী। তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে পুষ্টি জোগান দিয়েছিলেন, যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। আমার নেতৃত্বের দক্ষতাকে রূপ দিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ড. ব্রহ্ম প্রকাশ। বস্তুত তার সাথে আমার কর্মসহযোগ ছিল আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট। তার নম্রতা আমার আগ্রাসী মনোভাবকে স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করেছিল। নিজের প্রতিভা বা জ্ঞানের জন্য যে তিনি নম্রতা দেখাতেন তা নয়, বরং তার অধীনে কর্মরতদের মর্যাদা জ্ঞাপনের জন্যই তিনি নম্র আচরণ করতেন। তার মধ্যে আরও ছিল শিশুসুলভ নির্দোষিতা, আর আমি সব সময়ই তাকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক সন্ত হিসেবে বিবেচনা করতাম।

www.pathagar.com

ডিআরডিএলে নবজন্মের এই সময়টায় পি ব্যানার্জি, কেভি রামানা সাই ও তাদের দল একটা অ্যাটিচিউড কন্ট্রোল সিস্টেম ও একটা অন-বোর্ড কম্পিউটার প্রায় প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। এই উদ্যোগের সাফল্য যে কোনও দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ কর্মসূচির জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কথায়, আমাদের একটা মিসাইল দরকার এই গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য।

মস্তিষ্কে ঝড় তোলা অনেকগুলো সেশনের পর, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এই সিস্টেম পরীক্ষার জন্য একটা *ডেভিল* ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হবে উপস্থিতমত প্রাপ্ত উপাদান দিয়ে। একটা *ডেভিল* মিসাইলের বিভিন্ন অংশ আলাদা করা হল, নানা প্রকার পরিবর্তন করা হল তাতে, সম্প্রসারিত সাবসিস্টেম টেস্টিং সম্পন্ন করা হল এবং মিসাইল চেকআউট সিস্টেম নতুন করে গঠন করা হল। অস্থায়ী ব্যবস্থারূপে একটা লঞ্চার স্থাপন করে পরিবর্তিত ও সম্প্রসারিত রেঞ্জের *ডেভিল* ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হল ১৯৮৪ সালের ২৬ জুন, উদ্দেশ্য ছিল প্রথম দেশীয় স্ট্র্যাপ-ডাউন ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম পরীক্ষা করা। সমস্ত চাহিদা পূরণ করল গাইডেন্স। ভারতের মিসাইল উন্নয়নের ইতিহাসে এটা ছিল প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ। বহুদিন ধরে অস্বীকার করে আসা একটা সুযোগ অবশেষে যথাযথ কাজে লাগাতে পারলেন ডিআরডিএলের মিসাইল বিজ্ঞানীরা। বার্তাটা ছিল স্পষ্ট ও পরিষ্কার। আমরা এটা করতে পেরেছি!

দিল্লীতে এ বার্তা পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আইজিএমডিপির অগ্রগতিকে প্রশংসা করলেন। পুরো প্রতিষ্ঠান উত্তেজনায় ভরে গিয়েছিল। ১৯৮৪ সালের ১৯ জুলাই শ্রীমতি গান্ধী ডিআরডিএল পরিদর্শন করতে এলেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন বিপুল গর্ববোধসম্পন্ন একজন মানুষ—নিজের সম্পর্কে, নিজের কাজের ব্যাপারে ও তার দেশকে নিয়ে। তাকে আমি ডিআরডিএলে অভ্যর্থনা জানানোর বিষয়টিকে একটা সম্মান হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, যেহেতু আমার এক ধরনের নম্র মানসিকতার মধ্যেও তিনি নিজের কিছু গর্ব সঞ্চারিত করেছিলেন। তিনি খুব সচেতন ছিলেন যে, আশি কোটি মানুষের নেতা তিনি। তার হাতের প্রতিটা নড়াচড়া, প্রতিটা ইঙ্গিত, প্রতিটা পদক্ষেপ ছিল আশাবাদিতার চিহ্ন। গাইডেড মিসাইলের ক্ষেত্রে আমাদের কাজের যে উচ্চমূল্য তিনি দিতেন, তাতে করে আমার নৈতিক শক্তি আরও জোরদার হয়েছিল।

যে এক ঘন্টা তিনি ছিলেন ডিআরডিএলে, সেই এক ঘন্টায় তিনি আইজিএমডিপির সব কিছু খুঁটিয়ে দেখলেন, ফ্লাইট সিস্টেম পরিকল্পনা থেকে বহুমুখী উন্নয়ন গবেষণাগার পর্যন্ত। পরিশেষে তিনি বক্তৃতা দিলেন। আমরা যেটা

www.pathagar.com

নিয়ে কাজ করছিলাম সেই ফ্লাইট সিস্টেমের শিডিউল চাইলেন তিনি। 'আপনারা পৃথ্বীর ফ্লাইট টেস্ট করবেন কবে?' শ্রীমতি গান্ধী জানতে চাইলেন। আমি বললাম, '১৯৮৭ সালের জুনে।' তিনি দ্রুত বলে উঠলেন, 'ফ্লাইট শিডিউল এগিয়ে আনতে কি দরকার আমাকে বলুন' তিনি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ফলাফল দ্রুত পেতে চেয়েছিলেন। 'আপনাদের কাজের দ্রুতগতি হচ্ছে সমগ্র জাতির আশা,' তিনি বললেন। তিনি আমাকে আরও বললেন যে, আইজিএমডিপির বৈশিষ্ট্য শুধু শিডিউলের ওপরই নয়, উৎকর্ষতা অনুসরণেও। 'আপনি যা অর্জন করলেন তা বিষয় নয়, আপনার কখনওই পুরোপুরি আত্মতৃপ্ত হওয়া উচিৎ হবে না, বরং আরও উন্নতির পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।' তিনি যোগ করলেন। এক মাসের মধ্যে নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এসবি চ্যাবনকে প্রকল্প পরিদর্শনে পাঠিয়ে তিনি তার সমর্থন ও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। শ্রীমতি গান্ধীর মনোভাব শুধু যে প্রভাবদায়ক ছিল তাই নয়, বরং ফলপ্রসুও ছিল। আমাদের দেশে আজকের দিনে অ্যারোস্পেস গবেষণায় জড়িতরা জানে যে, আইজিএমডিপি আর উৎকর্ষতা সমার্থক।

আমাদের নিজেদের ম্যানেজমেন্ট টেকনিক আমরা আয়ত্ত করেছিলাম, এবং তা ছিল কার্যকর। এমন একটি টেকনিক ছিল প্রকল্প তৎপরতার ফলো-আপ। সম্ভাব্য সমাধানের প্রাযুক্তিক ও নিয়মানুগ প্রয়োগযোগ্যতার ভিত্তিতে এটা গঠিত হয়েছিল। আর সবর সমর্থনের পর একে কাজে লাগান হত। অংশগ্রহণকারী কর্ম কেন্দ্রগুলোর তৃণমূল থেকে বিপুল পরিমাণ আইডিয়া এর ফলে পাওয়া গিয়েছিল। এই সফল কর্মসূচির যে কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনাগত কৌশল সম্পর্কে আপনি যদি আমাকে বলতে বলেন, তাহলে আমি এই ফলো-আপের কথাই বলব। বিভিন্ন গবেষণাগারে কৃত ডিজাইন, প্ল্যানিং ইত্যাদির ফলোআপের ভিতর দিয়ে, এবং ইন্সপেকশন এজেন্সি ও অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্যে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল। বস্তুত গাইডেড মিসাইল প্রগ্রাম অফিসে কাজের ধারা ছিল ঃ কোনও ওয়ার্ক সেন্টারে আপনার যদি একটা চিঠি পাঠাতে হয়, তাহলে ফ্যাক্স করুন ; যদি আপনার টেলেক্স বা ফ্যাক্স পাঠাতে হয়, তাহলে ফোন করুন; আর যদি টেলিফোনে আলাপ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সরাসরি সেখানে গিয়ে কথা বলুন।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষমতা আলোয় এল যখন ড. অরুণাচলম আইজিএমডিপির একটা স্টাটাস সমীক্ষা চালালেন ১৯৮৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। ডিআরডিও গবেষণাগারগুলোর বিশেষজ্ঞরা, আইএসআরও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদন সংস্থাগুলো একত্রিত হল সাধিত অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্য আর বাস্তবায়নের প্রথম বছরে যে সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সেগুলো জানতে। বড় সিদ্ধান্তগুলো যেমন ইমারত কাঞ্চায় স্থাপনা নির্মাণ ও পরীক্ষা স্থল প্রতিষ্ঠা এই সমীক্ষায় দানা বেঁধেছিল। জায়গাটির মূল নামটিকে মর্যাদা দিয়ে ইমারত কাঞ্চায় ভবিষ্যতের অবকাঠামোর নাম দেওয়া হয়েছিল রিসার্চ সেন্টার ইমারত (আরসিআই)।

www.pathagar.com

রিভিউ বোর্ডে ছিলেন পুরনো পরিচিত ব্যক্তি টিএন সেশন। খুবই আনন্দের বিষয় ছিল সেটা। এসএলভি–৩ ও এখনকার এই সময়ে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা হৃদ্যতা। এবার প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে সেশন খোঁজ-খবর নিলেন শিডিউল ও আর্থিক প্রস্তাবনার টিকে থাকার নানা প্রসঙ্গে। এসব ছিল আরও নির্দিষ্ট। সেশন ছিলেন হাস্যরসিক। তার বিরোধীদেরও তিনি হাস্যরস দিয়ে কোণঠাশা করে ফেলতেন। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু আর সুবিবেচক। আমার দল ভীষণ আনন্দিত হয়েছিল বিশেষ করে তার আইজিএমডিপিতে নিয়োজিত অগ্রবর্তী প্রযুক্তি বিষয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দিতে। কার্বন-কার্বন কম্পোজিটের দেশীয় উৎপাদন সম্পর্কে তার নির্ভেজাল কৌতূহলের কথা আমার আজও মনে পড়ে। আর আপনাকে একটা গোপন কথা বলি— সেশন হলেন এ দুনিয়ার একমাত্র ব্যক্তি যিনি ৩১টি অক্ষর ও পাঁচটি শব্দে গঠিত আমার পুরো নাম ধরে আমাকে সম্বোধন করতেন—আভুল পাকির জয়নুলাবদিন আবদুল কালাম।

মিসাইল প্রগ্রাম এগিয়ে চলছিল এবং ডিজাইন, উন্নয়ন ও উৎপাদনে তাতে শরিক হয়েছিল ১২টি অ্যাকাডেমিক ইন্সটিটিউট ও ডিআরডিওর ৩০টি গবেষণাগার, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর), আইএসআরও এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান। বস্তুত, ৫০ জনেরও বেশি অধ্যাপক ও ১০০ জন গবেষক পন্ডিত নিজ নিজ ইন্সটিটিউটের গবেষণাগারে মিসাইল-সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে কাজ করছিলেন। সেই এক বছরে অংশীদারিত্বের ভিতর দিয়ে অর্জিত কাজের উন্নত মান আমাকে এই আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল যে, দেশে যে কোনও উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সমীক্ষার চার মাস আগে, আমার মনে হয় ১৯৮৪ সালের এপ্রিল-জুন মাসে, মিসাইল কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমরা ছয়জন শিক্ষাঙ্গনগুলো পরিদর্শন করে প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ গ্রাজুয়েটদের তালিকা তৈরি করেছিলাম। আমরা অধ্যাপক ও উৎসাহী ছাত্রদের সামনে মিসাইল প্রগ্রামের রূপরেখা তুলে ধরেছিলাম, প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রের সামনে, এবং অংশগ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সমীক্ষকদের আমি অবগত করলাম যে, প্রায় ৩০০ তরুণ প্রকৌশলী আমাদের গবেষণাগারগুলোয় যোগ দেবে বলে আমরা আশা করছি।

ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্যাল ল্যাবরেটরির তৎকালীন পরিচালক রেড্ডাম নরসিম্‌হা এই সমীক্ষার ব্যাপারটাকে প্রযুক্তির দৃঢ় এক প্রকাশ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন, তাতে প্রমাণিত হয়েছিল লক্ষ্য পরিষ্কার থাকলে বড় বড় প্রাযুক্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিকে সহজেই পাওয়া যায়।

ভারত যখন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে তার প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাল, তখন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথিবীর ষষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত

www.pathagar.com

হল সে। যখন আমরা এসএলভি-৩ উৎক্ষেপণ করেছিলাম, তখন আমরা ছিলাম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সামর্থ্য অর্জনকারী পঞ্চম দেশ। কোনও প্রযুক্তিগত কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রথম বা দ্বিতীয় দেশ হব কখন আমরা?

আমি মনোযোগের সাথে সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সদস্যের কথা, মতামত ও সন্দেহ শুনলাম, আর শিক্ষা নিলাম তাদের যৌথ জ্ঞান ভান্ডার থেকে। সত্যিই এ ছিল আমার জন্য বিশাল এক শিক্ষা। আসলে বিদ্যালয়ে আমরা পড়তে, লিখতে, বলতে শিখি, কিন্তু শুনি না কখনও, আর পরিস্থিতি পরেও একই রকম থেকে যায়। ঐতিহ্যগত ভাবেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা খুব ভাল বক্তা, কিন্তু শোনার মত পর্যাপ্ত দক্ষতা তাদের নেই। মনোযাগী শ্রোতা হবার জন্য আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম।

পূর্ববর্তী মাসের সমীক্ষা থেকে তৈরি করা অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। এমন সময় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নিহত হবার খবর ছড়িয়ে পড়ল। এর পরপরই এল সহিংসতা ও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার খবর। হায়দারাবাদ নগরীতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছিল। আমরা পিইআরটি চার্ট গুটিয়ে রেখে একটা সিটি ম্যাপ মেলে ধরলাম টেবিলের ওপর। আমাদের সকল কর্মীকে কোন রাস্তা দিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে তা বের করার জন্য। এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে গবেষণাগার পরিণত হল জনমানবহীন ফাঁকা স্থানে। আমি একা বসে থাকলাম আমার অফিসে। শ্রীমতি গান্ধীর মৃত্যুতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণযুক্ত হয়ে পড়েছিল। মাত্র তিন মাস আগে এখানে তার পরিদর্শনের কথা মনে পড়তেই আমার যন্ত্রণা আরও গভীর হল। মহান মানুষদের শেষ পরিণতি অমন ভয়ংকর হবে কেন? আমি স্মরণ করলাম কাউকে আমার বাবা বলেছিলেন, 'শাদা আর কালো সুতো যেমন এক সাথে বুনন হয়ে থাকে কাপড়ে, তেমনি সূর্যের নিচে ভাল ও খারাপ মানুষ এক সঙ্গেই বসবাস করে। কালো বা শাদা সুতোর কোনও একটিও যদি ছিঁড়ে যায়, তাঁতী তাহলে খুঁজে দেখবে পুরো বস্ত্রটা, আর সে তাঁতও পরীক্ষা করবে।' গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় একটা প্রাণীকেও আমি দেখতে পেলাম না। আমি ছেঁড়া সুতোর তাঁত নিয়েই চিন্তা করতে থাকলাম।

বিজ্ঞান মহলে শ্রীমতি গান্ধীর মৃত্যু ছিল বিশাল ক্ষতি। দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি শক্তি জুগিয়েছিলেন। শ্রীমতি গান্ধীর হত্যার আঘাত কাটিয়ে ওঠা গেল ক্রমে ক্রমে, যদিও এর জন্য বলি হল কয়েক হাজার জীবন আর সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হল। তার পুত্র, রাজীব গান্ধী, ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে ম্যান্ডেট পেলেন মিসেস গান্ধীর পলিসি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রগ্রাম ছিল সেগুলোর একটা অংশ।

www.pathagar.com

১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মে, ইমারত কাঞ্চায় মিসাইল টেকনোলজি রিসার্চ সেন্টার তৈরির সমস্ত গ্রাউন্ডওয়ার্ক সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৫ সালের ৩ অগাস্ট রিসার্চ সেন্টার ইমারত (আরসিআই)-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। অগ্রগতিতে তাকে খুব সন্তুষ্ট মনে হল। তার মধ্যে ছিল শিশুসুলভ কৌতূহল। এক বছর আগে এখানে পরিদর্শনের সময় তার মায়ের যে স্থিরচিত্ততা ছিল, তার মধ্যেও তা দেখা গেল। তবে পার্থক্য ছিল এক জায়গায়। ম্যাডাম গান্ধী ছিলেন একজন টাস্কমাস্টার, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করতেন তার ক্যারিসমা। তিনি ডিআরডিএল পরিবারকে বললেন যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যে কঠোর অবস্থা মোকাবেলা করতে হচ্ছে তা তিনি উপলব্ধি করছেন। বিদেশে আরামদায়ক চাকরির সুযোগ না নিয়ে যারা মাতৃভূমির জন্য কাজ করছেন তাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে, দৈনন্দিন জীবনের দুঃশ্চিন্তাগুলো থেকে মুক্তি না পেলে কারো পক্ষে এ ধরনের কাজ গভীর মনোযোগের সঙ্গে করা সম্ভব নয়। তিনি আমাদের আশ্বাস দিলেন, বিজ্ঞানীদের জীবন-যাত্রা স্বস্তিদায়ক করার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হবে।

তার সফরের এক সপ্তাহের ভিতর, মার্কিন বিমান বাহিনীর আমন্ত্রণ ড. অরুণাচলমের সাথে আমি যুক্তরাষ্ট্রে গেলাম। ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্যাল ল্যাবরেটরির রোড্ডাম নরসিম্হা ও এইচএএলের কেকে গণপতি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে আমাদের কাজ শেষ করার পর, নরথ্রপ করপোরেশন পরিদর্শনে লস এঞ্জেলেসে যাবার পথে আমরা সান ফ্রান্সিসকোতে অবতরণ করলাম। আমি এই সুযোগে আমার প্রিয় লেখক রবার্ট শুলার কর্তৃক নির্মিত ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল দেখে নিলাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম পুরোপুরি কাচের, চার পয়েন্টের, তারকা আকৃতির স্থাপত্যের এই অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখে। একটা পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টের দূরত্ব ৪০০ ফিটেরও বেশি। একটা ফুটবল মাঠের মত ১০০ ফিট লম্বা কাচের ছাদ মনে হল যেন শূন্যে ভাসছে। এই ক্যাথেড্রাল নির্মিত হয়েছে শুলারের চেষ্টায় দাতাদের দেওয়া কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। 'খোদা সেই ব্যক্তির মাধ্যমে বিপুল কাজ করতে পারেন যে ব্যক্তি কৃতিত্বের ধার ধারে না। অহংকার অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে,' শুলার লেখেন। 'সাফল্য দিয়ে খোদা তোমাকে বিশ্বাস করার আগে, বড় পুরস্কার পাওয়ার মত যথেষ্ট নিরহংকার প্রমাণ করতে হবে তোমার নিজেকে।' শুলারের গির্জায় আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন ইমারত কাঞ্চায় একটা রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করতে— সেটাই হবে আমার ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল।

www.pathagar.com

১৩

তরুণ প্রকৌশলীরা ডিআরডিএলের গতি বদলে দিল। আমাদের সবার জন্য এটা ছিল মূল্যবান অভিজ্ঞতা। এই তরুণ দলের মাধ্যমে এখন আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিলাম যাতে তৈরি করা সম্ভব রি-এন্ট্রি টেকনোলজি ও স্ট্রাকচার, একটা মিলিমেট্রিক ওয়েভ রাডার, একটা ফেজড্ অ্যারে রাডার, রকেট সিস্টেম আর এ ধরনের অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। প্রথম যখন তরুণ বিজ্ঞানীদের এসব কাজের দায়িত্ব আমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, তারা তখন কিন্তু তাদের কাজের গুরুত্ব পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। যখন বুঝতে পারল তখন তাদের ওপর স্থাপিত বিশাল আস্থার ভারে তারা অস্বস্তি বোধ করল। আমার এখনও মনে আছে এক তরুণ আমাকে বলছে, 'আমাদের দলে নামজাদা কেউ নেই, আমরা একটা ব্রেক থ্রু দিতে সমর্থ হব কিভাবে?' আমি তাকে বললাম, 'নামজাদা লোক হচ্ছে ক্ষুদ্র লোক যে কি না শুধু বন্দুক চালাতে থাকে, সুতরাং চেষ্টা কর।' তরুণ বৈজ্ঞানিকদের পরিবর্তিত হয় আর আগে মনে হওয়া অবাস্তব কাজ কি ভাবে বাস্তব হয় তা লক্ষ্য করা সত্যিই চমকপ্রদ ছিল। তরুণদের দলের অংশ হয়ে অনেক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী পুনর্যৌবন লাভ করেছিলেন।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আসল সৌরভ, খাঁটি কৌতুক, কাজের অবিরাম উদ্দীপনা ইত্যাদি বিরাজ করে কাজ করার মধ্যেই। চারটে মূল

www.pathagar.com

ফ্যাক্টরে আমি প্রভাবিত ছিলাম, আর সাফল্যজনক ফলাফলের সঙ্গেও সেগুলো জড়িত ঃ লক্ষ্য স্থির করা, ইতিবাচক চিন্তা, দৃশ্যায়ন এবং বিশ্বাস।

এই পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য স্থির করা বিষয়ক সব কিছুই সম্পন্ন করেছিলাম এবং এসব লক্ষ্য সম্পর্কে তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে উদ্যম জাগিয়ে তুলেছিলাম। আমি চাইতাম রিভিউ মিটিঙে তরুণ বিজ্ঞানীরা তাদের দলের কাজ তুলে ধরুক। সমস্ত সিস্টেমের দৃশ্য কল্পনা করতে তাতে তাদের সাহায্য হত। ক্রমেই আত্মবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হল। তরুণ বিজ্ঞানীরা নিরেট টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল সিনিয়র সহকর্মীদের। সন্দেহ দেখা দিলে তা প্রমাণ করতে লাগল। তারা শীগগিরই ক্ষমতার ব্যক্তিতে পরিণত হল। আমি চেষ্টা করলাম, বৃদ্ধ বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা আর তরুণ বিজ্ঞানীদের দক্ষতার মিশ্রণে কাজের একটা জীবন্ত পরিবেশ বজায় থাকুক। তরুণ ও অভিজ্ঞদের মধ্যে এই নির্ভরশীলতা ডিআরডিএলে অত্যন্ত উৎপাদনশীল কর্ম সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল।

মিসাইল প্রগ্রামের প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, শ্রীহরিকোটার টেস্ট রেঞ্জ থেকে এ দিন ছোড়া হল *ত্রিশূল*। সলিড প্রপেল্যান্ট রকেট মোটরের ইন-ফ্লাইট পারফরমেন্স পরীক্ষার জন্য এটা ছিল একটা ব্যালিস্টিক ফ্লাইট। ভূমি থেকে মিসাইল ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত হয়েছিল দুটো সি-ব্যান্ড রাডার এবং ক্যালিডিও-থিওডোলাইট (কেটিএল)। পরীক্ষা সফল হল। লঞ্চার, রকেট মোটর ও টেলিমেট্রি সিস্টেম কাজ করল পরিকল্পনা অনুযায়ী। তবে উইন্ড টানেল টেস্টিং-এর ভিত্তিতে অনুমিত হিসেবের তুলনায় অ্যারোডাইনামিক ড্রাগ অনেক বেশি হল। টেকনোলজির ব্রেকথ্রু বা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধির দিক থেকে এই টেস্টের মূল্য বেশি ছিল না, কিন্তু এই টেস্টের আসল অর্জনটা হল এই যে আমার ডিআরডিএলের সহকর্মীদের মনে করিয়ে দেওয়া, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মত কঠিন চাহিদা পূরণ না করেও তারা মিসাইল উৎক্ষেপণ করতে পারে।

এর পরই সফলভাবে পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন অনুষ্ঠিত হল পাইলটবিহীন টার্গেট এয়ারক্র্যাফটের (পিটিএ)। বাঙ্গালোর ভিত্তিক অ্যারোনটিক্যাল ডেভলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট (এডিই)-এর ডিজাইন করা পিটিএর জন্য রকেট মোটর তৈরি করেছিল আমাদের প্রকৌশলীরা। মোটর টাইপ-অ্যাপ্রুভড করেছিল ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার)। মিসাইল হার্ডঅয়ার উন্নতির দিকে এটা ছিল একটা ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ যা শুধু ক্রিয়ামূলকই নয় বরং ইউজার এজেন্সিগুলোর

www.pathagar.com

কাছেও গ্রহণযোগ্য। একটা বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান ডিআরডিএলের টেকনোলজি ইনপুট নিয়ে উৎপাদন করছিল নির্ভরযোগ্য উঁচু থ্রাস্ট-টু-ওয়েট রেশিও রকেট মোটর। একক গবেষণাগার প্রকল্প থেকে বহু-গবেষণাগার কর্মসূচি আর সেখান থেকে ল্যাবরেটরি ইন্ডাস্ট্রির দিকে আমাদের কর্ম-পরিধি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছিল। চারটে আলাদা সংস্থার ওপর বেশ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল পিটিএ। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা মিলনকেন্দ্রে আর তাকিয়ে আছি এডিই, ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার) এবং আইএসআরও থেকে আসা রাস্তাগুলোর দিকে। চতুর্থ রাস্তাটি ছিল ডিআরডিএল, মিসাইল প্রযুক্তিতে জাতির আত্মনির্ভরতার মহাসড়ক।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্ব আরও এক ধাপ বাড়িয়ে জয়েন্ট অ্যাডভান্সড টেকনোলজি প্রগ্রামস শুরু করা হল ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএস) ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমার সবসময়ই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ইনপুট দিতে পারেন শিক্ষাবিদরা তাকে আমি মূল্য দিই। এসব প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানান হয়েছিল এবং ডিআরডিএলে তাদের অনুষদগুলো থেকে কোন বিশেষজ্ঞরা আসবেন তা আয়োজন করা হয়েছিল।

বিভিন্ন মিসাইল সিস্টেমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু অবদানের কথা বলা যাক এই অবসরে। *পৃথ্বী*র ডিজাইন করা হয়েছিল গাইডেড মিসাইল হিসেবে। সঠিক ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে ট্রাজেক্টরি-প্যারামিটারে সংযুক্ত করা লাগত মস্তিষ্ক— অর্থাৎ অন-বোর্ড কম্পিউটার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল তরুণ প্রকৌশলী গ্রাজুয়েট, অধ্যাপক ঘোষালের তত্ত্বাবধানে, তৈরি করেছিল রোবাস্ট গাইডেন্স অ্যালগোরিদ্‌ম। আইআইএসে স্নাতকোত্তর ছাত্ররা, অধ্যাপক আইজি শর্মার নেতৃত্বে, তৈরি করে দিল *আকাশ*-এর মাল্টি-টার্গেট অ্যাকুইজিশনের জন্য এয়ার ডিফেন্স সফটঅয়ার। *অগ্নি*র জন্য রি-এন্ট্রি ভেহিকল সিস্টেম ডিজাইন মেথডলজি তৈরি করে দিল আইআইটি মাদ্রাজ-এর তরুণদের একটা দল এবং ডিআরডিওর বিজ্ঞানীরা। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নেভিগেশনাল ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং ইউনিট *নাগ*-এর জন্য তৈরি করেছিল স্টেট-অব-দ্য-আর্ট সিগনাল প্রসেসিং অ্যালগোরিদ্‌ম। সহযোগীদের সামান্য কয়েকটি উদাহরণ এগুলো। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশীদারিত্ব ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষে অগ্রসর প্রযুক্তিগত লক্ষ্য অর্জন অত্যন্ত কঠিন হত।

বিবেচনা করা যাক *অগ্নি* পেলোড ব্রেকথ্রুর উদাহরণটা। *অগ্নি* হচ্ছে টু-স্টেজ রকেট সিস্টেম। দেশে প্রথমবারের মত তৈরি রি-এন্ট্রি টেকনোলজি এতে ব্যবহার

www.pathagar.com

করা হয়। এসএলভি-৩ থেকে বিক্ষিপ্ত একটা ফার্স্ট-স্টেজ সলিড রকেট মোটরের দ্বারা এটা সামনে ঠেলে দেওয়া হয়, তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও গতি-সঞ্চারিত করা হয় *পৃথ্বীর* লিকুইড রকেট ইঞ্জিন দিয়ে। *অগ্নির* ক্ষেত্রে হাইপারসোনিক গতিতে পেলোড খালাস করা হয়। এর জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একটা রি-এন্ট্রি ভেহিকল স্ট্রাকচারের ডিজাইন করা আর সেটা উৎপাদন করা। গাইডেন্স ইলেকট্রনিক্স-এ বোঝাই পেলোড স্থাপন করা হয় রি-এন্ট্রি ভেহিকল স্ট্রাকচারে, এর উদ্দেশ্য ভিতরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রেখে পেলোড রক্ষা করা যখন বাইরের আবরণের তাপমাত্রা ২৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়েও অনেক বেশি। অন-বোর্ড কম্পিটারযুক্ত একটা ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম কাঙ্খিত লক্ষ্যে গাইড করে নিয়ে যায় পেলোডকে। যে কোনও রি-এন্ট্রি মিসাইল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কার্বন-কার্বন নোজ ওই রকম প্রচন্ড তাপেও শক্তিশালী রাখার জন্য ত্রিমাত্রিক পারফর্ম মূল চাবিকাঠি। ডিআরডিওর চারটে গবেষণাগার ও সিএসআইআর এই লক্ষ্য অর্জন করেছিল মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে— অন্য দেশগুলো এ সাফল্য অর্জন করেছিল এক দশক গবেষণার পর!

অগ্নি পেলোড ডিজাইনে সংশ্লিষ্ট আরেকটা চ্যালেঞ্জ বিপুল গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। বস্তুত, *অগ্নি* এটমসফেয়ারে পুনঃপ্রবেশ করতে পারত শব্দের গতির বারো বার (বিজ্ঞানে একে আমরা বলি ১২ ম্যাচ)। আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না যে, এই বিপুল গতিতে ধাবমান ভেহিকলকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। পরীক্ষা করার জন্য, ওই ধরনের গতি সঞ্চালনের উইন্ড টানেল আমাদের ছিল না। আমরা যদি আমেরিকার সাহায্য চাইতাম, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াত এমন যে, তাদের এক্সক্লুসিভ সুবিধা হাতানোর উচ্চাভিলাষ করছি যেন আমরা। এমন কি তারা যদি সহযোগিতা করতেও চাইত, তাহলেও এ বাবদ এমন এক ভাড়া নির্ধারণ করত যা হত আমাদের পুরো প্রকল্পের বাজেটের চেয়েও বেশি। এখন প্রশ্ন দাঁড়াল কিভাবে এই সিস্টেম আয়ত্ত করা যায়। আইআইএসের অধ্যাপক এসএম দেশপান্ডে খুঁজে বের করলেন চারজন উজ্জ্বল তরুণ বিজ্ঞানীকে যারা কাজ করছিল ফ্লুইড ডাইনামিক্স-এর ক্ষেত্রে এবং, ছয় মাসের মধ্যে, কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স ফর হাইপারসোনিক রেজিম্স-এর জন্য একটা সফটঅয়ার তৈরি করলেন, দুনিয়ায় যার দ্বিতীয়টি ছিল না।

আরেকটা অর্জন ছিল একটা মিসাইল ট্রাজেক্টরি সিমুলেশন সফটঅয়ার। **অনুকল্পনা** নামে এটা তৈরি করেছিলেন আইআইএসের অধ্যাপক আইজি শর্মা।

www.pathagar.com

আকাশ গোত্রের উইপন সিস্টেমের মাল্টি-টার্গেট অ্যাকুইজিশন সক্ষমতার জন্য। কোনও দেশই এ ধরনের সফটঅয়ার আমাদের দিত না, ফলে দেশীয় ভাবেই আমরা এটা তৈরি করি।

বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আরেক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আইআইটি দিল্লীর অধ্যাপক ভারতী ভাট। তিনি কাজ করছিলেন সলিড ফিজিক্স ল্যাবরেটরি (এসপিএল) এবং সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (সিইএল)-এর সঙ্গে। *আকাশ*-এর সার্ভেইলেন্স, ট্র্যাকিং ও গাইডেন্সের জন্য মাল্টি–ফাংশন মাল্টি-টাস্কিং ৩-ডি ফেজড্ আর্মি রাডারে ব্যবহারের জন্য ফেরিট ফেজ শিফটার তৈরি করে এক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমা দেশগুলোর একচেটিয়া অধিকার খর্ব করে দিয়েছিলেন। আরসিআইতে আমার সহকর্মী ছিলেন বিকে মুখোপাধ্যায়, তার সাথে কাজ করছিলেন খড়গ্পুরে অবস্থিত আইআইটির অধ্যাপক সারাফ। তিনি *নাগ*-এর সিকার হেডের জন্য একটা মিলিমেট্রিক ওয়েভ (এমএমডব্লিউ) অ্যান্টিনা তৈরি করে দিলেন মাত্র দুই বছরে, এটা ছিল একটা রেকর্ড। সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ ইন্সটিটিউট (সিইইআরআই), পিলানি, এসপিএল ও আরসিআই সহযোগে একটা Impatt Diode তৈরি করেছিল বিদেশের ওপর প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য, যা ছিল যে কোনও এমএমডব্লিউ ডিভাইসের প্রাণ।

প্রকল্পের কাজ আনুভূমিক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কাজের মূল্যাবধারণ করাও বেশি বেশি করে সংকটজনক হয়ে উঠছিল। ডিআরডিওর রয়েছে একটা মূল্যনির্ণায়ন-যুক্ত পলিসি। ৫০০ বিজ্ঞানীকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে, তাদের কাজের মূল্যায়ন করে অ্যানুয়াল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হত আমাকে। এসব রিপোর্ট সুপারিশের জন্য পেশ করা হত বাইরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটা মূল্য-নির্ণায়ক বোর্ডের কাছে। অনেক লোক আমার কাজের এই অংশটাকে দেখত কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে। কারো পদোন্নতি না হলে তাকে আমি অপছন্দ করি বলে মনে করা হত। অন্য সহকর্মীদের পদোন্নতিকে দেখা হত এভাবে যে, ওই সহকর্মীরা আমার আনুকূল্য পেয়েছে। কাজ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি ন্যায় বিচারকের ভূমিকা পালন করার।

www.pathagar.com

একজন বিচারককে ঠিক ভাবে বুঝতে হলে, আপনাকে অবশ্যই পরিমাপ দন্ডের প্রহেলিকা বুঝতে হবে; এক দিকে স্তূপাকার হয়ে উঠেছে আশা, অন্য দিকে আশঙ্কা। পাল্লা যখন এক দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন উজ্জ্বল আশাবাদ পরিণত হয় নীরব ত্রাসে।

কোনও ব্যক্তি যখন নিজের দিকে তাকায়, তখন যা সে খুঁজে পায় তার ভুল-বিচারই করে অধিকাংশ সময়। নিজের অভিপ্রায়ই সে শুধু দেখতে পায়। অধিকাংশ লোকেরই রয়েছে সদুদ্দেশ্য, সুতরাং তারা মনে করে যে তারা যা করছে তা ভাল। কোনও ব্যক্তির পক্ষে নিজের কাজকর্মকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করা খুব কঠিন, যা হতে পারে, আর প্রায়ই হয়, তার সৎ অভিপ্রায়ের প্রতি বিসদৃশ। অনেকেই তাদের কাজ করে সুবিধাজনক আচরণে আর আত্মতৃপ্তি নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে ফেরে। তারা কাজের মূল্যায়ন করে না ,মূল্যায়ন করে শুধু তাদের অভিপ্রায়ের। এটা মনে করা হয় যে, যেহেতু কোনও ব্যক্তি যথা সময়ে তার কাজ শেষ করার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করেছে, সুতরাং বিলম্ব যদি ঘটে তাবে তা এমন কারণে ঘটেছে যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বিলম্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার ছিল না। কিন্তু তার ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তা যদি ওই বিলম্বের কারণ হয়, তাহলে কি উদ্দেশ্যমূলক নয়?

পিছনের দিকে ফিরে তাকালে, যখন আমি ছিলাম একজন তরুণ বিজ্ঞানী, তখন আমি যা ছিলাম তার চেয়ে আরও বেশি কিছু হতে চাইতাম। আমার আকাঙ্খা ছিল বেশি অনুভব করা, বেশি শেখা, বেশি প্রকাশ করা। আমার আকাঙ্খা ছিল বড় হয়ে ওঠা, উন্নতি করা, বিশুদ্ধ হওয়া, সম্প্রসারিত হওয়া। আমার ক্যারিয়ার এগিয়ে নিতে আমি কখনও বাইরের প্রভাব ব্যবহার করিনি। নিজের ভিতরেই নিজের সামর্থ্য খুঁজে পাবার বাসনা ছিল আমার। আমার গতিময়তার চাবিকাঠি হল, কতদূর এসেছি তার চেয়ে কত দূর আরও আমাকে যেতে হবে তা মাথায় রাখা। সর্বোপরি, অমীমাংসিত সমস্যা, উচ্চাভিলাষী বিজয় ও অনিয়তাকার পরাজয়ের একটা মিশ্রণ ছাড়া জীবন আর কি?

সমস্যা হল আমরা প্রায়শ জীবনের সঙ্গে কারবার করার বদলে জীবনকে বিশ্লেষণ করতে বসি। লোকেরা ব্যর্থতার জন্য নানারকম অজুহাত তৈরি করে, কিন্তু সেগুলো মোকাবেলা করে না আর সেগুলো জয় করার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে না—যাতে করে পরবর্তী সময়ে এসব পরিহার করা যায়। আমার বিশ্বাসটা হল এমন : সমস্যা-সংকটের ভিতর ফেলে দিয়ে খোদা আমাদের সুযোগ দেন বড় হয়ে ওঠার। সুতরাং আপনার আশা, স্বপ্ন ও লক্ষ্য যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই খুঁজে দেখুন, হয়তো একটা সুবর্ণ সুযোগ খুঁজে পাবেন ওরই ভিতর।

www.pathagar.com

লোকজনকে তাদের কাজের ভিতর নিমগ্ন করে দেওয়া আর বিষণ্নতার মোকাবেলা করা একজন নেতার জন্য সব সময়ই একটা চ্যালেঞ্জ। আমি শক্তির ভারসাম্য আর পরিবর্তনে প্রতিরোধের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি প্রতিষ্ঠানের ভিতর। একটা বিরোধী শক্তির ক্ষেত্রে প্যাঁচালো স্প্রিং হিসেবে পরিণত হওয়ার কথা কল্পনা করা যাক, এমন যে কিছু শক্তি পরিবর্তন সমর্থন করে আর অন্যরা প্রতিরোধ করে। সমর্থনকারী শক্তিকে বাড়িয়ে অথবা প্রতিরোধী শক্তিকে কমিয়ে পরিস্থিতিকে চালিত করা যেতে পারে কাঙ্খিত ফলাফলের দিকে— কিন্তু অল্প সময়ের জন্য মাত্র, আর সেটাও একটা নির্দিষ্ট পরিসর পর্যন্ত। কিছু সময় অতিবাহিত হলে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে প্রতিরোধী শক্তি ঠেলা দিতে শুরু করবে, যত জোরেই সেটা চেপে রাখা হোক না কেন। সুতরাং চাপ না দিয়ে প্রতিরোধ শক্তিকে এমন ভাবে কমাতে হবে যাতে করে সমর্থনকারী শক্তি নিজেই বৃদ্ধি পাবে। এই উপায়ে পরিবর্তন আনতে ও রক্ষা করতে কম শক্তির প্রয়োজন হবে।

উপরে শক্তির যে ফলাফলের কথা বলেছি, তাহল মোটিভ। এই শক্তি ব্যক্তিমানুষের জাড্য এবং কাজের পরিবেশে তার আচরণের ভিত্তি গঠন করে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অধিকাংশ মানুষের ভিতরে রয়েছে বিপুল শক্তি, বেড়ে ওঠার ঝোঁক, প্রতিযোগিতা। সমস্যা হয়েছে কাজের পরিবেশের অভাব যা তাদের উদ্দীপ্ত করতে পারবে আর পূর্ণ অভিব্যক্তি দিতে পারবে তার অভীষ্টের দিকে। নেতারা উঁচু উৎপাদনশীলতার স্তর সৃষ্টি করতে পারেন জব ডিজাইন আর যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠাম স্থাপনের মাধ্যমে। আর কঠোর কাজের স্বীকৃতি দিয়ে।

আমি এ ধরনের সহায়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলাম ১৯৮৩ সালে আইজিএমডিপি উৎক্ষেপণের সময়। সেই সময়ে প্রকল্প ডিজাইন পর্যায়েই ছিল। কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে ফলাফল বেড়ে দাঁড়াল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ। এখন বহুমুখী প্রকল্প প্রবেশ করছিল ডেভলপমেন্ট ও ফ্লাইট-টেস্টিং স্তরে, যেসব বড় ও ছোট মাইলস্টোনে পৌঁছান গিয়েছিল সেগুলোর কারণে কর্মসূচি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। আত্মভূতকরণের ভিতর দিয়ে তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি দলের গড় বয়স নামিয়ে আনা হল ৪২ থেকে ৩৩ বছরে। আমি অনুভব করলাম তখন দ্বিতীয়বার রি-অর্গানাইজেশনের সময় হয়েছে। কিন্তু সেটা করব কিভাবে? সে সময়ে সহজলভ্য মোটিভেশনাল ইনভেনটরি কাজে লাগালাম আমি—তিন ধরনের বোধশক্তি তার মূল ভিত্তি : এই প্রয়োজনীয়তা বোঝা যে লোকেরা কাজ করে তৃপ্ত হতে চায়, ফলাফল বোঝা যে জব ডিজাইন চলমান রয়েছে, এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষমতা বোঝা।

১৯৮৩ সালে রি-অর্গানাইজেশন করা হয়েছিল নবায়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে : খুব জটিল এ কাজ করেছিলেন এভি রঙ্গ রাও এবং কর্ণেল আর স্বামীনাথন। নতুন

www.pathagar.com

যোগদান করা তরুণ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একজন মাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা একটা দল গঠন করেছিলাম আর তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে দিয়েছিলাম স্ট্র্যাপ-ডাউন ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম এবং একটা অন-বোর্ড কম্পিউটার ও প্রপালসন সিস্টেমে একটা র‍্যাম রকেট তৈরি করার। দেশে এই চেষ্টা ছিল এটাই প্রথম, আর যে ধরনের প্রযুক্তি এতে ব্যবহৃত হয়েছিল তা ছিল বিশ্ব-মানের। তরুণদের দলটি শুধু যে এই সিস্টেমের ডিজাইন তৈরি করল তাই নয়, তারা সেটাকে অপারেশনাল ইকুইপমেন্টেও রূপদান করল। পরবর্তী সময়ে *পৃথ্বী* ও *অগ্নি*তে একই গাইডেন্স সিস্টেম ব্যবহৃত হয়েছিল আর ফল পাওয়া গিয়েছিল অসাধারণ। এই তরুণ দলের প্রচেষ্টায় সংরক্ষিত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল।

*পৃথ্বী*র কাজের প্রায় শেষের দিকে নতুন বছর শুরু হল— ১৯৮৮। দেশে প্রথমবারের মত ব্যবহৃত হতে যাচ্ছিল গুচ্ছভুক্ত লিকুইড প্রপেল্যান্ট (এলপি) রকেট ইঞ্জিন। সুযোগ ও নীতি নির্ধারণের মান সত্ত্বেও সুন্দরম ও আমি *পৃথ্বী*র দলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছিল সৃজনশীল আইডিয়ার ওপর, যা অনুপ্রবিষ্ট করা যাবে কর্মযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্যে। ওয়াই জ্ঞানেশ্বর ও পি বেনুগোপালন-এর সাথে সরস্বৎ এক্ষেত্রে বিশাল কাজ করেছিলেন। তাদের দলের ভিতর তারা সাফল্যের ও গর্বের বোধ সঞ্চারিত করেছিলেন। এই রকেট ইঞ্জিনের গুরুত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না *পৃথ্বী* প্রকল্পের কাছে— এটা ছিল একটা জাতীয় অর্জন। যৌথ নেতৃত্বের অধীনে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ দলের লক্ষ্য বুঝতে পেরেছিলেন আর নিজেদের তারা অঙ্গীকারবদ্ধ করেছিলেন। তাদের পুরো দল কাজ করত এক ধরনের আত্ম-নির্দেশনায়।

সুন্দরম ও সরস্বতের দক্ষ ও নিরাপদ হাতে ভেহিকল ডেভলপমেন্ট ছেড়ে দিয়ে আমি মিশনের সমালোচনাযোগ্য বিষয়গুলোর দিকে নজর দিলাম। মিসাইল সাবলীলভাবে উত্তোলনের জন্য লঞ্চ রিলিজ মেকানিজম (এলআরএম) তৈরির সতর্ক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এক্সপ্লোসিভ বোল্টের যৌথ নির্মাণে ডিআরডিএল ও এক্সপ্লোসিভ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ল্যাবরেটরি (ইআরডিএল) ছিল বহু-কর্মকেন্দ্র সমন্বয়ের এক চমকপ্রদ উদাহরণ।

আকাশ ভ্রমণ কালে নিচের ভূদৃশ্যের দিকে মুগ্ধ চোখে আমি তাকিয়ে থাকতাম। তা ছিল কী অপরূপ সুন্দর, কী বৈচিত্র্যময়, কী শান্তিপুর্ণ— সেই এক

www.pathagar.com

দূরত্ব থেকে, আমি অবাক হয়ে কল্পনা করতাম কোথায় সেই বাউন্ডারিগুলো যা আলাদা করে এক জেলাকে আরেক জেলা থেকে, এক স্টেটকে আরেক স্টেট থেকে, এক দেশকে আরেক দেশ থেকে। হতে পারে ওই রকম এক দূরত্ব আর বিচ্ছিন্নতার বোধ প্রয়োজন হয় আমাদের জীবনের সকল তৎপরতা মোকাবেলা করার জন্য।

বালাসোরে ইন্টারিম টেস্ট রেঞ্জ সম্পূর্ণ হতে তখনও আরও এক বছর বাকি ছিল, সুতরাং আমরা *পৃথ্বী* উৎক্ষেপণের জন্য এসএইচএআরে একটা বিশেষ স্থাপনা তৈরি করে নিয়েছিলাম। এতে ছিল একটা লঞ্চ প্যাড, ব্লক হাউজ, কন্ট্রোল কনসোল্ আর মোবাইল টেলিমেট্রি স্টেশন। আমার পুরনো বন্ধু এমআর কুরুপের সঙ্গে এখানে আবার পুনর্মিলন ঘটল, তখন সে এসএইচএআর সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল। *পৃথ্বী* উৎক্ষেপণ পর্যায়ে কুরুপের সঙ্গে কাজ করার বিষয়টা আমাকে বিশাল তৃপ্তি দিল। কুরুপ *পৃথ্বী*র জন্য কাজ করেছিল একজন দলীয় সদস্য হিসেবে। যে বাউন্ডারি রেখা ডিআরডিও এবং আইএসআরওকে, ডিআরডিএল এবং এসএইচএআরকে বিভক্ত করেছিল তা সে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছিল। লঞ্চ প্যাডে প্রচুর সময় খরচ করত কুরুপ আমাদের সঙ্গে। সে আমাদের সহযোগিতা করেছিল রেঞ্জ টেস্টিং ও রেঞ্জ সেফটিতে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে আর সে প্রপেল্যান্ট ফিলিঙে কাজ করেছিল প্রচুর উদ্যম নিয়ে। *পৃথ্বী* উৎক্ষেপণটাকে সে স্মরণীয় অভিজ্ঞতার রূপ দিয়েছিল।

পৃথ্বী উৎক্ষেপণ করা হয় ১৯৮৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ১১ : ২৩ ঘন্টায়। দেশের রকেট বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা ছিল এক মহাকাব্যিক ঘটনা। সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল *পৃথ্বী* ১৫০ কিলোমিটার দূরে ১০০০ কেজি কনভেনশনাল ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম আর নির্ভুলতার পরিমাণ ৫০ মিটার সিইপি। তবে আসল কথা হল, ভবিষ্যতের সকল গাইডেড মিসাইলের জন্য এটা ছিল বেসিক মডিউল। লং-রেঞ্জ সারফেস থেকে এটিকে রূপান্তরিত করা যায় এয়ার মিসাইল সিস্টেমে, এ ছাড়াও জাহাজেও মোতায়েন করা যেতে পারে।

মিসাইলের নির্ভুলতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এর সার্কুলার এরর প্রব্যাবল (সিইপি)-এ। এটা একটা বৃত্তের রেডিয়াস পরিমাপ করে যার মধ্যে নিক্ষিপ্ত মিসাইলের ৫০ শতাংশ সংঘৃষ্ট হবে। অন্য কথায়, কোনও মিসাইলের যদি ১ কিলোমিটার সিইপি থাকে (উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত ইরাকি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের যেমনটা ছিল), তাহলে তার অর্থ হল এগুলোর অর্ধেক সংঘৃষ্ট হবে লক্ষ্যস্থলের ১ কিলোমিটারের মধ্যে। ১ কিলোমিটার সিইপি ও কনভেনশনাল হাই-এক্সপ্লোসিভ ওয়ারহেড যুক্ত একটা মিসাইল দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে আশা করা

www.pathagar.com

যাবে না যে, সেটা স্থির সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহ যেমন কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটি বা এয়ার বেজ অচল বা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হবে। এটা শহরের মত অনিশ্চিত লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে বেশ কার্যকর।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের মার্চের মধ্যে জার্মান V-2 মিসাইল বর্ষণ করা হয় লন্ডনে। ওইসব মিসাইলে যুক্ত ছিল কনভেনশনাল হাইএক্সপ্লোসিভ ওয়ারহেড ও বৃহদাকার ১৭ কিলোমিটারের সিইপি। লন্ডনে হানা ৫০০টি V-2 ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল ২১,০০০-এরও বেশি আর ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল প্রায় ২০০০০০।

এনপিটি নিয়ে পশ্চিমারা যখন কর্কশ সুরে চিৎকার করছিল, আমরা তখন ৫০ মিটারের একটা সিইপি তৈরির দিকে এগিয়ে চলেছি। *পৃথ্বী*র সকল পরীক্ষার পর, পারমাণবিক ওয়ারহেড ছাড়াই একটা সম্ভাব্য কৌশলগত আক্রমণের শীতল বাস্তবতা মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল সেইসব সমালোচকদের যারা একটা টেকনোলজি কন্সপিরেসি বিষয়ে ফিসফাস করছিল।

পৃথ্বী উৎক্ষেপণ বৈরী ভাবাপন্ন প্রতিবেশী দেশগুলোয় একটা শক-ওয়েভ সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিমা ব্লক প্রথমে স্তম্ভিত ও পরে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ল। সাতটি রাষ্ট্র আমাদের ওপর প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিল, ভারতের পক্ষে একেবারে অসম্ভব করে তুলল এমন কি গাইডেড মিসাইলের সঙ্গে যোগ নেই এমন ধরনের যন্ত্রপাতি কেনাও। গাইডেড মিসাইল ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে ভারতের উত্থান বিশ্বের সব কটি উন্নত রাষ্ট্রের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

১৪

রকেট বিজ্ঞানে ভারতের মৌলিক সামর্থ্য আবারও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। বেসামরিক স্পেস ইন্ডাস্ট্রি ও টিকে থাকার শক্তিসম্পন্ন মিসাইল ভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতকে সেইসব গুটিকয় রাষ্ট্রের সারিতে উন্নীত করেছিল যারা নিজেদের বলে পরাশক্তি। বুদ্ধ ও গান্ধীর শিক্ষাকে অনুসরণ করেও কেন এবং কিভাবে ভারত মিসাইল পাওয়ারে পরিণত হল— এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

দুই শতাব্দীর নিপীড়ন, নির্যাতনও পারেনি ভারতীয় জনগণের সৃষ্টিশীলতা ও সামর্থ্যকে হত্যা করতে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের মাত্র এক দশকের মধ্যেই ইন্ডিয়ান স্পেস অ্যান্ড অ্যাটমিক এনার্জি প্রগাম চালু করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল শান্তিপূর্ণ ব্যবহার। মিসাইল ডেভলপমেন্টে বিনিয়োগের কোনও তহবিলও ছিল না, কিংবা সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকে তেমন তাগাদাও ছিল না। ১৯৬২ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতাই আমাদের বাধ্য করেছিল মিসাইল ডেভলপমেন্টের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিতে।

একটা *পৃথ্বী*ই কি যথেষ্ট? চার অথবা পাঁচটা মিসাইল সিস্টেমের দেশীয় উৎপাদন কি আমাদের যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারে? পারমাণবিক অস্ত্র কি আমাদের আরও শক্তিশালী করতে পারে? মিসাইল ও অ্যাটোমিক অস্ত্র আসলে একটা বৃহত্তর বস্তুরই দুটো অংশ। অগ্রসর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে *পৃথ্বী* উৎপাদন আমাদের

www.pathagar.com

দেশের আত্মনির্ভরশীলতা তুলে ধরেছে। উঁচু প্রযুক্তি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ টাকা আর ব্যাপক অবকাঠামোর সমার্থক। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এসবের কোনওটিই পর্যাপ্ত ছিল না। কাজেই আমরা কি করতে পারতাম? প্রযুক্তি প্রদর্শনের প্রকল্প হিসেবে তৈরি করা *অগ্নি* কি এসবের উত্তর হতে পারত? যে মিসাইল তৈরি করতে দেশের সহজলভ্য সব উৎসগুলো কাজে লাগান হয়েছিল।

প্রায় এক দশক আগে আইএসআরওতে আমরা আরইএক্স নিয়ে আলোচনা করার সময়ও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, একত্রে কর্মরত ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এই টেকনোলজিক্যাল ব্রেকথ্রু অর্জনের সামর্থ্য রয়েছে। ভারত অতি নিশ্চিতভাবেই স্টেট-অব-দ্য-আর্ট টেকনোলজি অর্জন করতে পারে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। আর এটা করার জন্য আমরা তিন স্তরের একটা কৌশল অবলম্বন করলাম—বহু প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ, কনসোর্টিয়াম মনোভাব, এবং প্রযুক্তির বলবৃদ্ধি। এই পাথরগুলো ঘষেই সৃষ্টি করা হয়েছিল *অগ্নি*।

৫০০-এরও বেশি বিজ্ঞানী নিয়ে *অগ্নি*র দল গঠন করা হয়েছিল। এই বিপুল কর্মকান্ডের নেটওয়ার্কে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল অনেক প্রতিষ্ঠান। *অগ্নি* মিশনে ছিল দুটো মূল নিশানা—কাজ এবং কর্মী। প্রত্যেক সদস্য তার দলের অন্যান্য সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল ছিল নিজ লক্ষ্য পূরণের জন্য। পরস্পরবিরোধিতা বা বিভ্রান্তি ঘটা এমন অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক। কিছু নেতা কাজ করিয়ে নেবার সময় কর্মীদের জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও লালন করতেন, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পন্থায়। অন্যরা শুধু কাজ আদায়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতেন। তারা মানুষকে লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। কেউ কেউ কাজের প্রতি কম গুরুত্ব দেন, আর তাদের সঙ্গে কর্মরত লোকদের উষ্ণতা ও অনুমোদন প্রাপ্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু এই দল যা অর্জন করেছিল তা হল মানব সম্পর্কের ও কর্মকুশলতার সম্ভব সর্বোচ্চ একীভবন।

সংশ্লিষ্টতা, অংশগ্রহণ ও অঙ্গীকার ছিল কর্মযোগের মূল কথা। দলের প্রত্যেক সদস্য কাজ করত এমন ভাবে যেন নিজের পছন্দে কাজ করছে। *অগ্নি* উৎক্ষেপণের ব্যাপারটি আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য তো বটেই, এমন কি তাদের পরিবারগুলোর জন্যও ছিল বিশাল এক বাজি। ভিআর নাগরাজ ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইন্টিগ্রেশন দলের নেতা। ছিলেন এমনই নিবেদিত প্রাণ প্রযুক্তিবিদ যে কাজের সময় খাওয়া এবং ঘুমের কথাও ভুলে যেতেন। তিনি আইটিআরে থাকাকালে তার ভগ্নিপতি মারা যান। তার পরিবার এই খবর নাগরাজের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিল, যাতে করে তার কাজে কোনও বাধা না পড়ে।

অগ্নি উৎক্ষেপণের তারিখ নির্ধারিত ছিল ১৯৮৯ সালের ২০ এপ্রিল। এটা হতে যাচ্ছিল এক নজিরবিহীন মহড়া। মিসাইল উৎক্ষেপণের সঙ্গে জড়িত ছিল ওয়াইড-রেঞ্জিং নিরাপত্তার বিপদের আশঙ্কা, যার সঙ্গে স্পেস লঞ্চ ভেহিকলের কোনও মিল নেই। মিসাইল ট্রাজেক্টরি মনিটর করার জন্য কাজে লাগান হয়েছিল দুটো রাডার, তিনটে টেলিমেট্রি স্টেশন, একটা টেলিকমান্ড স্টেশন ও চারটে

www.pathagar.com

ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল ট্র্যাকিং ইন্সট্রুমেন্ট। ভেহিকল ট্র্যাক করতে আরও নিযুক্ত করা হয়েছিল কার নিকোবর (আইএসটিআরএসি)-এ টেলিমেট্রি স্টেশন এবং এসএইচএআরের রাডারগুলো। ডাইনামিক সার্ভেইল্যান্স নিয়োগ করা হয়েছিল কন্ট্রোল সিস্টেম প্রেসার এবং বৈদ্যুতিক শক্তির দিকটা কভার করার জন্য যা ভেহিকলের মধ্যে মিসাইল ব্যাটারি থেকে প্রবাহিত হয়। ভোল্টেজে অথবা প্রেসারে অন্য কোনও গড়মিল লক্ষ্য করতে বিশেষভাবে ডিজাইন করা স্বয়ংক্রিয় চেকআউট সিস্টেম সংকেত দেবে 'Hold'। ত্রুটি মেরামতের পর ফ্লাইট অপারেশন পরিকল্পনা মাফিক চলবে। কাউন্টডাউন শুরু হবে টি-৩৬ ঘন্টায়। টি-৭.৫ মিনিট থেকে কাউন্টডাউন নিয়ন্ত্রিত হবে কম্পিউটারে।

উৎক্ষেপণের জন্য সকল প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলল শিডিউল অনুয়ায়ী। উৎক্ষেপণের কালে নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা। এ বিষয়টা সংবাদমাধ্যমের নজর কাড়ল, আর শুরু হয়ে গেল বিপুল বিতর্ক। ২০ এপ্রিল যখন এল, পুরো জাতির নজর তখন আমাদের ওপর।

ফ্লাইট ট্রায়াল বন্ধ করার জন্য বিদেশী চাপ এসেছিল কূটনৈতিক চ্যানেলের ভিতর দিয়ে, কিন্তু ভারত সরকার আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল পাথরের মত। টি-১৪ সেকেন্ডের সময় কম্পিউটার সংকেত দিল 'Hold' আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরও অসংখ্য 'Hold' আসতে লাগল। উৎক্ষেপণ স্থগিত করতে হল আমাদের। অন-বোর্ড পাওয়ার সাপ্লাই বদলানোর জন্য মিসাইল খুলে ফেলার প্রয়োজন হয়েছিল। এর মধ্যে পরিবারের একজনের মৃত্যুর খবর জানান হয়েছিল নাগরাজকে। ক্রন্দনরত নাগরাজ আমার সঙ্গে দেখা করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসবেন। এইসব সাহসী মানুষদের কথা কোনও ইতিহাস গ্রন্থে কোনওদিন লেখা হবে না। কিন্তু এই রকম নীরব মানুষদের কঠোর পরিশ্রমেই দেশের উন্নতি হয়েছে। নাগরাজকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমার দলের সবার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম যারা মানসিক আঘাত আর দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। আমার এসএলভি-৩ 'এর অভিজ্ঞতার কথা তাদের বললাম। 'আমার লঞ্চ ভেহিকল পড়েছিল সমুদ্রে, কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে তা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। আপনাদের মিসাইল তো আপনাদের চোখের সামনেই রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আপনারা কিছুই হারাননি, শুধু কয়েক সপ্তাহ আবার কাজ করতে হবে।' তাদের অচলতাকে এটা ঝাঁকুনি দিল এবং গোটা দল সাবসিস্টেমের সমস্যা সমাধানে ফিরে গেল।

সংবাদপত্র পিছু লেগে গেল দারুণভাবে। পাঠকের উদ্ভট কল্পনার সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে ফ্লাইট স্থগিতের বিষয়টি তুলে ধরল। কার্টুনিস্ট সুধীর ধর স্কেচ আঁকলেন, একজন দোকানদার সেলসম্যানের কাছে একটা পণ্য ফেরত

www.pathagar.com

দিয়ে বলছে যে *অগ্নির* মত এটাও চলবে না। আরেকজন কার্টুনিস্ট দেখালেন, *অগ্নির* একজন বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করছেন যে উৎক্ষেপণ স্থগিতের কারণ প্রেস বাটন স্পর্শ করাই হয়নি। *হিন্দুস্তান টাইমস* দেখাল, একজন নেতা সাংবাদিকদের বলছেন, 'আতংকিত হবার কিছু নেই... এটা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, অহিংস মিসাইল।'

পরবর্তী দশদিন ঘড়ির কাঁটা ধরে প্রতিটা মুহূর্তে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর আমাদের বিজ্ঞানীরা মিসাইলটিকে ১৯৮৯ সালের ১ মে উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত করে ফেললেন। কিন্তু আবারও, টি-১০ সেকেন্ডে স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার চেকআউট পিরিয়ডের সময়, একটা Hold সংকেত পাওয়া গেল। নিবিড় তদন্তে দেখা গেল, নিয়ন্ত্রণের অন্যতম অংশ এস১—টিভিসি ঠিকমত কাজ করছে না। উৎক্ষেপণ আবারও স্থগিত করা হল। এখন, এ ধরনের ঘটনা রকেট বিজ্ঞানে খুবই সাধারণ একটা বিষয় আর অন্যান্য দেশেও প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু প্রতীক্ষমান জাতির মেজাজ ছিল না আমাদের অসুবিধাগুলো বোঝার। *হিন্দু* পত্রিকায় মুদ্রিত কেশবের আঁকা একটা কার্টুনে দেখা গেল, একজন গ্রামবাসী কিছু কারেন্সি নোট গুনছে আর অপর একজনের কাছে মন্তব্য করছে : 'হ্যাঁ, এই হল পরীক্ষা স্থলের নিকটবর্তী আমার কুটির থেকে সরে যাওয়ার খেসারত—আরও কয়েকবার স্থগিতের ঘটনা ঘটলে নিজের জন্য একটা দালান তুলতে পারব.....।' আরেকজন কার্টুনিস্ট *অগ্নিকে* আখ্যা দিল 'আইডিবিএম— ইন্টারমিটেন্টলি ডিলেইড ব্যালিস্টিক মিসাইল।' আমুলের কার্টুনে পরামর্শ দেওয়া হল যে, *অগ্নির* যা করা দরকার তাহল জ্বালানি হিসেবে তাদের বাটার ব্যবহার করা!

কিছুটা সময় আমি অবসর নিলাম, ডিআরডিএল—আরসিআইয়ের সাথে কথা বলার জন্য আইটিআরে রেখে এলাম আমার দলকে। ১৯৮৯-এর ৮মে কর্ম ঘন্টা শেষ হওয়ার পর ডিআরডিএল-আরসিআইয়ের কর্মীরা জড়ো হয়েছিল। আমি বক্তৃতা দিলাম ২০০০-এরও বেশি ব্যক্তির জমায়েতে। '*অগ্নির* মত কোনও প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম সুযোগ দেওয়া হয় খুব কমই। আমাদের বিশাল এক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বড় সুযোগের সঙ্গে সমানভাবে আসে বড় চ্যালেঞ্জও। আমাদের হাল ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয় আর আমরা সমস্যার কাছে হেট মুণ্ডু হতে পারি না। দেশ আমাদের কাছে সফলতা আশা করে। এখন সাফল্যের জন্য লক্ষ্য স্থির করা যাক।' আমার বক্তৃতা প্রায় শেষ করেছি, ঠিক তখন, আবিষ্কার করলাম আমার লোকদের আমি বলছি, 'আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করছি, এ মাস শেষ হবার আগেই সফলভাবে *অগ্নি* উৎক্ষেপণের পর আমরা ফিরে আসব।'

দ্বিতীয় প্রচেষ্টার সময় যে অংশে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ অনুযায়ী কন্ট্রোল সিস্টেম নতুন করে ঘষে-মেজে ঠিকঠাক করা হল। এ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল একটা ডিআরডিও-আইএসআরও দলের ওপর। তারা আইএমআরওর লিকুইড প্রপেল্যান্ট সিস্টেম কমপ্লেক্স (এলপিএসসি)-এ ফার্স্ট

www.pathagar.com

স্টেজ কন্ট্রোল সিস্টেম মেরামতির কাজ সম্পন্ন করল। বিপুল একাগ্রচিত্ততা ও ইচ্ছাশক্তির জোরে রেকর্ড সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারল তারা। এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না যে শত শত বিজ্ঞানী ও কর্মী অবিরাম কাজ করে মাত্র ১০ দিনেই সিস্টেমটাকে প্রস্তুত করে ফেলল। এগারতম দিনে পরিশোধিত কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ে ত্রিবান্দ্রাম থেকে বিমান আকাশে উড়ল আর আইটিআরের কাছেই ল্যান্ড করল। কিন্তু এবার বাধা হয়ে উঠল শত্রুর মত খারাপ আবহাওয়া। একটা ঘূর্ণী-ঝড়ের আশঙ্কা জোরদার হচ্ছিল। সমস্ত কর্মকেন্দ্র সংযুক্ত ছিল স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ও এইচএফ লিঙ্কের মাধ্যমে। দশ-মিনিট বিরতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করল আবহগত ডাটা।

শেষ পর্যন্ত উৎক্ষেপণের শিডিউল নির্ধারিত হল ২২ মে ১৯৮৯। তার আগের রাতে ড. অরুণাচলম, জেনারেল কেএন সিং ও আমি একত্রে হাঁটছিলাম প্রতিরক্ষামন্ত্রী কেসি পন্তের সঙ্গে। উৎক্ষেপণ দেখতে তিনি আইটিআরে এসেছিলেন। রাতটা ছিল পূর্ণিমার, প্রচন্ড জোয়ার এসেছিল এবং ঢেউ সগর্জনে আছড়ে পড়ছিল, যেন সেই মহাসর্বশক্তিমানের গৌরব ও ক্ষমতার গান গাইছিল। আমরা কি আগামীকাল *অগ্নি* উৎক্ষেপণে সফল হব? এ প্রশ্ন ছিল আমাদের সবার মনেই, কিন্তু আমরা কেউই চন্দ্রালোকিত রাতের মোহিনী সৌন্দর্য্যের ঐন্দ্রজালিকতা ভাঙতে চাইছিলাম না। দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালাম! আগামীকাল অগ্নি উৎক্ষেপণের সাফল্যে কি রকম উৎসব করতে বলেন আপনি আমাকে?' প্রশ্নটা ছিল সাধারণ, এর জবাব কি হতে পারে তার জবাব তাৎক্ষণিকভাবে আমার মাথায় এল না। আমি কি চাই? আমার নেই কি? আর কি আছে যা আমাকে আরও সুখী করবে? আর তখনই আমি উত্তরটা খুঁজে পেলাম। 'আরসিআইতে লাগানোর জন্য আমাদের ১০০০০০ চারাগাছ প্রয়োজন,' আমি বললাম। তার মুখ বন্ধুত্বের আভায় আলোকিত হয়ে উঠল। *'অগ্নির জন্য মা পৃথিবীর আশীর্বাদ কিনছেন আপনি,'* প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কেসি পন্ত সরস জবাব দিলেন। 'আগামীকাল আমরা সফল হব,' তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

পরদিন *অগ্নি* উৎক্ষিপ্ত হল ০৭১৪ ঘন্টায়। উৎক্ষেপণটা ছিল নিখুঁত। একেবারে কেতাবি ট্রাজেক্টরি অনুসরণ করল মিসাইলটা। সমস্ত ফ্লাইট প্যারামিটার কাজ করল যথাযথ। ব্যাপারটা ছিল দুঃস্বপ্নময় ঘুম থেকে এক সুন্দর সকালে জেগে ওঠার মত। পাঁচ বছর বিভিন্ন কেন্দ্রে অবিরাম কাজ করার পর অবশেষে আমরা লঞ্চ প্যাডে পৌঁছেছি। গত পাঁচ সপ্তাহে আমাদের বসবাস করতে হয়েছে ধারাবাহিক সংকটের ভিতর। সমস্ত ব্যাপারটা থামিয়ে দেওয়ার চাপ ছিল আমাদের ওপর সবখান থেকেই। সে চাপ আমরা সহ্য করেছিলাম। আর আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজটা করতে পেরেছি! এটা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম একটা মুহূর্ত। মিসাইলটার ৬০০ সেকেন্ড উড্ডয়ন এক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের এতদিনের অবসাদ ধুয়ে দিল। আমাদের প্রচন্ড শ্রমের বছরগুলোর কী বিস্ময়কর উত্থান। সেই রাতে আমার ডাইরিতে লিখেছিলাম ঃ

www.pathagar.com

Do not look at Agni
as an entity directed upward
to deter the ominous
or exhibit your might.
It is fire
in the heart of an Indian.
Do not even give it
the form of a missile
as it clings to the
burning pride of this nation
and thus is bright.

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী *অগ্নির* উৎক্ষেপণকে বললেন 'নিজস্ব উপায়ে আমাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার অব্যাহত চেষ্টার এ এক বিশাল অর্জন। *অগ্নির* মাধ্যমে প্রদর্শিত প্রযুক্তি আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য অগ্রসর প্রযুক্তির দেশীয় উন্নয়নের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।' 'আপনার প্রচেষ্টায় দেশ গর্বিত,' তিনি আমাকে বললেন। প্রেসিডেন্ট ভেঙ্কটরমন *অগ্নির* সাফল্যে তার স্বপ্ন পূরণ দেখতে পেলেন। সিমলা থেকে তিনি কেবল করলেন, 'আপনার কঠিন পরিশ্রম, প্রতিভা আর আত্মোৎসর্গের এই হল উপহার।'

এই প্রযুক্তি মিশন সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক ভুল তথ্যের পর ভুল তথ্য। *অগ্নি* কখনই শুধুমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র হিসেবে তৈরির উদ্দেশ্য ছিল না। দূর পাল্লার অ-পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সামর্থ্য অর্জনটাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। সমকালীন রণকৌশলগত তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটা আমাদের টেকসই অ-পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারীও করেছিল।

অগ্নির টেস্ট ফায়ার বিশাল ক্রোধ সৃষ্টি করেছিল অনেকের মধ্যে। আমেরিকার একটা সুপরিচিত প্রতিরক্ষা জার্নালের প্রতিবেদনে তা প্রকাশিত হল। যারা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষ করে মার্কিন কংগ্রেস সদস্যরা দ্বৈত-ব্যবহার উপযোগী ও মিসাইল-সংশ্লিষ্ট সকল প্রযুক্তি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিলেন, সেই সাথে বহুজাতিক সহযোগিতাও।

গ্যারি মিলহোলিন, একজন তথাকথিত মিসাইল ওয়ারহেড টেকনোলজি বিশেষজ্ঞ, *দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* পত্রিকায় দাবি করলেন যে ভারত পশ্চিম জার্মানির সাহায্য নিয়ে *অগ্নি* তৈরি করেছে। আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না যখন পড়লাম যে, জার্মান অ্যারোস্পেস রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্ট (ডিএলআর) তৈরি করেছে *অগ্নির* গাইডেন্স সিস্টেম, ফার্স্ট-স্টেজ রকেট, এবং একটা কম্পোজিট নোজ, আর *অগ্নির* অ্যারোডাইনামিক মডেল পরীক্ষা করা

www.pathagar.com

হয়েছিল ডিএলআরের উইন্ড টানেলে। ডিএলআরের পক্ষ থেকে এসব বক্তব্যের প্রতিবাদ আসতে বিলম্ব হল না। বরং তারা অভিযোগ করল যে, *অগ্নি*র গাইডেন্স ইলেকট্রনিক্স সরবরাহ করেছে ফ্রান্স। মার্কিন সিনেটর জেফ বিঙ্গাম্যান এমন কি এত দূর পর্যন্ত বললেন, যে, *অগ্নি*র জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু আমি চুরি করেছি ১৯৬২ সালে ওয়ালপ্স দ্বীপে আমার চার মাস অবস্থানকালে। তবে প্রকৃত যে কথাটি তিনি চেপে গেলেন তাহল, ২৫ বছরেরও বেশি সময় আগে আমি যখন ওয়ালপ্স দ্বীপে ছিলাম তখনও পর্যন্ত *অগ্নি*তে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে সে ধরনের প্রযুক্তি যুক্তরাষ্ট্রে ছিল না।

আজকের বিশ্বে প্রযুক্তিগত পশ্চৎপদতার সুযোগ নিয়ে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে অধীন করে। আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা কি এর সাথে আপোস করতে পারি? এই হুমকির বিরুদ্ধে দেশের অবিচ্ছেদ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের দেশের মুক্তি এনেছিলেন যে পূর্বপুরুষরা তাদের মহিমা কি আমরা উঁচুতে তুলে ধরব না? তাদের স্বপ্ন কেবল তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন আমরা প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব।

অগ্নি উৎক্ষেপণ পর্যন্ত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়েছিল আমাদের দেশের নিরাপত্তা রক্ষার কঠোর প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালনের জন্য, আমাদের চারপাশের দেশগুলোর হাঙ্গামা থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করার জন্য, এবং বাইরের আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দিতে। এখন *অগ্নি* তৈরি হওয়ায় ভারত এমন এক স্তরে উপনীত হল যে, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি সে প্রতিরোধ করার সক্ষমতা অর্জন করল।

আইজিএমডিপির পাঁচ বছরের কাজের পূর্ণতা ছিল *অগ্নি*। আমাদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে *পৃথ্বী* ও *ত্রিশূল* আগেই সংযোজিত হয়েছিল *নাগ* ও *আকাশ* আমাদের নিয়ে যায় এমন স্তরে যেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা খুবই সামান্য অথবা একেবারেই নেই। এই দুই মিসাইল সিস্টেম ছিল বিশাল প্রযুক্তিগত ব্রেকথ্রু। এগুলোর ওপর আমাদের আরও দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন ছিল।

১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে বোম্বাইয়ের মহারাষ্ট্র একাডেমি অব সায়েন্সেস আমন্ত্রণ জানাল জওহরলাল নেহরু স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। একটা দেশীয় এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, যেটার নাম দিয়েছিলাম *অস্ত্র*, তৈরি করার আমার পরিকল্পনা স্ফুটনোন্মুখ বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরার এ সুযোগ আমি কাজে লাগলাম। এই মিসাইলটি হবে ইন্ডিয়ান লাইট কমব্যাট এয়ারক্র্যাফটের (এলসিএ)-এর জোড়। আমি তাদের বললাম যে, *নাগ* মিসাইল সিস্টেমের জন্য ইমেজিং ইনফ্রা রেড (আইআইআর) এবং মিলিমেট্রিক ওয়েভ (এমএমডব্লিউ) রাডার টেকনোলজির ক্ষেত্রে আমাদের কাজ মিসাইল টেকনোলজিতে আন্তর্জাতিক ভ্যানগার্ডের আসনে বসিয়েছে আমাদের। রি-এন্ট্রি টেকনোলজি অর্জনের কার্বন-

www.pathagar.com

কার্বন ও অ্যাডভান্সড কম্পোজিট ম্যাটারিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ও আমি তাদের সামনে তুলে ধরলাম। *অগ্নি* ছিল একটা প্রযুক্তিগত প্রচেষ্টার ফলাফল যার শুরুটা করে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, যখন দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার দীর্ঘ অসাড়তা ভেঙে বেরিয়ে আসার এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর অধস্থনতার মরা চামড়া ফেলে দেওয়ার।

১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে *পৃথ্বী*র দ্বিতীয় ফ্লাইটও সফল হল। আজ বিশ্বের সেরা সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল হিসেবে *পৃথ্বী* প্রমাণিত। এটা ২৫০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বহন করতে পারে ১০০০ কেজি ওয়ারহেড আর ৫০ মিটার রেডিয়াসের মধ্যে তা ডেলিভারি দিতে পারে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পরিচালনার মাধ্যমে অসংখ্য ওয়ারহেডের ভার ও ডেলিভারির দূরত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি অনুযায়ী। সব দিক থেকেই এটা শতভাগ দেশীয়—ডিজাইন, পরিচালনা, মোতায়েন। প্রচুর সংখ্যায় এটা তৈরি করা সম্ভব, যেহতু বিডিএলের উৎপাদন সুবিধাও এটার সাথে সাথেই বেড়েছে বহুগুণ। সেনাবহিনী এর গুরুত্ব দ্রুত ধরতে পেরেছিল। তারা সিসিপিএর কাছে আবেদন জানিয়েছিল *পৃথ্বী* ও *ত্রিশূল* মিসাইল সিস্টেমের প্লেসিং অর্ডারের জন্য, এটা ছিল এমন একটা ব্যাপার যা আগে আর কখনও ঘটেনি।

www.pathagar.com

৪

ধ্যান

[১৯৯১—]

আমরা সৃষ্টি ও ধ্বংস করি
এবং আবার সৃষ্টি করি
এমন আকৃতিতে যা কেউ জানে না।

আল-ওয়াকিয়াহ্
কুরআন ৫৬ : ৬১

www.pathagar.com

১৫

১৯৯০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে, মিসাইল কর্মসূচির সাফল্য উদযাপন করল জাতি। ড. অরুণাচলমের সঙ্গে আমাকেও পদ্মবিভূষণ পুরস্কার দেওয়া হল। আমার অপর দুই সহকর্মী— জেসি ভট্টাচারিয়া ও আরএন আগরওয়াল— ভূষিত হলেন পদ্মশ্রী পুরস্কারে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম বারের মত একই প্রতিষ্ঠানের এতজন বিজ্ঞানীর নাম যুক্ত হয়েছিল পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায়। আমাকে এক দশক আগে দেওয়া পদ্মভূষণ পুরস্কারের স্মৃতি জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছিল আবার। আমি কম-বেশি আগের মতই জীবন যাপন করছিলাম—দশ ফুট চওড়া ও বারো ফুট লম্বা একটা কামরায়, সেটা সজ্জিত ছিল প্রধানত বই, কাগজ আর কয়েকটা ভাড়া করা আসবাবপত্রে। একমাত্র পার্থক্য আগের কামরাটা ছিল ত্রিবান্দ্রামে আর এবারেরটা হায়দারাবাদে। মেস বেয়ারা সকালের নাশতার জন্য আমার *ইডলিস* ও বাটারমিল্ক নিয়ে এল আর পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমাকে নীরব আভিনন্দন জানাল হাসি দিয়ে। আমার দেশবাসীর এই স্বীকৃতি আমাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। প্রচুর অর্থ রোজগারের জন্য বিপুলসংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী প্রথম সুযোগেই এ দেশ ছেড়ে চলে যান বিদেশে। এটা সত্যি যে তারা অবশ্যই বিশাল আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন, কিন্তু দেশের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কি তার তুলনা চলে?

www.pathagar.com

আমি কিছু সময় একাকী নীরব ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়ি। রামেশ্বরমের বালু ও শঙ্খ, রামনাথপুরমে ইয়াডুরাই সলোমনের তত্ত্বাবধান, ত্রিচিতে রেভারেন্ড ফাদার সেকুয়েইরার এবং মাদ্রাজে অধ্যাপক পান্ডালাইয়ের পথনির্দেশনা, বাঙ্গালোরে ড. মেডিরাট্টার উৎসাহ, অধ্যাপক মেননের সঙ্গে হোভারক্র্যাফটে উড্ডয়ন, ভোর হবার আগে অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে তিলপাটতপরিদর্শন, এসএলভি-৩ ব্যর্থতার দিন ড. ব্রহ্ম প্রকাশের নিরাময়ী স্পর্শ, এসএলভি-৩ উৎক্ষেপণে জাতীয় বিজয়োল্লাস, ম্যাডাম গান্ধীর সপ্রশংস উপলব্ধিমূলক হাসি, ভিএসএসসিতে এসএলভি-৩ পরবর্তী ফুটন্ত অবস্থা, ডিআরডিওতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর পিছনে ড. রামান্নার বিশ্বাস, আইজিএমডিপি, আরসিআই সৃষ্টি, *পৃথ্বী*, *অগ্নি*... স্মৃতির বন্যা ভেসে গেল আমার ওপর দিয়ে। এসব মানুষ এখন কোথায়? আমার বাবা, অধ্যাপক সারাভাই, ড. ব্রহ্ম প্রকাশ? আবার যদি তাদের সঙ্গে দেখা হত আর আমার আনন্দ ভাগ করে নিতে পারতাম। আমি অনুভব করি, স্বর্গের পৈত্রিক শক্তি আর প্রকৃতির মাতৃক ও বৈশ্বিক শক্তি পিতা-মাতার মত আমাকে আলিঙ্গন করে, যেন বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে তারা ফিরে পেয়েছে। আমার ডাইরিতে আমি দ্রুত হাতে লিখলাম ঃ

Away! fond thoughts, and vex my soul no more!
Work claimed my wakeful nights, my busy days
Albeit brought memories of Rameswaram shore
Yet haunt my dreaming gaze!

এক পক্ষকাল পরে, আয়ার ও তার দল *নাগ*-এর মেইডেন ফ্লাইট চালিয়ে মিসাইল কর্মসূচিতে একটা পুরস্কার যোগ করলেন। পরদিনও তারা এ পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন, এভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের প্রথম অল-কম্পোজিট এয়ারফ্রেম ও প্রপালসন সিস্টেমের দুইবার পরীক্ষা। দেশীয় থার্মাল ব্যাটারির মূল্যও প্রমাণিত হয়েছিল এসব পরীক্ষায়।

'ফায়ার-অ্যান্ড-ফরগেট' সামর্থ্যযুক্ত তৃতীয় প্রজন্মের ট্যাংক-বিধ্বংসী মিসাইল সিস্টেমের অধিকারী হবার মর্যাদা অর্জন করেছিল ভারত। তা ছিল দুনিয়ার যে কোনও স্টেট-অব-দ্য আর্ট প্রযুক্তির সমান। দেশীয় কম্পোজিট প্রযুক্তি বড় একটা মাইলস্টোন অতিক্রম করেছিল। *নাগ*-এর সাফল্যও নিশ্চিত করেছিল কনসোর্টিয়াম অভিগমনের ফলপ্রদতা, যা পরিচালনা করেছিল *অগ্নির* সফল নির্মাণ।

নাগে ব্যবহার করা হয় প্রধান দুটো প্রযুক্তি—একটা ইমেজিং ইনফ্রা রেড (আইআইআর) সিস্টেম এবং একটা মিলিমেট্রিক ওয়েভ (এমএমডব্লিউ) সিকার রাডার। প্রথমটার গাইডিং আই হিসেবে। দেশের একক কোনও গবেষণাগারের

www.pathagar.com

সামর্থ্য ছিল না এসব প্রচন্ড অগ্রবর্তী সিস্টেম তৈরি করার। কিন্তু সাফল্য লাভের তাগিদ ছিল, যা থেকে ফল পাওয়া গিয়েছিল কার্যকর যৌথ প্রচেষ্টায়। চন্ডিগড়ের সেমি কণ্ডাক্টর কমপ্লেক্স তৈরি করেছিল চার্জ কাপল্ড ডিভাইস (সিসিডি) বিন্যাস। দিল্লীর সলিড ফিজিক্স ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিল মার্কারি ক্যাডমিয়াম টেলুরাইড (এমসিটি) ডিটেকটর। দিল্লীর ডিফেন্স সেন্টার (ডিএসসি) জুলস টমসন এফেক্টের ওপর ভিত্তি করে গড়ে দিয়েছিল একটা দেশীয় কুলিং সিস্টেম। দেরাদুনের ডিফেন্স ইলেকট্রনিকস ল্যাবরেটরি (ডিইএএল) উদ্ভাবন করেছিল ট্রান্সমিটার রিসিভার ফ্রন্ট এন্ড।

স্পেশাল গ্যালিয়াম আর্সেনাইড গান, স্কটকি ব্যারিয়ার মিক্সার ডিওড্স, অ্যান্টেনা সিস্টেমের জন্য কমপ্যাক্ট কমপ্যারাটর— এসব উচ্চতর প্রযুক্তি ডিভাইসের সবগুলোর ক্ষেত্রে ক্রয়-নিষেধাজ্ঞা চাপান হয়েছিল ভারতের ওপর। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা দিয়ে কখনও উদ্ভাবনা দমন করা যায় না।

আমি ওই মাসেই মাদুরাই কামারাজ ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম তাদের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে। যখন মাদুরাইতে পৌঁছলাম, তখন আমার হাই স্কুল শিক্ষক ইয়াডুরাই সলোমনের কথা জিজ্ঞেস করলাম, এতদিনে তিনি রেভারেন্ড হয়েছিলেন আর তার বয়স হয়েছিল আশি বছর। আমাকে বলা হল যে, মাদুরাইয়ের এক শহরতলিতে তিনি বাস করেন। আমি ট্যাক্সি নিয়ে তার বাড়িতে গেলাম। রেভারেন্ড সলোমন জানতেন, ওই দিন আমি সমাবর্তন ভাষণ দেব। কিন্তু সেখানে যাবার কোনও উপায় ছিল না তার। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে এক হৃদয়স্পর্শী পুনর্মিলন ঘটল। ড. পিসি আলেকজান্ডার, তামিল নাড় র গভর্ণর, তিনি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করছিলেন, এটা দেখে খুব আলোড়িত হলেন যে বৃদ্ধ শিক্ষক তার বহু দিন আগের ছাত্রকে ভুলে যাননি, তিনি তাকে মঞ্চে আসন নেবার অনুরোধ জানালেন।

'প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটা সমাবর্তন দিবস হচ্ছে শক্তির ফ্লাডগেট খুলে দেবার মত ব্যাপার যা, প্রতিষ্ঠান সংস্থা ও শিল্পকারখানায় সজ্জিত হলে, জাতি-গঠনে সহযোগিতা করে,' আমি তরুণ গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বললাম। আমি অনুভব করলাম, কোনও দিক থেকে আমি রেভারেন্ড সলোমনের কথারই প্রতিধ্বনি করছি, যা তিনি বলেছিলেন প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগে। বক্তৃতা শেষ হলে আমি মাথা নুইয়ে সম্মান জানালাম আমার শিক্ষককে। 'মহান স্বপ্নদ্রষ্টাদের বিশাল স্বপ্ন হয় সর্বদা সীমা অতিক্রান্ত,' আমি রেভারেন্ড সলোমনকে বললাম। 'তুমি যে শুধু আমার লক্ষ্যেই পৌঁছেছ'তাই নয়, কালাম! তুমি ওগুলোর দীপ্তিকেও ছাড়িয়ে গেছ,' তিনি আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসা গলায় আমাকে বললেন।

www.pathagar.com

পরের মাসে আমি ত্রিচিতে গেলাম আর সেই সুযোগটাকে কাজে লাগালাম সেন্ট জোসেফ'স কলেজ পরিদর্শনে। সেখানে রেভারেন্ড ফাদার সেকুয়েইরা, রেভারেন্ড ফাদার এরহার্ট, অধ্যাপক থোথাথরি আয়েঙ্গারকে খুঁজে পেলাম না। কিন্তু আমার মনে হল সেন্ট জোসেফ'স-এর প্রতিটা পাথরে তখনও যেন ওইসব মহান মানুষের জ্ঞানের ছাপ লেগে ছিল। সেন্ট জোসেফ'স-এ আমার স্মৃতির দিনগুলোর কথা আমি তরুণ ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করলাম আর আমাকে যারা গড়ে তুলেছিলেন সেই শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

আকাশ-এর টেস্ট ফায়ারিং দিয়ে আমরা উদযাপন করলাম জাতির চুয়াল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস। প্রহ্লাদ ও তার দল কম্পোজিট মোডিফাইড ডাবল বেজ প্রপেল্যান্টের ভিত্তিতে নতুন একটা সলিড প্রপেল্যান্ট বুস্টার সিস্টেম তৈরি করেছিল। নজিরবিহীন উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এই প্রপেল্যান্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল দূরপাল্লার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইলের নিশ্চয়তা বিধানে। আঘাতযোগ্য ক্ষেত্রে ভূমিভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষায় একটা জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছিল দেশ।

১৯৯০ সালের শেষ দিকে, বিশেষ এক সমাবর্তনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডক্টর অব সায়েন্স উপাধিতে সম্মানিত করল। নেলসন ম্যান্ডেলার মত মানুষের সঙ্গে একই তালিকায় আমার নাম দেখে আমি কিছুটা হতবুদ্ধি হয়েছিলাম। একই সমাবর্তনে তাকেও সম্মানিত করা হয়। ম্যান্ডেলার মত এক কিংবদন্তির সঙ্গে সাধারণ মিল আমার কি ছিল? হয়তো সেটা ছিল আমাদের মিশনে আমাদের নাছোড়বান্দা মনোভাব। আমার দেশে আমার অ্যাডভান্সিং রকেট বিজ্ঞানের মিশন ম্যান্ডেলার মিশনের সঙ্গে তুলনা করলে কিছুই ছিল না। কারণ ম্যান্ডেলার মিশন ছিল বিপুল গণ-মানবতার জন্য মর্যাদা অর্জনের মিশন। কিন্তু আমাদের আকাঙ্খার ব্যাকুলতার মধ্যে কোনও ফারাক ছিল না। 'দ্রুত কিন্তু কৃত্রিম আনন্দের পিছনে ছুটে বরং নিখাদ সাফল্য অর্জনের জন্য আরও বেশি নিবেদিত প্রাণ হও,' তরুণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমার এই ছিল পরামর্শ।

মিসাইল কাউন্সিল ১৯৯১ সালকে ডিআরডিএল এবং আরসিআইয়ের জন্য প্রবর্তনার বছর হিসেবে ঘোষণা করল। আইজিএমডিপিতে আমরা যখন একটা ধারাবাহিক ইঞ্জিনিয়ারিং রুট পছন্দ করেছিলাম, তখন আমরা একটা রাফট্র্যাক নির্বাচন করেছিলাম। *পৃথ্বী* ও *ত্রিশূল*-এর উন্নয়নমূলক পরীক্ষা সম্পাদনের পর, আমাদের পছন্দ এখন গড়িয়েছে পরীক্ষার ওপর। এক বছরের মধ্যে ইউজার ট্রায়ালের জন্য আমার সহকর্মীদের আমি উদ্দীপ্ত করলাম। আমি জানতাম যে এটা কঠিন কাজ হবে। কিন্তু সেটা আমাদের নিরুৎসাহিত করবে না।

রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহন তার দায়িত্ব থেকে অবসর নিলেন, *ত্রিশূলের* দায়িত্ব চাপল কাপুরের কাঁধে। মিসাইল কমান্ড গাইডেন্স মোহন যেভাবে বুঝতেন আমি সব সময়ই তার অনুরাগী ছিলাম। এই নাবিক-শিক্ষক-বিজ্ঞানী এই ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

দেশের অন্য আর সব বিশেষজ্ঞকে ছাড়িয়ে যেতে পারতেন। আমি *ত্রিশূল* বিষয়ক মিটিংগুলোয় কমান্ড লাইন অব সাইট (সিএলওএস) গাইডেন্স সিস্টেমের নানা ধরণ নিয়ে তার মূল্যবান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কথা চিরদিন মনে রাখব। একবার তিনি আমাকে একটা কবিতা দেখিয়েছিলেন, তাতে তিনি আইজিএমডিপি-এর প্রকল্প পরিচালকের প্রতি ঋণ স্বীকারের তুলে ধরেন। নিঃশ্বাস ছাড়বার এটা ছিল একটা ভাল উপায় ঃ

Impossible timeframes,
PERT charts to boot
Are driving me almost crazy as a coot;
Presentations to MC add to one's woes,
If they solve anything, Heaven only knows.
Meetings on holidays, even at night,
The family is fed up,
And all ready to fight.

My hands are itching
to tear my hair—
But alas! I haven't any more to tear...

আমি তাকে বলেছিলাম, 'আমার সব সমস্যা আমি হস্তান্তর করেছি ডিআরডিএল, আরসিআই, আর অংশগ্রহণকারী অন্যান্য গবেষণাগারে কর্মরত আমার সেরা দলগুলোর কাছে। আর সে জন্যেই আমার মাথাভর্তি চুল রয়ে গেছে।'

১৯৯১ সালটা শুরু হল অত্যন্ত অশুভ একটা লক্ষণ নিয়ে। ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১-এর রাতে ইরাক ও মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর মধ্যে শুরু হয়ে গেল উপসাগরীয় যুদ্ধ। এক ধাক্কায় গোটা জাতির কল্পনা দখল করে নিল রকেট ও মিসাইল। লোকজন কফি হাউজ ও চায়ের দোকানে স্কাড ও প্যাট্রিওট ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। শিশুরা মিসাইলের আকৃতির ঘুড়ি ওড়াতে লাগল, আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে লাগল। *পৃথ্বী* ও *ত্রিশূল*-এর সফল পরীক্ষা উপসাগরীয় যুদ্ধের উত্তেজনা থেকে একটি জাতিকে স্বস্তি দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। *পৃথ্বী* ও *ত্রিশূল* গাইডেন্স সিস্টেমের প্রগ্রামেবল ট্র্যাজেক্টরি ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে সংবাদপত্রের খবর ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। গোটা জাতি আমাদের ওয়ারহেড ক্যারিয়ার ও উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত মিসাইলের মধ্যে তুলনা করতে লাগল। তারা আলোচনা করতে লাগল *পৃথ্বী* কি স্কাডের চেয়েও শক্তিশালী, *আকাশ*

www.pathagar.com

কি প্যাট্রিওটের মত লক্ষ্যভেদী, ইত্যাদি। আমার কাছ থেকে 'হ্যাঁ' অথবা 'কেন নয়?' শুনে তাদের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত গর্বে ও আত্মতৃপ্তিতে।

মিত্রবাহিনী এগিয়ে ছিল প্রযুক্তির সর্বসাম্প্রতিক ব্যবহারের দিক দিয়ে। তাদের কৌশলগত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হয়েছিল আশি ও নব্বই দশকের প্রযুক্তি অনুযায়ী। কিন্তু ইরাকের কাছে যে সব অস্ত্র ছিল সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল ষাট ও সত্তর দশকের প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

এখন বলতেই হয়, আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে আধিপত্য অর্জন। চীনা যুদ্ধ বিষয়ক দার্শনিক সুন ৎজু ২০০০ বছর আগে বলে গেছেন, যুদ্ধে আসল বিষয় হচ্ছে শত্রুকে শারীরিক ভাবে নয়, মানসিক ভাবে পরাস্ত করা, তার মনে পরাজয়ের বোধ ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সে ভেঙে পড়বে, তার পতন ঘটবে, আসল কাজ হল তার ইচ্ছা শক্তিকে ভেঙে দেওয়া। আজকের দিনে মনে হয় দার্শনিক সুন বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ কৌশলে প্রযুক্তির আধিপত্য কল্পনা করতে পেরেছিলেন। উপসাগরীয় যুদ্ধে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের সঙ্গে মিসাইল ফোর্স মিলিত হয়ে যে অবস্থাটা তৈরি করেছিল, সেটা মিলিটারি স্ট্রাটেজিক এক্সপার্টদের জন্য ছিল এক মহাভোজ। এ ক্ষেত্রে মিসাইল, ইলেকট্রনিক ও ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার নিয়েছিল প্রধান ভূমিকা। এটা ছিল একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ-নাটকের পর্দা উত্তোলন।

ভারতে, এমন কি আজকের দিনেও, অধিকাংশ মানুষ প্রযুক্তি বলতে বোঝে ধোঁয়াচ্ছন্ন ইস্পাত কারখানা অথবা ঘড়ঘড়ে যন্ত্রপাতি। প্রযুক্তির এ এক অপর্যাপ্ত ধারণা। মধ্যযুগে হর্স কলার উদ্ভাবন বিশাল পরিবর্তন এনেছিল কৃষি পদ্ধতিতে। এর কয়েক শতাব্দি পর উদ্ভাবিত বেসমার ফার্নেস প্রযুক্তির দিকে ছিল আরেক অগ্রগতি। আসলে কৌশল আর যন্ত্র মিলে তৈরি হয় প্রযুক্তি। আর এর ব্যবহার চলে সর্বক্ষেত্রে— কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন তৈরিতে, মৎস্য উৎপাদনে, আগাছা উপড়ে ফেলতে, থিয়েটারে আলো জ্বালাতে, রোগীদের চিকিৎসা করতে, ইতিহাস শেখাতে, যুদ্ধে লড়াই করতে, এমন কি যুদ্ধ প্রতিরোধ করতেও।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল মিত্রবাহিনীর প্রযুক্তিগত আধিপত্যের ভিতর দিয়ে। এরপর ডিআরডিএল এবং আরসিআইয়ের ৫০০ বিজ্ঞানী একত্রিত হলেন নতুন ভাবে উত্থিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে। আমি একটা প্রশ্ন রাখলাম ঃ অন্যান্য দেশের টেকনোলজি ও অস্ত্রশস্ত্র কি কার্যকর? আর যদি তাই হয়, তাহলে কি আমাদেরও সে সবের উদ্যোগ নেওয়া দরকার? আলোচনায় আরও অনেক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন কার্যকর ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সাপোর্ট কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়? এলসিএর মত সমানভাবে প্রয়োজনীয় সিস্টেমের সাথে একই সময়ে কিভাবে মিসাইল উন্নয়ন কার্যক্রম চালান যাবে? আর অগ্রগতির জন্য প্রধান জায়গাগুলো কোথায়?

www.pathagar.com

তিন ঘন্টার প্রাণবন্ত আলোচনা শেষে বিজ্ঞানীরা শপথ নিলেন বেশ কয়েকটি বিষয়ে। যেমন *পৃথ্বীর* ডেলিভারি আরও নিখুঁত করে তুলতে সিইপি কমিয়ে আনা হবে, *ত্রিশূল*-এর জন্য ক ব্যান্ড গাইডেন্স আরও নিখুঁত করা হবে এবং বছরের শেষ নাগাদ অগ্নির সমস্ত কার্বন-কার্বন রি-এন্ট্রি কন্ট্রোল সারফেস তৈরি করা হবে। পরবর্তী সময়ে এসব শপথ পূরণ করা হয়েছিল। এ বছরেই *নাগ* পরীক্ষা করা হল ভূগর্ভে। *ত্রিশূল* ছোড়ার পর সেটা সমুদ্রপৃষ্ঠের মাত্র সাত মিটার ওপর দিয়ে ভেসে চলল, শব্দের গতির চেয়েও তিনগুণ বেশি গতিতে। এই পরীক্ষাটি ছিল একটা ব্রেকথ্রু। দেশীয় শিপ-লঞ্চড্ অ্যান্টি-সি-স্কিমার ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

একই বছর বোম্বাইয়ের আইআইটি আমাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করল। এ উপলক্ষে অধ্যাপক বি নাগ আমার সম্পর্কে বর্ণনা করলেন যে, আমি 'একটা নিখাদ প্রযুক্তিগত ভিত্তি সৃষ্টির পিছনে এক অনুপ্রেরণা, যেখান থেকে ভারতের ভবিষ্যৎ মহাকাশ কর্মসূচি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে।' হয়তো অধ্যাপক নাগ কেবল ভদ্রতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে ভারত আগামী শতাব্দীতে নিজের স্যাটেলাইট স্থাপন করতে পারবে মহাকাশের ৩৬০০০ কিলোমিটার দূরে এবং নিজেরই লঞ্চ ভেহিক্‌ল-এর সাহায্যে। তাছাড়া মিসাইল পাওয়ারেও পরিণত হবে ভারত। আমাদের দেশ বিপুল প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

১৫ অক্টোবর আমার বয়স হল ষাট বছর। আমি অবসরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আর কম সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের জন্য একটা স্কুল খোলার পরিকল্পনা করেছিলাম। আমার বন্ধু অধ্যাপক পি রামা রাও, যিনি ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পরিচালনা করছিলেন, আমার সঙ্গে মিলে স্কুলটা দেওয়ার জন্য লেগে গেলেন আর সেটার নামও ঠিক করে ফেললেন রাও-কালাম স্কুল। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারলাম না। কারণ ভারত সরকার আমাদের কাউকেই নিজ নিজ পদ থেকে অবসর দিল না।

এই সময়েই আমার স্মৃতিকথা, পর্যবেক্ষণ আর নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিমত লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ভারতীয় তরুণদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তাহল, স্বচ্ছ ভবিষ্যৎ-দর্শনের অভাব, নির্দেশনার অভাব। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই, আজকের এই আমাকে যারা গড়ে তুলেছিলেন তাদের কথা আর যে সব পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠেছিলাম সে সব কথা আমি লিখব। এর উদ্দেশ্য শুধু এই নয় যে কয়েকজন ব্যক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব, কিংবা আমার জীবনের নির্দিষ্ট কিছু চিত্র তুলে ধরব বিশেষ ভাবে। আমি আসলে যা বলতে চেয়েছি তাহল, জীবন সম্পর্কে কোনও মানুষেরই, সে যত বেচারাই হোক, কিংবা

www.pathagar.com

সুবিধাপ্রাপ্তহীন বা ক্ষুদ্র, কখনই হাতশ হওয়া উচিৎ নয়। সমস্যা হচ্ছে জীবনেরই একটা অংশ। ভোগান্তি হচ্ছে সাফল্যের সৌরভ। যেমন একজন বলেছেন ঃ

God has not promised
Skies always blue,
Flower-strewn pathways
All our life through;
God has not promised
Sun without rain,
Joy without sorrow,
Peace without pain.

আমি এ কথা বলব না যে আমার জীবন অন্য কারও জন্য একটা রোল মডেল হতে পারে। কিন্তু আমার নিয়তি যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে গরিব শিশুরা হয়তো বা একটু সান্ত্বনা পেতে পারে। এতে হয়তো তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রেরণা পাবে। তারা যেখানেই যাক, তাদের সচেতন হতে হবে যে খোদা তাদের সাথেই আছেন, আর তিনি যখন তাদের সাথে আছেন তখন কে পারে তাদের বিরুদ্ধে যেতে?

But God has promised
Strength for the day,
Rest for the labour
Light for the way.

আমার পর্যবেক্ষণে আমি দেখেছি, অধিকাংশ ভারতীয় অনাবশ্যক ভাবে দুর্দশা ভোগ করে আবেগ কিভাবে আয়ত্তে রাখতে হয় জানে না বলেই। মনস্তাত্ত্বিক সংকটেই তারা অবশ। 'পরবর্তী সর্বোত্তম বিকল্প,' 'ওটাই একমাত্র কার্যকর সুযোগ বা সমাধান,' এবং ' যে পর্যন্ত না সব কিছু ভালোর দিকে মোড় নেয়' ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের নৈমিত্তিক আলাপচারিতায় ব্যবহৃত কথাবার্তা। এইসব নেতীবাচক, আত্মপরাজয়মূলক চিন্তাভাবনা কেন আমরা ছুড়ে ফেলে দিতে পারি না? আমি অনেক সংগঠন আর অনেক মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি। তাদের অনেকের ছিল সীমাবদ্ধতা। আমার কথা মান্য করা ছাড়া তাদের যেন আত্মমূল্য প্রমাণের পথ ছিল না। ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ট্রাজেডি নিয়ে কেন লেখা হয় না? এবং সাংগঠনিক সাফল্যের পথ সম্পর্কে? প্রত্যেক ভারতীয়ের অন্তরের প্রচ্ছন্ন আগুনে ডানা গজাক, এবং এই মহান দেশের গৌরবে আকাশ আলোকিত হোক।

www.pathagar.com

১৬

প্রযুক্তি হচ্ছে দলগত তৎপরতা। বিজ্ঞানের সঙ্গে এখানেই এর অমিল। এটা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, বরং এর ভিত্তি হচ্ছে অনেক মানুষের মিথষ্ক্রিয়া। আমি মনে করি আইজিএমডিপির সবচেয়ে বড় সাফল্য এটা নয় যে রেকর্ড সময়ের মধ্যে দেশ স্টেট-অব-দ্য-আর্ট মিসাইল সিস্টেম অর্জন করেছে। বরং এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের কিছু দল। ভারতীয় রকেট বিজ্ঞানে আমার ব্যক্তিগত অর্জন সম্পর্কে কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে, আমি তাহলে তরুণদের কাজের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ সৃষ্টির কথাই বলব।

আকার নেবার একেবারে গোড়ার দিকে দলের অবস্থা থাকে শিশুর মত। সজীবতা, উদ্যম, কৌতূহল আর আনন্দের আকাঙ্খায় পরিপূর্ণ। শিশুদের ক্ষেত্রে এসব ইতিবাচক গুণ বিনষ্ট হতে পারে বাবা-মার ভুল গাইডের কারণে। দলের সাফল্যের জন্য অবশ্যই এমন পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে উদ্ভাবনা প্রতিভা কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। এমন অনেক বিষয় নিয়ে আমাকে লড়তে হয়েছে ডিটিডিঅ্যান্ডপি (এয়ার), আইএসআরও, ডিআরডিও এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে আমি কাজ করেছি। কিন্তু সব সময় আমি নিশ্চিত করেছি, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ আর উদ্ভাবন ও ঝুঁকি-গ্রহণের সুযোগ যেন পায় আমার দল।

www.pathagar.com

এসএলভি-৩ প্রকল্পের সময় প্রথম যখন আমরা প্রজেক্ট টিম সৃষ্টি করছিলাম, এবং পরে আইজিএমডিপিতে, তখন এসব দলের লোকেরা নিজেদের আবিষ্কার করে সংস্থার উচ্চাকাঙ্খার একেবারে সম্মুখ সারিতে। এসব দলে মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল, ফলে তারা প্রচন্ডভাবে দৃশ্যমান ও ভেদ্য হয়ে পড়েছিল। যৌথ গৌরব অর্জনে তাদের অবদান অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

আমি সচেতন ছিলাম, সাপোর্ট সিস্টেমের যে কোনও ব্যর্থতা দলীয় কৌশলে নেতীবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কয়েকটি ঘটনায় ধৈর্য আর স্নায়ুশক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের। অনিশ্চয়তা আর জটিলতার উচ্চমাত্রা প্রায়ই দলীয় তৎপরতায় জায়গা করে নিত, আর তা হত একটা ফাঁদের মত।

এসএলভি-৩ প্রকল্পের প্রথম বছরগুলোয়, প্রায়ই আমি শীর্ষ ব্যক্তিদের স্নায়ুদুর্বলতার মুখোমুখি হতাম, কারণ অগ্রগতি তখনও দৃশ্যমান হয়নি। অনেকেই ভাবত এসএলভি-৩ 'এর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে প্রতিষ্ঠান। ভাবত দল চলছে অপরীক্ষিত ভাবে। এসব ভয় ছিল কাল্পনিক, পরে তা প্রমাণিত হয়। প্রতিষ্ঠানে অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। যেমন ভিএসএসসিতে। তারা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোয় আমাদের দায়িত্বশীলতা ও অঙ্গীকার উপেক্ষা করতেন। পুরো কার্যক্রমে এমন ধরনের লোকদের সঙ্গে কাজ করাটা ছিল সংকটজনক অংশ। আর কুশলী হাতে এটা করতেন ড. ব্রহ্ম প্রকাশ।

একটা প্রজেক্ট টিম হিসেবে আপনি যখন কাজ করবেন, তখন সাফল্যের ব্যাপারে আপনাকে একটা জটিল দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। সেটা দরকার হয়ে উঠবে আপনার জন্য। সব সময়ই প্রত্যাশার সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলবে। আর প্রজেক্ট টিম খন্ডিত হয়েও যেতে পারে বাইরের সাব-কন্ট্রাক্টরদের ও প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার বিশেষজ্ঞ দপ্তরের টানাটানির মধ্যে। ভাল প্রজেক্ট টিম দ্রুত সেই ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিবর্গকে খুঁজে বের করতে পারে যার মাধ্যমে আলোচনা চালান যেতে পারে। তাদের চাহিদা নিয়ে এসব ব্যক্তিদের পক্ষে আলোচনা চালান নিশ্চয় প্রধান প্রত্যাশিত বিষয় হবে। পরিস্থিতি পরিবর্তন বা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত আলোচনাও চলতে থাকবে, সে নিশ্চয়তা বিধান করাও জরুরি। অপ্রীতিকর সারপ্রাইজ বহিরাগতরা অপছন্দ করে। তেমন কিছু না ঘটার ব্যবস্থা নিতে হবে ভাল দলকে।

এসএলভি-৩ দল সৃষ্টি করছিল তাদের অভ্যন্তরীণ সাফল্যের ক্রিটেরিয়া। আমরা আমাদের মান, প্রত্যাশা ও লক্ষ্য বোধগম্য করেছিলাম। সারাংশ

www.pathagar.com

করেছিলাম সফল হতে আমাদের কি প্রয়োজন, আর সাফল্যের পরিমাপ করব কিভাবে। যেমন আমাদের কাজ কিভাবে আমরা পূর্ণ করব, কে কি করবে, আর কিসের মান অনুসারে। সময়সীমা কি হবে, আর অন্যান্য সংস্থার প্রতি রেফারেন্সসহ দল কিভাবে যোগাযোগ করবে।

একটা দলের সাফল্যের ক্রিটেরিয়ায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হচ্ছে দক্ষতা। কারণ ভূগর্ভের নিচে বহুকিছু আছে। মাটির ওপর দল সাধারণভাবে কাজ করবে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন। কিন্তু আমি বারংবার দেখেছি, মানুষেরা কি চায় তা বোধগম্য করে তুলতে কতটা অপারগ—যতক্ষণ না তারা দেখে একটা কর্মকেন্দ্র কিছু করছে যা তারা চায় না তারা করুক। প্রকল্প দলের একজন সদস্যকে অবশ্যই কাজ করতে হবে গোয়েন্দার মত। কিভাবে প্রকল্প সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, তাকে তার ক্লু বের করতে হবে।

অন্য এক স্তরে প্রকল্প-দল ও কর্মকেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক উৎসাহিত ও উন্নত করে তুলতে হবে আর এ দায়িত্ব প্রকল্প নেতার। পারস্পরিক নির্ভরতার ব্যাপারে উভয় পক্ষকে অবশ্যই পরিষ্কার থাকতে হবে, আর এটাও বুঝতে হবে যে উভয়ের ওপরই প্রকল্পের কাজের অংশ চাপান আছে। অন্য এক স্তরে এক পক্ষকে অপর পক্ষের সামর্থ্য মূল্যায়ন করতে হবে এবং কি করা দরকার তা নিয়ে পরিকল্পনার জন্য শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো শণাক্ত করতে হবে। বস্তুত পুরো বিষয়টি হতে হবে কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ার মত। আইজিএমডিপিতে শিবাথানু পিল্লাই ও তার দল তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশল পিএসিইর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় কিছু কাজ করেছিলেন। যা কাজে লেগেছিল প্রগ্রাম অ্যানালিসিস, কন্ট্রোল ও ইভালুয়েশন ইত্যাদিতে। প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে ১টার মধ্যে তারা একটা নির্দিষ্ট কর্মকেন্দ্রে একটা প্রকল্প-দলের সাথে বসতেন আর তাদের ভিতরকার সাফল্যের মূল্যায়ন করতেন। সাফল্যের পথে পরিকল্পনা আর সাফল্য থেকে ভবিষ্যতের চিত্র যে উদ্দীপনা সঞ্চার করত তাতে অপ্রতিরোধ্য গতি পেত তারা, আর আমি সব সময় দেখতাম তার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে কাঙ্খিত বস্তু।

টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টের ধারণার শিকড় ডেভলপমেন্ট ম্যানেজমেন্টের অনেক গভীরে প্রোথিত। এর উৎপত্তি ষাটের দশকের প্রথমভাগে। ম্যানেজমেন্ট ওরিয়েন্টেশনের ধরন মূলত দুটো : *প্রাইমাল*, যা ইকোনমিক কর্মীকে মূল্য দেয়, এবং *র‍্যাশনাল*, যা মূল্য দেয় অর্গানাইজেশনাল কর্মীকে। আর এ ব্যাপারে আমার

www.pathagar.com

ধারণা হল এমন ব্যক্তিকে নিয়ে যে হবে একজন টেকনোলজি পারসন। প্রাইমাল ম্যানেজমেন্ট ধারা মানুষকে স্বীকৃতি দেয় তাদের স্বাধীনতার জন্য, এবং র‍্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট স্বীকৃতি দেয় তাদের নির্ভরশীলতার জন্য। অন্য দিকে আমি মূল্য দিই মানুষের পরস্পর-নির্ভরতাকে।

আব্রাহাম ম্যাসলো প্রথম ব্যক্তি যিনি সেল্ফ-অ্যাকচুয়ালাইজেশনের নতুন মনস্তত্ত্বকে একটা ধারণাগত পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। ইউরোপে রুডোল্ফ স্টেইনার ও রেগ রেভান্স এই ধারণাটিকে ব্যক্তির শিক্ষা ও সাংগঠনিক নবায়নের পদ্ধতিতে উন্নীত করেছিলেন। অ্যাংলো-জার্মান ম্যানেজমেন্ট ফিলোসফার ফ্রিৎস শুমাখার প্রবর্তন করেছিলেন বৌদ্ধ অর্থনীতি এবং 'স্মল ইজ বিউটিফুল' নামে বই লিখেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধী তৃণমূল প্রযুক্তির গুণকীর্তন করেছেন আর সমগ্র তৎপরতার মাঝখানে রেখেছেন ব্যবহারকারীদের। জেআরডি টাটা প্রগতি চালিত অবকাঠাম সৃষ্টি করেন। ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাভা ও অধ্যাপক বিক্রম সারাভাই প্রবাহ ও সমগ্রতার স্বাভাবিক নিয়মের পরিষ্কার বৈশিষ্ট্য নিয়ে চালু করেন উঁচু, প্রযুক্তিভিত্তিক আণবিক শক্তি ও মহাকাশ কর্মসূচি। ড. ভাভা ও অধ্যাপক সারাভাইয়ের উন্নয়নমূলক দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে ড. এমএস স্বামীনাথন ভারতে চালু করেন সবুজ বিপ্লব। ড. ভার্গিস কুরিয়েন ডেয়ারি শিল্পে এক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে শুরু করেন শক্তিশালী সমবায় আন্দোলন। অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ গবেষণায় প্রতিষ্ঠা করেন মিশন ম্যানেজমেন্টের ধারণা। আইডিয়া বাস্তবায়নের এ হল সামান্য কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এভাবেই সারা পৃথিবী জুড়ে নিয়ত বদলে যাচ্ছে গবেষণা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবয়ব।

আইজিএমডিপিতে আমি অধ্যাপক সারাভাইয়ের ভবিষ্যৎ দর্শন আর অধ্যাপক ধাওয়ানের মিশন একীভবনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ভারতীয় গাইডেড মিসাইল তৈরিতে আমি যোগ করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম লেটেন্সির প্রাকৃতিক নিয়ম, সম্পূর্ণ দেশীয় টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। বিষয়টা পরিষ্কার হবে একটা প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরলে।

টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টের বৃক্ষ সেখানেই শেকড় গাড়ে যেখানে রয়েছে প্রয়োজনীয়তা, নবায়ন, পরস্পরনির্ভরতা এবং স্বাভাবিক প্রবাহ। এর বেড়ে ওঠার ধরন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য, যার অর্থ ঘটনা এগিয়ে যাবে ধীর পরিবর্তন ও আকস্মিক রূপান্তরের একটা সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে। প্রতিটা রূপান্তর থেকে সৃষ্টি হবে আরও জটিল কোনও স্তর কিংবা সে গুঁড়িয়ে দেবে আগের পর্যায়টিকে। ঝামেলাপূর্ণ হয়ে উঠলে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাবে আধিপত্যকারী মডেল : এবং পরিবর্তনের ধারা চলতেই থাকবে।

www.pathagar.com

টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টের বৃক্ষ, যদি যত্ন করে লালন করা হয়, বয়ে আনে অ্যাডাপটিভ অবকাঠামোর ফল। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রযুক্তিগত ক্ষমতার আওতায় আনা যায় এর ফলে। তাছাড়া মানুষের মধ্যে কারিগরি দক্ষতা সঞ্চারিত করা সম্ভব হয়।

১৯৮০ সালে আইজিএমডিপি অনুমোদন করার সময় আমাদের পর্যাপ্ত টেকনোলজি বেজ ছিল না। সামান্য কিছু বিশেষায়িত বিভাগ ছিল, কিন্তু সেই এক্সপার্ট টেকনোলজি ব্যবহারের কর্তৃত্ব আমাদের ছিল না। কর্মসূচির বহু-প্রকল্প পরিবেশ একটা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছিল, একই সঙ্গে পাঁচটা অ্যাডভান্সড মিসাইল সিস্টেম তৈরি করার ক্ষেত্রে। ঘটনাক্রমে আইজিএমডিপির অংশীদার ছিল ৭৮ টি, সেই সাথে ৩৬টি প্রযুক্তি কেন্দ্র আর ৪১টি উৎপাদন কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সরকারি খাতের ওপর, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির ওপর, বেসরকারি শিল্পকারখানার ওপর। আমাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে পারবে এমন ধরনের একটা মডেল আমরা তৈরি করেছিলাম কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায়। মোট কথা, আমাদের দরকারি ব্যবস্থাপনা ও সমবায়ী উদ্যোগের সমন্বয় প্রতিভা বিকাশে ও ব্যবহারে কাজে লেগেছিল। যা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল, তা কাজে লেগেছিল আমাদের গবেষণাগারে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ও বেসরকারি শিল্পকারখানায়।

আইজিএমডিপির টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট দর্শন মিসাইল তৈরির ক্ষেত্রে এক্সক্লুসিভ কিছু নয়। এই সাফল্যের পিছনে ছিল জাতির অন্তরগত এক কামনা, যাতে করে দুনিয়া আর কখনও পেশীশক্তি বা টাকার জোরে পরিচালিত না হতে পারে সেই আকাঙ্খা। প্রকৃত পক্ষে এই দুটো ক্ষমতাই টেকনোলজির ওপর নির্ভরশীল। টেকনোলজি শুধু টেকনোলজিকেই সম্মান করে। এবং, আমি আগেই যেমন উল্লেখ করেছি, টেকনোলজি বিজ্ঞানের মত নয়, এটা দলগত তৎপরতা। ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিমত্তা থেকে এটা জন্ম নেয় না, জন্ম নেয় পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া আর মুক্ত প্রভাব থেকে। আর সেটাই আমি করার চেষ্টা করেছিলাম আইজিএমডিপিতে : ৭৮ টি একীভূত ভারতীয় পরিবার, যে পরিবার মিসাইল সিস্টেম তৈরি করতেও সক্ষম।

আমাদের বিজ্ঞানীদের জীবন ও সময় নিয়ে প্রচুর দার্শনিকতা আর বিস্ময়ের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তারা কোথায় যেতে চেয়েছিলেন আর কিভাবে সেখানে পৌঁছেছিলেন সে সব কথা আবিষ্কার করা হয়েছে খুবই কম। আমার একটা ব্যক্তি

www.pathagar.com

হয়ে ওঠার পিছনে যে সংগ্রামের কাহিনী আছে, সম্ভবত তার খানিকটা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি এই লেখায়। আমি আশা করি অন্তত কিছু সংখ্যক তরুণকেও এটা সাহায্য করবে আমাদের এই কর্তৃত্ববাদী সমাজে উঠে দাঁড়াতে। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য এমনই যে মানুষের মনের মধ্যে সে প্রবিষ্ট করে স্থূল আকাঙ্খা—পুরষ্কার, ধনসম্পদ, মর্যাদা, পদ, পদোন্নতি, অন্যদের দ্বারা জীবনযাত্রা অনুমোদন, আনুষ্ঠানিক সম্মান, আর সব ধরনের স্ট্যাটাস সিম্বল।

এসব পদার্থ অর্জন করার জন্য তারা এটিকেট শেখে আর নিজেদের পরিচিত করে রীতি, ঐতিহ্য, প্রটোকল ইত্যাদির সঙ্গে। আজকের তরুণদের অবশ্যই জীবনের এই সব আত্ম-পরাজয়ী পন্থা শেখা চলবে না। শুধু ভোগবিলাসের আর পুরস্কারের জন্য কাজ করার প্রবণতা অবশ্যই ছাড়তে হবে। আমি যখন ধনী, ক্ষমতাবান ও শিক্ষিত লোকদের দেখি একটু শান্তির জন্য সংগ্রাম করছে, তখন আমি স্মরণ করি আহমেদ জালালুদ্দিন ও ইয়াডুরাই সলোমনের মত মানুষদের কথা। দৃশ্যত বস্তুগত কোনও ধনদৌলত ছাড়াই তারা কতটা সুখী ছিলেন!

On the cost of Coromandel
Where the earthy shells blow,
In the middle of the sands
Lived some really rich souls.
One cotton lungi and half a candle—
One old jug without a handle
These were all the worldly possessions
Of these kings in the middle of the sands.

কেমন করে তারা নিরাপত্তার অনুভূতি নিয়ে থাকতে পারতেন? আমার বিশ্বাস তারা নিজের ভিতরে শক্তি ধারণ করতেন। অন্তরগত সংকেতের ওপর তারা নির্ভর করতেন বেশি, বাইরের সেই সব পদার্থের চেয়ে যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আপনার অন্তরগত সংকেত সম্পর্কে আপনি কি সচেতন? আপনার আস্থা আছে তার প্রতি? আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়েছেন আপনি? আমার কথা শুনুন, বাইরের চাপ যত বেশি আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন, যা সর্বক্ষণ আপনাকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে লাগানোর চেষ্টা করে, তত বেশি সুন্দর হবে আপনার জীবন, তত বেশি সুন্দর হবে আপনার সমাজ। প্রকৃতপক্ষে দৃঢ়, আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষে গোটা জাতি লাভবান হবে।

আপনার জীবনে আপনার নিজের ভিতরকার ক্ষমতা ব্যবহারের ইচ্ছা আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। আপনার একক ব্যক্তিসত্তা থেকে যখন আপনি কোনও কাজ নির্দিষ্ট করতে পারবেন, কেবল তখনই আপনি হয়ে উঠবেন একজন পূর্ণ ব্যক্তি।

www.pathagar.com

এই গ্রহের সবাইকেই তিনি পাঠিয়েছেন নিজের ভিতরকার সৃষ্টিশীলতা কাজে লাগানোর জন্য, আর নিজেদের মত করে শান্তিতে থাকার জন্য। আমার পথ আলাদা হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে। জীবন একটা কঠিন খেলা। মানুষ হিসেবে নিজের জন্মের অধিকার ধারণ করেই আপনি এ খেলায় জিততে পারেন। আর এই অধিকার ধারণ করতে সকল চাপ উপেক্ষা করে আপনাকে সামাজিক ও বাইরের ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক হতে হবে। শিবসুব্রামানিয়াম আয়ার তার সঙ্গে খাবার খেতে আমাকে যে তার রান্নাঘরে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাকে আপনি কি বলবেন? আমার বোন জোহরা আমাকে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে নিজের সোনার বালা ও চেইন বন্ধক রেখেছিল, তাকে কি বলবেন? অধ্যাপক স্পন্ডার গ্রুপ ফটো তুলতে আমাকে সামনের সারিতে তার পাশে বসিয়েছিলেন, তাকে কি বলবেন? একটা মোটর গ্যারেজে একটা হোভারক্র্যাফট তৈরিকে কি বলবেন? তারপর সুধাকরের সাহস? ড. ব্রহ্ম প্রকাশের সমর্থন? নারায়ণনের ব্যবস্থাপনা? ভেঙ্কটরমনের ভবিষ্যৎ-দর্শন? অরুণাচলমের উদ্যোগ? এসবই হচ্ছে দৃঢ় অন্তরগত শক্তি ও উদ্যমের এক একটা উদাহরণ। পঁচিশ শতাব্দী আগে যেমনটা বলেছিলেন পিথাগোরাস, 'সমস্ত কিছুর উপরে, নিজেকে শ্রদ্ধা কর।'

আমি কোনও দার্শনিক নই। আমি প্রযুক্তির মানুষ। আমার সারাটা জীবন আমি খরচ করেছি রকেট বিজ্ঞান শেখার পিছনে। কিন্তু বিপুলসংখ্যক বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে আমার বোঝার সুযোগ হয়েছিল প্রচন্ড জটিলতার মধ্যে পেশাগত জীবনের প্রপঞ্চ। যা আরও আগে বর্ণনা করেছি সেদিকে তাকালে আমার নিজের পর্যবেক্ষণ ও উপসংহার ডগমাটিক বলে প্রতীয়মান হয়। আমার সহকর্মীরা, সহযোগীরা, নেতারা ; রকেট বিদ্যার জটিল বিজ্ঞান ; টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ; সমস্তই মনে হয় করা হয়েছে নেহাৎ কর্তব্য হিসেবেই। হতাশা এবং সুখ, সাফল্য ও ব্যর্থতা—আলাদাভাবে চিহ্নিত হয় বর্ণনায়, কালে ও স্থানে—সমস্তই মনে হয় মিলে গেছে এক সাথে।

একটা বিমান থেকে আপনি নিচে তাকালে লোকজন, বাড়ি, পাথর মাঠ, গাছপালা ইত্যাদি সবকিছুই আপনার মনে হবে যেন একটা সমরূপ ল্যান্ডস্কেপ, একটা থেকে অন্যটাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা খুব কঠিন হবে। আমার জীবনের যেটুকু আপনি পড়েছেন তা দূর থেকে দেখা ওই বার্ডস্-আই ভিউয়েরই অনুরূপ।

My worthiness is all my doubt—
His merit — all my fear—
Contrasting which my quality
Does however — appear.

www.pathagar.com

প্রথম অগ্নি উৎক্ষেপণের সঙ্গে শেষ হওয়া সময়ের এই গল্প—জীবন কিন্তু চলতেই থাকবে। এই বিশাল দেশ সকল ক্ষেত্রেই বিপুল সাফল্য অর্জন করতে পারবে, যদি আমরা ৯০ কোটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ জাতির মত সব কিছু ভাবি। আমার গল্প— জয়নুলাবদিনের পুত্রের গল্প, যিনি রামেশ্বরম দ্বীপের মস্ক স্ট্রিটে জীবন কাটিয়ে গেছেন একশ' বছরের ওপর আর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন ; এক বালকের গল্প যে তার ভাইকে খবরের কাগজ বিক্রি করতে সাহায্য করত; এক ছাত্রের গল্প যাকে তৈরি করেছিলেন শিবসুব্রামানিয়া আয়ার ও ইয়াডুরাই সলোমন; এক ছাত্রের গল্প যে শিক্ষা পেয়েছিল পান্ডালাইয়ের মত শিক্ষকদের কাছে; একজন প্রকৌশলীর গল্প যাকে চিনতে পেরেছিলেন এমজিকে মেনন ও লালন করেছিলেন অধ্যাপক সারাভাই; একজন বিজ্ঞানীর গল্প যে ব্যর্থতা ও বাধা-বিপত্তিতে পরীক্ষিত হয়েছিল; এক নেতার গল্প যাকে সমর্থন দিয়েছিল প্রতিভাদীপ্ত ও নিবেদিতপ্রাণ প্রফেশনালদের বিশাল একটি দল। এই গল্প শেষ হবে আমার সঙ্গেই, যেহেতু পার্থিব কিছুই আমার নেই। আমি কোনও কিছুরই মালিক নই, কিছুই সৃষ্টি করিনি, অধিকারী নই কোনও কিছুর—না পরিবার, না পুত্র-কন্যা।

I am a well in this great land
Looking at its millions of boys and girls
To draw from me
The inexhaustible divinity
And spread His grace everywhere
As does the water drawn from a well.

অন্যদের মাঝে নিজেকে একটা উদাহরণ হিসেবে আমি স্থাপন করতে চাই না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, কিছু পাঠক হয়তো অনুপ্রেরণা পাবেন আর পরম তৃপ্তির অভিজ্ঞতা পাবেন যা কেবল আত্মিক জীবনেই পাওয়া সম্ভব। খোদার দূরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধান আপনার উত্তরাধিকার। আমার প্র-পিতামহ আবুল, আমার পিতামহ পাকির, আমার পিতা জয়নুলাবদিন-এর ব্লাডলাইন হয়তো শেষ হবে আবদুল কালামে এসে, কিন্তু খোদার মহিমা কখনও থামবে না, যেহেতু তা চিরন্তন।

www.pathagar.com

উপসংহার

ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল এসএলভি-৩ ও *অগ্নি* প্রগ্রামের সঙ্গে আমার গভীর সম্পৃক্ততা নিয়ে বিজড়িত এ বই। এমন সেই সম্পৃক্ততা যা আমাকে ১৯৯৮-এর মে মাসের পারমাণবিক পরীক্ষার মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গেও জড়িত করেছে। তিনটি বৈজ্ঞানিক এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম— মহাকাশ, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও আণবিক শক্তি। এসব এস্টাবলিশমেন্টে কাজ করার সময় আমি দেখেছি, আমাদের দেশের সেরা মানুষ আর সেরা উদ্ভাবনী মস্তিষ্ক দুষ্প্রাপ্য নয়। একটা ব্যাপার সবখানেই ছিল সাধারণ, আর সেটা হল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা মিশন চলাকালীন ব্যর্থতায় কখনও শংকিত হতেন না। ব্যর্থতার ভিতরে আছে আরও শিক্ষাগ্রহণের বীজ যা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আরও ভাল প্রযুক্তির দিকে, আরও উঁচু সাফল্যের দিকে। এইসব মানুষেরা ছিলেন মহান স্বপ্নদ্রষ্টাও এবং তাদের স্বপ্ন শেষপর্যন্ত সত্যি হয়েছিল আশ্চর্য সাফল্যের ভিতর দিয়ে। আমি অনুভব করি যে, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত প্রযুক্তিগত শক্তি যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে এর তুলনা করা যেতে পারে দুনিয়ার যে কোনও স্থানের সেরা স্থাপনাগুলোর সঙ্গে। সর্বোপরি, আমার সুযোগ হয়েছিল দেশের মহান স্বপ্নদ্রষ্টাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার, বিশেষ করে অধ্যাপক বিক্রম সারাভাই, অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান ও ড. ব্রহ্ম প্রকাশ, যারা প্রত্যেকেই আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন প্রচণ্ডভাবে।

উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য একটা জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দৃঢ় নিরাপত্তা দুটোই প্রয়োজন। আমাদের Self Reliance Mission in Defence System 1995—2005 আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে একটা স্টেট-অব-দ্য-আর্ট প্রতিযোগিতামূলক উইপন সিস্টেম যোগান দেবে। Technology Vission—2020 পরিকল্পনা জাতির অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও স্কিমগুলোয় কাজে লাগান হবে। এই দুই পরিকল্পনা জাতির স্বপ্নকে মেলে ধরেছে। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস আর প্রার্থনা করি যে, এই দুই পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল আমাদের দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করবে এবং 'উন্নত' দেশের মর্যাদাসম্পন্ন জাতিগুলোর মধ্যে আমাদের ন্যায্য স্থানটি করে নেবে।

www.pathagar.com

প্লেট ১ (ক) আমার বাবা জনুলাবদিন
(খ) পক্ষী লক্ষ্মণা শাস্ত্রী, বাবার ঘণিষ্ঠ বন্ধু ও রামেশ্বরম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত

www.pathagar.com

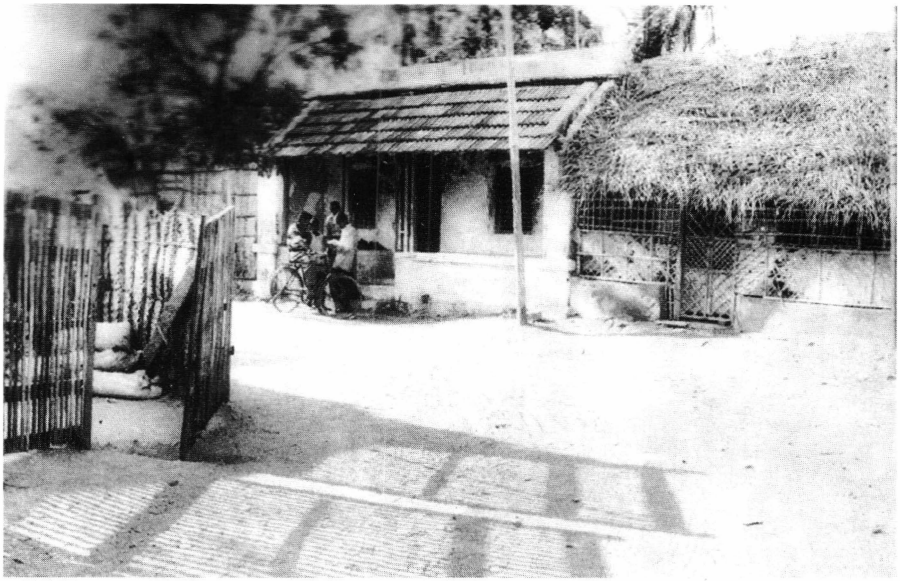

প্লেট ২ (ক) মস্ক স্ট্রিটে আমাদের বাড়ি

(খ) প্রাচীন শিব মন্দির। এই সড়কে ভাই কাশিম মোহাম্মদকে দোকানের কাজে সাহায্য করতাম আমি

www.pathagar.com

প্লেট ৩ আমাদের মহল্লার পুরনো মসজিদ। বাবা এখানে প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে ও আমার ভাইদের নিয়ে আসতেন নামাজ পড়তে

www.pathagar.com

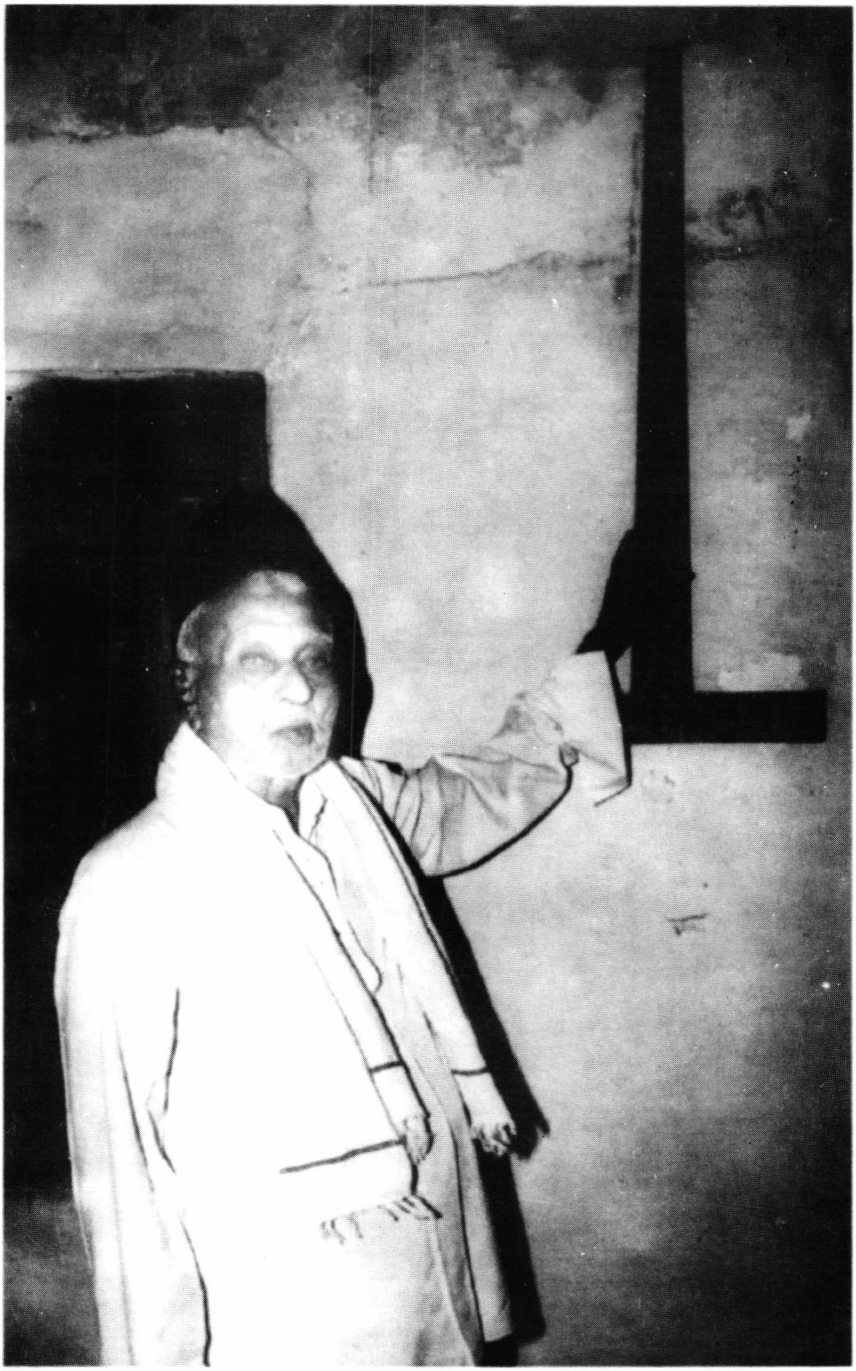

প্লেট ৪ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় আমার ব্যবহৃত টি-স্কয়ার দেখাচ্ছেন আমার ভাই

www.pathagar.com

প্লেট ৫ আমার ভাই মুস্তাফা কামালের বন্ধু এসটিআর মানিকামের বাড়ি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্লেট ৭ শোয়ার্টজ হাই স্কুল, রামনাথপুরম

www.pathagar.com

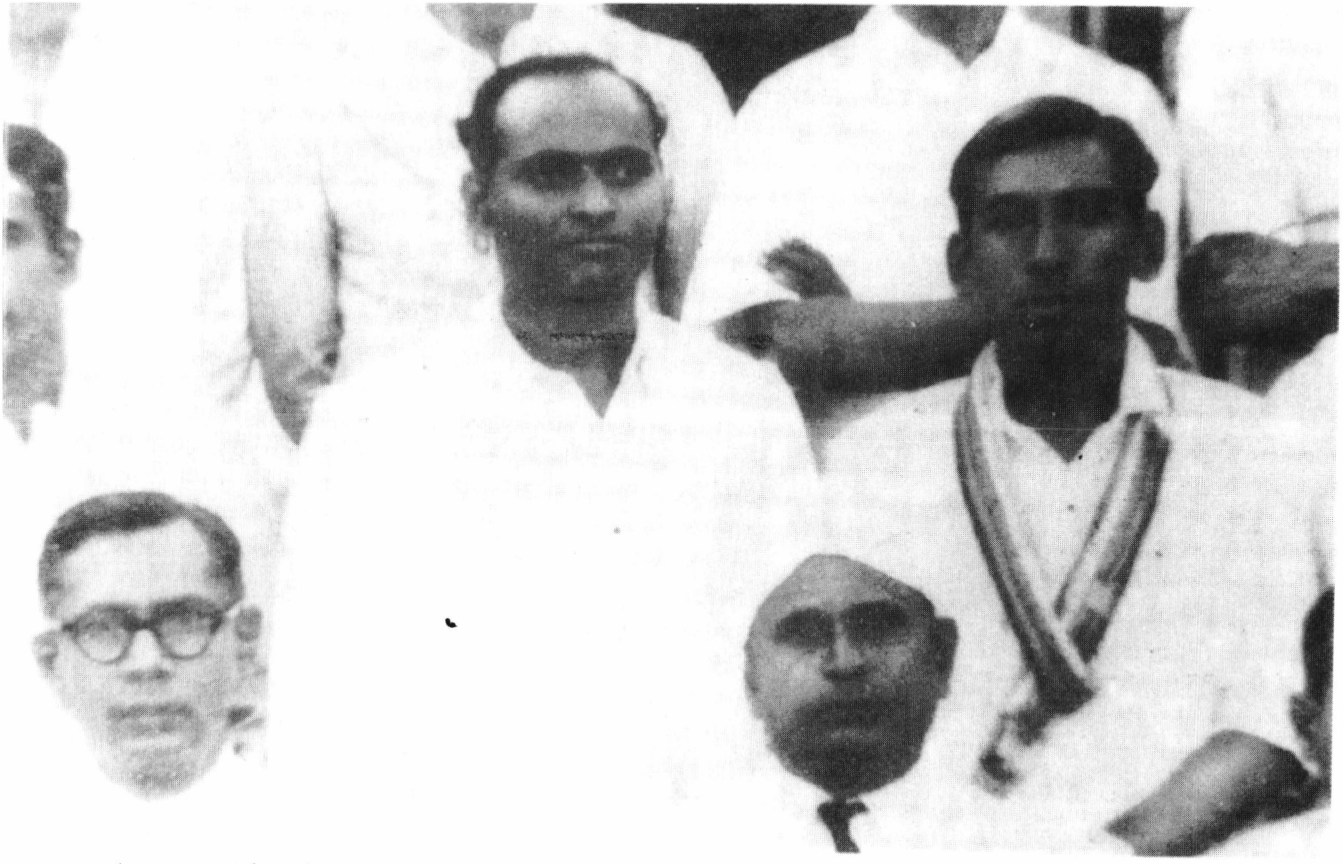

প্লেট ৮ শোয়ার্টজ হাই স্কুলে আমার শিক্ষকরা-ইয়াডুরাই সরোমন (বাঁয়ে দাঁড়ানো), রামকৃষ্ণ আয়ার (ডানে বসা)

www.pathagar.com

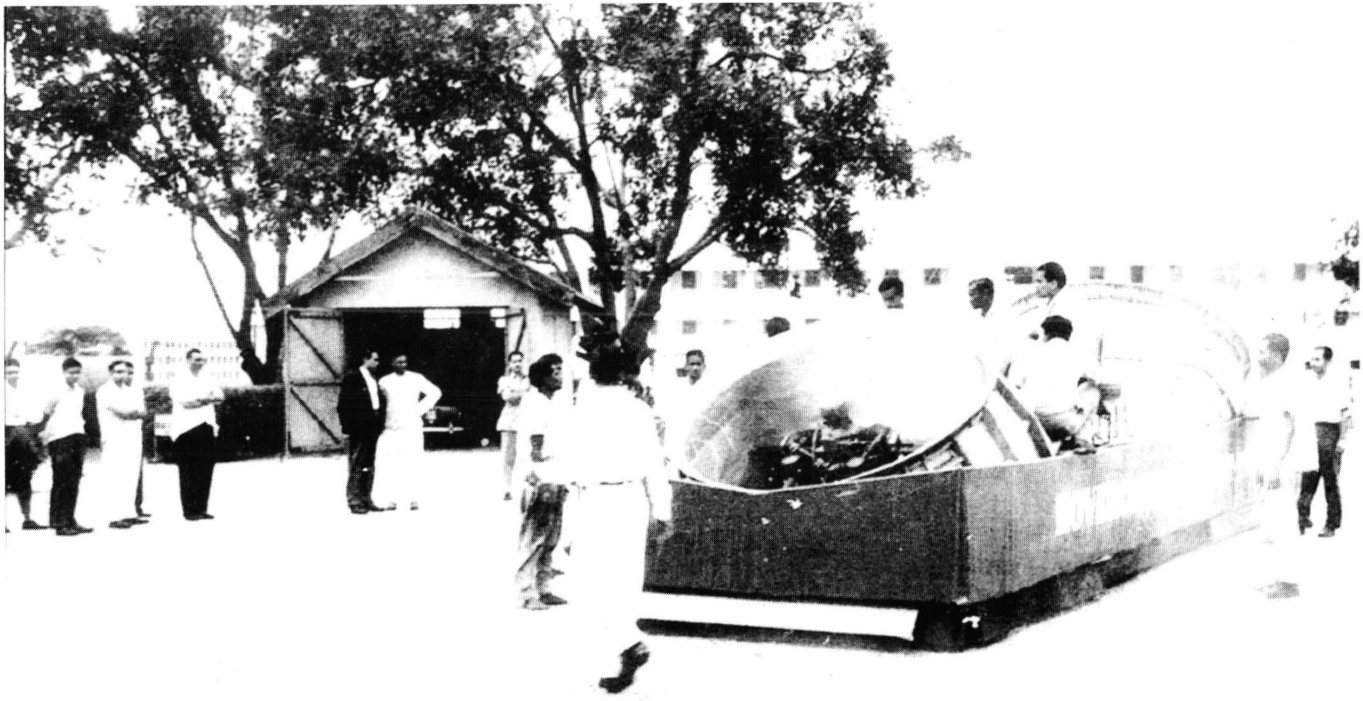

প্লেট ৯ বাঙ্গালোরের এডিইতে তৈরি জোড়া-ইঞ্জিন বিশিষ্ট হোভারক্র্যাফ্‌ট *নন্দী*

www.pathagar.com

প্লেট ১০ থুম্বার খৃস্টীয় গির্জা। এখানেই জায়গা নিয়েছিল স্পেস রিসার্চ সেন্টারের প্রথম ইউনিট

www.pathagar.com

প্লেট ১১ থুম্বায় অধ্যাপক বিক্রম সারাভাইয়ের সঙ্গে

www.pathagar.com

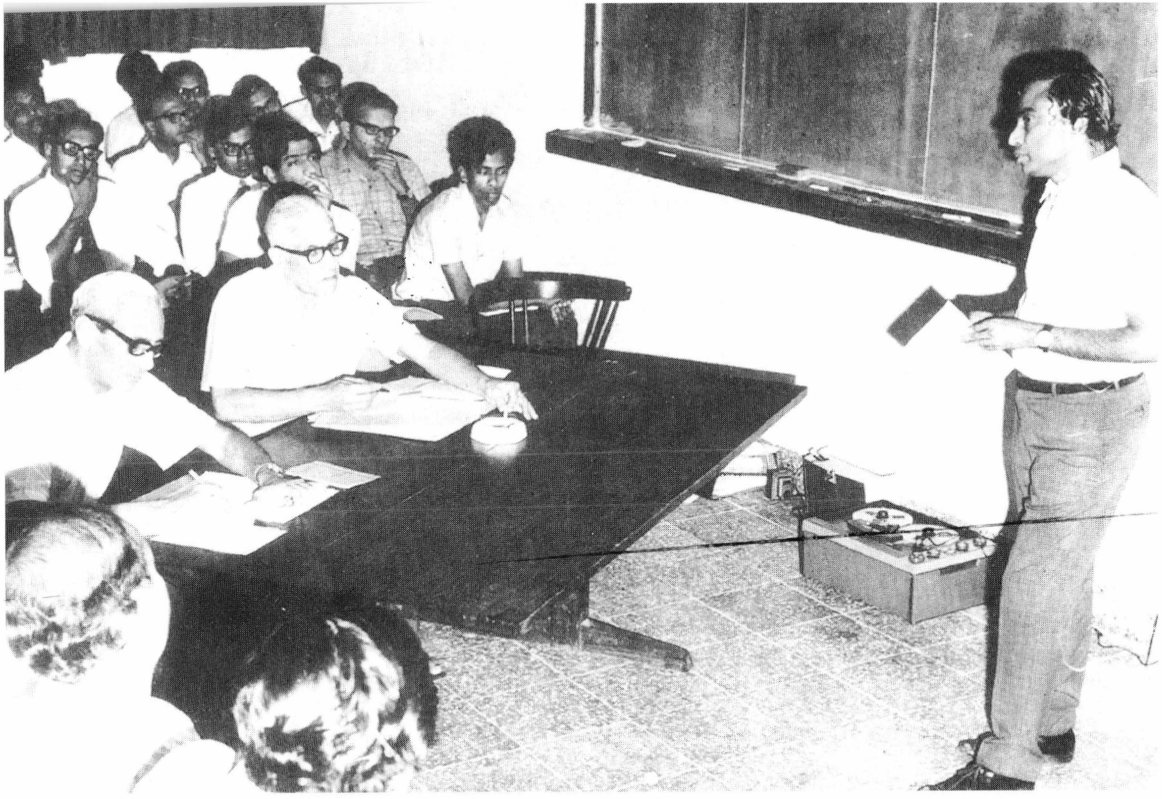

প্লেট ১২ এসএলভি-৩ রিভিউ মিটিঙে অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান ও ড. ব্রহ্ম প্রকাশ

www.pathagar.com

প্লেট ১৩ আমার এসএলভি-৩ দলের একজন সদস্যের বক্তৃতা। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক আমার আইডিয়ার রূপায়ন

www.pathagar.com

প্লেট ১৫ অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান ও আমি এসএলভি-৩ এর ফলাফল ব্যাখ্যা করছি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে

www.pathagar.com

প্লেট ১৭ প্রেসিডেন্ট ড. নীলম সঞ্জীব রেড্ডির কাছ থেকে পদ্মভূষণ গ্রহণ

www.pathagar.com

You said it
By LAXMAN

Nothing to be discouraged! We have postponed it again because we want to be absolutely certain!

প্লেট ২০ অগ্নি উৎক্ষেপণে প্রথম দুবার ব্যর্থতার পর সংবাদপত্রের ব্যঙ্গ-চিত্র

www.pathagar.com

প্রমিত হোসেন (জন্ম ১৬ এপ্রিল ১৯৬১ / ঝিনাইদহ) Vulgar Reality ধারার গল্প ও উপন্যাস লেখক। বিশ্ব সাহিত্য ও শিল্পকলা বিশ্লেষক। চীন, জাপান, রাশিয়া ও লাতিন আমেরিকান গল্পের অনুবাদক। রুশ সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। কবিতার সাথেও সম্পর্কিত এবং প্রাবন্ধিক। বাবা, ইর্তেজাদ হোসেন (১৯২৭-১৯৮০), ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। সেই সূত্রে জন্ম থেকেই ঘুরেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ পেয়েছেন মা সাহেরা বেগম (১৯৩৭)-এর কাছ থেকে। ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার অনূদিত আটটি গ্রন্থ : অরুন্ধতি রায়ের **দ্য গড অব স্মল থিংস**, এ্যাণ্ড্রু মর্টনের **মনিকা'স স্টোরি**, গুন্টার গ্রাসের **দ্য টিন ড্রাম**, সালমান রুশদির **মিডনাইট'স চিলড্রেন**, গাও ঝিংজিয়ান-এর **সোল মাউন্টেন**, শোভা দের **স্টারি নাইটস** এবং ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার **স্নো কান্ট্রি**। এছাড়াও প্রকাশিত হচ্ছে গুন্টার গ্রাসের ক্যাট এ্যান্ড মাউস এবং মার্গারেট অ্যাটউড-এর **দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন**। আগামী বই মেলায় প্রকাশিত হবে তার শয়তান এবং মিশ্রমাধ্যমের কাজ।

প্রমিত হোসেন পেশায় সাংবাদিক।

www.pathagar.com

'এটা এমন একটা বই যার মূল্য নিরূপিত হবে এ বইয়ের সমান ওজনের সোনায়'

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *দ্য স্টেট্‌সম্যান*, মার্চ '৯৯

'ভারতের মহাকাশ রকেট বিজ্ঞান ও ক্ষেপনাস্ত্র কর্মসূচির সাফল্য-গাথার এক অনবদ্য দিনলিপি এ বই'

ড. এ. ভি. মোহারির, নিউক্লিয়ার রিসার্স ল্যাব., আই. এ. আর. আই, *বিজনেস ইন জার্নাল*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ '৯৯

'এক নিবিড় ও গভীর ব্যক্তিগত জীবনের গল্প ... একজন নৌকা-মালিকের সন্তানের, যিনি অকল্পনীয় রূপকথার মত পরিণত হয়েছেন ভারতের সবচেয়ে স্বতন্ত্র টেকনোক্র্যাটে ... অনুভবে এ বই যেন "all-kalam" অত্যন্ত মূলবান তার জীবন-গাথা ... কালামই দেখিয়ে দিলেন যে বিশ্বকে পরাস্ত করতে পারে ভারত ... বিদেশী প্রশিক্ষণ অথবা ডিগ্রি ছাড়াই। অসাধারণ এই আত্মজীবনী আনন্দ পার্থসারথি, *দ্য হিন্দু*, ফেব্রুয়ারি '৯৯

'সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমার পড়া সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক আত্মজীবনী ড. কালামের এ বই'

গঙ্গান প্রতাপ, এন.এ.এল., জানুয়ারি '৯৯

ISBN 984 833 004 6

www.pathagar.com